কিশোর ভারতী রজত জয়ন্তী সংকলন

সেরা পঁচিশ হাসির গল্প

পত্রপত্রিকা জগতে **কিশোর ভারতী** স্বকীয়তায় উজ্জ্বল একটি প্রতিষ্ঠানের নাম। সুদীর্ঘ চার দশক ধরে কিশোর ও তরুণদের নিজস্ব মুখপত্ররূপে কিশোর ভারতী রয়েছে জনপ্রিয়তা ও উৎকর্ষের শীর্ষে।

দীর্ঘ যাত্রাপথে কিশোর ভারতীর পৃষ্ঠায় অংশগ্রহণ করেননি, এমন যশস্বী লেখকের সন্ধান পাওয়া দুষ্কর। তাঁদের অনেকেই আজ প্রয়াত, কিন্তু তাঁদের সাহিত্যকীর্তি মণিমুক্তোর মতো ছড়িয়ে রয়েছে পত্রিকার পাতায়-পাতায়।

পাঠকপাঠিকা ও প্রিয়জন বন্ধুদের বহুদিনের অনুরোধ, কিশোর ভারতী পত্রিকা থেকে এইসব মণিমুক্তো আহরণ করে একটি সেরা সংকলন প্রকাশ করার। ইচ্ছা আমাদেরও। কিন্তু নানান অসুবিধায় এতকাল বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়নি।

অতঃপর স্থির হয়, হাসির-মজার, রহস্য, ভয়-আতঙ্ক...এমনি খণ্ডে-খণ্ডে প্রকাশিত হবে এই সংকলন।

দ্বিতীয় জ্যাকেটে

সেরা পঁচিশ হাসির গল্প

Click Here For More Books>>

কিশোর ভারতী রজতজয়ন্তী সংকলন

সেরা পঁচিশ হাসির গল্প

প্রধান সম্পাদক

দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সহ সম্পাদক

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়

হীরেন চট্টোপাধ্যায় • চুমকি চট্টোপাধ্যায়

পত্রভারতী

www.bookspatrabharati.com

পত্রভারতী

প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৫ ষষ্ঠ মুদ্রণ : দ্বিতীয় সংস্করণ জানুয়ারি ২০০০
সপ্তম মুদ্রণ জানুয়ারি ২০০১ অষ্টম মুদ্রণ জানুয়ারি ২০০২ নবম মুদ্রণ মার্চ ২০০৩
দশম মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০০৫ একাদশ মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০০৬ দ্বাদশ মুদ্রণ জানুয়ারি ২০০৮
ত্রয়োদশ মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০০৯ চতুর্দশ মুদ্রণ নভেম্বর ২০১০ পঞ্চদশ মুদ্রণ অক্টোবর ২০১১
ষষ্ঠদশ মুদ্রণ এপ্রিল ২০১২ সপ্তদশ মুদ্রণ মে ২০১৩ অষ্টাদশ মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৫
উনবিংশ মুদ্রণ মে ২০১৮

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্রভারতী, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০০০৯
থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ মানস চক্রবর্তী ও ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য
অলংকরণ ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য ও জুরান নাথ

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশ
কোনও মাধ্যমের সাহায্যে কোনওরকম পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না।
এই শর্ত না মানলে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

SERA PONCHIS HASIR GOLPO
story-collection from KISHORE BHARATI
Published by PATRA BHARATI 3/1 College Row, Kolkata 700 009
Phones 2241 1175, 94330 75550, 98308 06799
E-mail patrabharati@gmail.com
visit at www.facebook.com/ Patra Bharati

Price ₹ 150.00

ISBN 978-81-8374-211-5

র থী ম হা র থী

কিসে খরচ হল?	৭	আশাপূর্ণা দেবী
সামার ভ্যাকেশন মামার!	১৪	শিবরাম চক্রবর্তী
ঘুঁটেপাড়ার সেই ম্যাচ	১৯	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
পিন্‌ডিদার সিংহ	২৫	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
রামকেষ্টর শ্বশুরবাড়ি	৩২	দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
দাদুতাড়ুয়া	৩৬	মহাশ্বেতা দেবী
একটি তৈলাক্ত কাহিনী	৪৬	নন্দগোপাল সেনগুপ্ত
অথ রসময় ও সারমেয় কথা	৪৮	স্বপনবুড়ো
জোকার	৫৩	শক্তিপদ রাজগুরু
কুকুরের কামড়	৬৪	হিমানীশ গোস্বামী
শকুন্তলার হরিণ	৭১	সুশীল জানা
রাবণ বধ পালা	৭৯	প্রফুল্ল রায়
সেয়ানে সেয়ানে	৮৫	আশা দেবী
রাখে কেষ্ট (!) মারে কে?	৯১	ধীরেন বল
সাড়ে-ছ-ইঞ্চির গপ্পো	৯৭	বরেন গঙ্গোপাধ্যায়
ভাগ্যে যদি সয়!	১০১	রবিদাস সাহারায়
গরু একটি উপকারী জন্তু	১০৬	পার্থ চট্টোপাধ্যায়
ব্যাপারটা কি হল?	১১১	নির্মলেন্দু গৌতম
মোটা-মুটি গল্প	১১৬	প্রবুদ্ধ
বিষমভরার বাঘ	১২০	ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়
ঐতিহাসিক ছড়িটা	১২৫	রাম চট্টখুণ্ডী
'মেটা-মর্‌-ফোঁস'	১৩২	সুবোধ দাশগুপ্ত
ঘটোৎকচ জেঠুর গল্প	১৩৭	ভগীরথ মিশ্র
গোকুলের শিক্ষাদান	১৪১	অশোককুমার সেনগুপ্ত
বোতলবাবার বেতাল রহস্য	১৪৭	হীরেন চট্টোপাধ্যায়

কিসে খরচ হল?

আশাপূর্ণা দেবী

চিরকেলে কথারা চিরকালই ঠিক কথা বলে। সেই যে কথা আছে ঃ নামেতে কি করে বাপু, নামেতে কি করে, গোলাপে যে নামে ডাকো সৌরভ বিতরে। এর চেয়ে খাঁটি কথা আর কিছু আছে? নেই।

কথাটাকে যে ক্ষেত্রেই ফেলো, দেখবে, অক্ষরে-অক্ষরে মিলে যাবে। তার সাক্ষী দেখো এই—'প্রবেশিকা পরীক্ষা।'

একদা এর নাম ছিল 'এনট্রান্স', সেকালের কত কত মহারথীদের নামের সঙ্গে লেগে আছে সেই নামের স্মৃতিসৌরভ। তারপর কর্তাদের মর্জি বদলে তার নাম হল 'ম্যাট্রিক'। তারপর 'স্কুল ফাইন্যাল', তারপর 'হায়ার সেকেন্ডারি'। অতঃপর ঘুরে-ফিরে আবার সেই স্কুল ফাইন্যাল।

কেন যে এটা হল কে জানে।

ভাষার ভাঁড়ার থেকে কি আর একটা নতুন নাম জোটানো যেত না? তবে দ্বিতীয় দফায় আবার স্কুল ফাইন্যাল না হয়ে যদি অন্য নামই হতো, তফাত হতো কিছু?

নামই বদল হচ্ছে, কিন্তু রঙ-বদল হচ্ছে কি? অথবা স্বাদ-বদল? চেহারা-বদল?

না।

সেই তো পরীক্ষার আগে বাছাদের মুখ শুকনো, চুল রুক্ষু, পেট ভার, জিভে অরুচি, মন খারাপ, মেজাজ তিরিক্ষি, মাথা ভোম্বল, দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত, কথা বেঠিক—সবই যথাযথ সেই এনট্রান্সের যুগ থেকে।

Table of Contents

পরবর্তী স্টেজেও আবার বরাবর একই দৃশ্য। অর্থাৎ পরীক্ষার পরে সেই সব বাছাদেরই দেখো—যেন হাওয়ায় ভাসছে, পাখির পালকের মতো হালকা হয়ে আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। তখন মুখ ঝকঝকে, চুল চকচকে, চব্বিশ ঘণ্টা খাই-খাই, যা পাই তাই খাই, মেজাজ গঙ্গাজল, মাথা সুস্থির, দৃষ্টি পরিষ্কার, কথা ঠিকঠাক।

হবেই তো। এমন নিশ্চিন্ত নির্ভাবনাময় ভারহীন দায়হীন সুখের কাল কি জীবনে আর আছে? নাঃ, এ কাল জীবনে আর দুবার আসে না।

সেই হাতে-খড়ির সময় থেকে এযাবৎ কাল সারা বছরে কোয়াটারলি, হাফইয়ার্লি, ফাইন্যাল আর আবার টার্মিনাল—এই এতগুলো পরীক্ষার টানাপোড়েনে তাঁতির মাকুর মত যে ছোটাছুটি চলেছে, এখন তাতে ইতি। এখন তার থেকে মুক্তি।

এখন বুক ভরে নিশ্বাস নেওয়া যায়।

সেই ত্রেতাযুগে মাথা থেকে গন্ধমাদন পর্বত নামিয়ে হনুমান যেমন নিশ্বাসটি নিয়েছিল, ঠিক তেমনটি।

সত্যি, পরীক্ষা হয়ে গেছে, অথচ রেজাল্ট বেরোতে দেরি রয়েছে, নিজেদের কীর্তিকাণ্ড সম্বলিত খাতাগুলি কোন গোকুলে অবস্থান করছে, কে জানে; অতএব এখন কলেজের কথাও উঠছে না। কী মনোরম এই সময়টি।

ছাত্রজীবনের ইতিহাসে এটাই বোধহয় 'স্বর্ণযুগ'।

আবার এই (যে নামেই ডাকো) পরীক্ষাটির সময় ছেলেমেয়েদের যেমন স্পেশাল আদর জোটে, ইহজীবনে তেমন আর কখনো জোটে? আর কোন পরীক্ষার সময় এমনভাবে বাড়ি থেকে ডাব আসে, সরবত আসে, ফল আসে, মিষ্টি আসে, কেক-বিস্কুট-চকোলেট আসে? আসে ছেলেমেয়ের সবথেকে প্রিয় খাদ্যগুলি?

নাঃ, এরকমটি আর কোনো সময় নয়। দূরত্ব হিসেবে বাড়ির লোকের অসুবিধে ঘটলে মাসি-পিসি-মামা-কাকারাও এই টিফিন জোগান দিয়ে যায় মানবিকতা বা সামাজিকতার খাতিরে।

এটি চিরকালই আছে। আগে বরং আরো বেশি ছিল। তখন মায়েরা এমন দিক্‌বিজয়িনী ছিল না তো, যা করতো পুরুষে। অতএব একে অপরের সুবিধে-অসুবিধে দেখতো।

এখন মহিলারা কারো সাহায্যের ধার ধারেন না বলেই পুরুষ মানুষের ওই সাহায্য করার দায়িত্বটাও চলে গেছে।

সে যাক্। এমন কত জিনিসই তো যাচ্ছে। তবে এই যে দিনগুলি? এমন আর হবে না, এ দিন আর ফিরবে না—এটা ঠিক।

যারা ভাল পরীক্ষা দিয়েছে, তারা তো নিশ্চিন্তই, যারা ভাল পারেনি—খারাপ দিয়েছে, তারাও এই মধ্যবর্তী সময়টুকু অন্তত আছে একরকম। অন্তত সমাজে চরে খাচ্ছে।

'খারাপ দিয়েছে' এমন কথা তো গায়ে লেখা নেই? কাজেই এসময় অনায়াসে আড্ডা দেওয়া চলে, যত ইচ্ছে গল্পের বই পড়া চলে, জানিয়ে না-জানিয়ে যত ইচ্ছা সিনেমা দেখা চলে। এতে কেউ 'ছি ছি' করতে আসবে না। কাজেই সব দিক থেকেই—

এই কালটির তুলনা নেই।

নিরুদ্বেগ, নিশ্চিন্ত।

সুখের ষোলকলা।

Table of Contents

এই স্বর্ণযুগটিকে নিয়ে কী করবে আর কী না করবে ভেবে কূল পায় না গন্ধমাদন নামিয়ে নিশ্বাস ফেলা ছেলেরা। সেকালে, একালে, চিরকালে।

হিটুরও তা-ই হল।

শেষ পরীক্ষার দিন সকালে হিটু ভেবেছিল, পরীক্ষা দিয়ে এসেই চোঁ চোঁ ছাতের সেই চিলেকোঠার ঘরটায় গিয়ে টেনে লম্বা একখানা ঘুম দেবে যে, তিনদিন তিনরাত উঠবে না। শুতে যাবার সময় সকলকে বলে যাবে, তাকে যেন ডিসটার্ব করা না হয়।

হ্যাঁ, ওই ঘরটাতেই ঘুমোবে।

শুধু যে ঘরটা নির্জন নিস্তব্ধ বলে, তা নয়, ঘরটার ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যেও। ওই ঘরটাতেই এই মাস তিনেক ধরে পরীক্ষার পড়া পড়েছে হিটু, পড়েছে চোখ-জুড়ে-আসা ঘুমকে পিটিয়ে পিটিয়ে তক্তা বানিয়ে-বানিয়ে।

হিটুর মনে হয়েছে, ঘরের বালি খসা-খসা দেওয়ালগুলো যেন হিটুর এই দুরবস্থা দেখে দাঁত বার করে হাসছে।

আর সেই তাড়িয়ে দেওয়া-দেওয়া অশরীরী ঘুমগুলো যেন ঘরের বাতাসে ঘুরে বেড়িয়ে-বেড়িয়ে নিশ্বাস ফেলছে।

এত স্পষ্ট করে এত সব ভাবতে না পারলেও আবছা আবছা এই রকম একটা মনোভাব নিয়ে পরীক্ষার হল থেকে বেরিয়েছিল হিটু।... কিন্তু গেটের ভিড়ভাট্টা এড়িয়ে কোনোমতে বেরিয়ে রাস্তায় পা দিতেই যেন পৃথিবী খুলে গেল।

আর সেই শ্রান্ত ক্লান্ত ঘুমে-চোখ-ভেঙে-আসা হিটু একেবারে ফ্রেশ শরীর নিয়ে সেই আলো-আলো পৃথিবীর দিকে চোখ ফেলে গট গট করে চলতে লাগল।

এতক্ষণ শুধু বিচিত্র কলকল্লোল আর বহুবর্ণের ভিড় দেখছিল হিটু, এখন আলাদা করে একটা মানুষ দেখতে পেল।

গৌতম। হিটুর ক্লাসের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

গৌতম হিটুকে দেখতে পেয়েই চলে আসছিল। বলে উঠল, এখন কী করবি?

এই আধঘণ্টা আগেও হিটুর সেই লম্বা ঘুম দেবার সঙ্কল্পটা দৃঢ় ছিল, কিন্তু এখন 'ঘুম' শব্দটার বানানও মনে পড়ল না। বললো,—বাড়ি যাব। খাব। তারপর বেরিয়ে পড়ে যতক্ষণ ইচ্ছে হাঁটব। হেঁটে হেঁটে গঙ্গার ধার অবধি চলে যাব।

গৌতম বললো,—মাথা খারাপ নাকি? যত ইচ্ছে হাঁটব মানে? ভূতে পেয়েছে? আমি তো ঠিক করে রেখেছি নাইট শোয়ে সিনেমা যাব।

নাইট শোয়ে? —আঁতকে ওঠে হিটু।

যে রকম আঁতকে উঠতে পারতো হিটুর বাবা-কাকা হিটুর বয়েসে সিনেমা দেখার নামেই। তখন স্কুল জীবনে স্বাধীনভাবে সিনেমা দেখতে যাওয়ার কথা ভাবতে পারতেন না ওঁরা। হিটুরা অবশ্য তেমন হাবাগঙ্গা নাবালক নয়। তা বলে নাইট শো?

হিটু আঁতকে উঠে বললো,—মাথা তোরই খারাপ হয়ে গেছে। নাইট শোতে সিনেমা দেখতে যাবি, বাড়িতে তাহলে আস্ত রাখবে?

গৌতম গম্ভীরভাবে বললো,—আস্ত রাখবে না মানে? মনে রাখিস, আজ থেকে আমরা আর নাবালক রইলাম না। এখন থেকে তো 'এ' মার্কা ছবিও বুক ফুলিয়ে দেখতে যাব। তোর টিকিটটাও কাটছি।

হিটুর বুকটা ওর মত অত জোরালো নয়। তাই গৌতমের সাহস দেখে মুগ্ধ হলেও

Table of Contents

বললো,—না রে, আজই সবে পরীক্ষা শেষ হলো, আজই সিনেমা দেখা, তাও নাইট শোয়ে? অসম্ভব। দারুণ বকুনি খেতে হবে বাড়িতে।

গৌতম কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে, বাড়ির বকুনি খাওয়ার কথা বাদ দে। কিসে না বকুনি খেতে হয় শুনি? উঠতে-বসতে, খেতে-শুতে, হাই তুলতে, নিশ্বাস নিতে—সব কিছুতেই তো গার্জেনরা বকবার জন্যে মুখিয়ে থাকে। আমার ফাদারটি তো আবার দেখতে পেলেই উপদেশ ঝাড়তে বসবেন। ওই ভয়ে সাধ্যপক্ষে সামনে বেরোই না। আর জননী? তিনি আমার চুল থেকে নখ পর্যন্ত সব কিছুতেই দোষ দেখতে পান।

গৌতম হিটুর খুবই বন্ধু। কিন্তু ওর ওই বাবাকে 'ফাদার' বা মাকে 'জননী' বলা-টলা ভাল লাগে না হিটুর। হিটু এখন তাই জোর গলায় বললো,—সে তো বড়রা মাত্রই দিয়ে থাকে। আমার ছোড়দি তো মাত্র তিন বছরের বড় আমার থেকে। তাও তো সব সময় উপদেশ ঝাড়ে। যাক্, চলি, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

—ওসব জানি না। আমি কিন্তু টিকিট কাটছি তোর। আজ আমি দেখাব, কাল তোর ঘাড় ভাঙব।

হিটু তাড়াতাড়ি বলে উঠল,—না রে, দারুণ ঘুম পাচ্ছে। মনে হচ্ছে, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই ঘুমিয়ে পড়ি। আজ ভীষণভাবে ঘুমোতে হবে।

গৌতম বোধহয় বন্ধুর এই কাপুরুষতায় বিরক্ত হয়েই বললো,—তবে যা। সাতদিন সাতরাত্তির ঘুমো গে যা। এই যে বলছিলি 'যত ইচ্ছে হাঁটব'—

—সে তখন এমনি ভাবছিলাম। এখন না হঠাৎ এতদিনের সব ঘুম...

বলে প্রায় পালিয়েই যায় হিটু।

যদিও হিটু ভেবে রেখেছিল, পরীক্ষার পর থেকে আর সে ছোটদের দলে থাকবে না, স্বাধীন সাবালক জীবনের দাবিদার হবে, তবু হঠাৎ একদিনে এতখানি লাফ। সাহস হল না। হিটু এখন হালকা পালকের মতো হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে বাড়ি ফিরল। উঃ, কী আরাম। কী স্বস্তি। যেন ভয়ঙ্কর একটা দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে ওঠা।

আকাশে যে এতো আলো আছে, তা-ই যেন ভুলে গিয়েছিল।

এখন অনেক—অনেকগুলো দিন এই আলো দেখতে পাবে হিটু। আচ্ছা, এতগুলো আলো-আলো দিন নিয়ে কী করবে হিটু? কী করা যায়? বেড়িয়ে বেড়াবে, আড্ডা দেবে, ঘুমোবে, খাবে, গল্পের বই পড়বে, আর সিনেমা-টিনেমা দেখবে?

নাঃ, এতগুলো দিন কখনো শুধু ওইভাবে কাটানো যায়? বড় একটা কিছু করতে হবে।

কী সেটা? কী সেটা?

কিন্তু শুধুই কি হিটু ভাবছে? হিটুর ভাবনা ভাববার জন্যে তো বাড়িসুদ্ধ সবাই আছে।

হিটুর জ্যেঠু বললেন,—এই সময়টিই হচ্ছে জীবনের শ্রেষ্ঠ অবকাশের সময়। এরকম নির্ভাবনার অবকাশ জীবনে কখনো আসে নি, আসবেও না। আমার মতে এই সময়ের মধ্যে যতসব ক্লাসিক বইগুলি পড়ে ফেলা উচিত।

হিটু ভয়ে ভয়ে জ্যেঠুর উদ্দীপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে বললো,—ক্লাসিক বই?

জ্যেঠু বললেন,—ভয় পাবার কিছু নেই। ক্লাসিক গান শিখতে বলছি না তোমায় আমি। গল্প-উপন্যাস-কাব্যই পড়বে। বঙ্কিম, রবীন্দ্র, মাইকেল, নবীন, শরৎচন্দ্র—এইসবগুলো শেষ করে ফেলবে এর মধ্যে। বাড়িতেই রয়েছে সব। ইচ্ছে করলে মহাভারত-রামায়ণটাও পড়ে নিতে পারো। আমি তা-ই করেছিলাম।

Table of Contents

জ্যেঠু একটু আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বললেন,—ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর আমি প্রথম চুল আঁচড়াই। আর তারপর পাঠ্য বইয়ের বাইরে বই পড়তে ধরি।

শেষের কথাটায় কান দেয় না হিটু, চমকে বলে প্রথম চুল আঁচড়াও?

—তবে না তো কি?

—তার আগে কখনো চুল আঁচড়াওনি?

জ্যেঠু তেমনি আহ্লাদের হাসি হেসে বলেন,—ছেলেবেলায় মা যতদিন দাড়ি ধরে আঁচড়ে দিয়েছেন, ততদিন আঁচড়েছি, তারপর আর নয়। নিজে হাতে চুলে চিরুণী ঠেকিয়েছি সেই ম্যাট্রিকের পর। তোমাদের এ যুগের মতন কি? হুঁ! সে যাক, এই অমূল্য সময়টির সদ্ব্যবহার করো। হেলেফেলায় নষ্ট কোরো না। আমার মনে হয় বরং মহাভারতখানাই আগে ধরো। ড্রয়ারে আমার বইয়ের আলমারির চাবি রেখে যাব।

বাবা বললেন,—হিটু, হাতে এখন অগাধ সময়। এই সময়টার মধ্যে গেল্‌থটাকে একটু ইয়ে করে ফেলবার চেষ্টা কর দিকি। একজামিন-একজামিন করে না খেয়ে না ঘুমিয়ে শরীরের তো বারোটা বাজিয়ে বসে আছিস। চলে যা না একবার ওই 'নবজীবন যোগব্যায়ামগার'-এ, ভর্তি হয়ে পড়। শুনেছি, ওরা নাকি কন্ট্রাক্টে স্বাস্থ্য ভাল করে দেয়। তুই তিন মাসের কন্ট্রাক্ট কর। যা, একটা ফরম্ নিয়ে আয়, যা টাকা-ফাকা লাগে আমি এক্ষুনি দিয়ে দিচ্ছি।

হিটুর বাবাও একটু ঝলমলে হাসি হেসে বলেন,—আমিও তা-ই করেছিলাম। ম্যাট্রিক-এর পর পরীক্ষার পরই পড়লাম স্বাস্থ্য নিয়ে। অবিশ্যি আমাদের আমলে তোমাদের মতন এতো সুযোগ-সুবিধে ছিল না, যা পারি নিজে নিজেই। ব্যায়ামের মধ্যে রোজ ভোরবেলা এক ঘণ্টা মর্নিং ওয়াক, ফিরে এসে দুমুঠো ছোলা ভিজে আর আদার কুচি, ব্যস্। চড়চড়িয়ে বেড়ে উঠেছি। বরং এক কাজ কর, আমার দারুণ একজোড়া ডাম্বেল ছিল বাড়িতে, সেটা খুঁজে বার করে কাল থেকে লেগে যা।

হিটুর ছোট্‌কা সে সময় কলকাতায় ছিলেন না, কদিন পরে এলেন। এসেই বললেন, —কি রে হিটু, এখন তো দেখছি স্বরাজ পেয়েছিস, করছিসটা কী? খেয়ে-খেয়ে আর ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে মোটা হচ্ছিস শুধু? দেখ্, মানুষ হয়ে জন্মালে, তার কিছুটা ট্যাক্স দিতে হয়। সেটা হবে 'মানুষের মতো' কাজ কিছু করা। তোর এই লম্বা ছুটিটা নিয়ে করবি কী? যতদিন খালি আছিস, আমার অবৈতনিক বিদ্যালয়টার নিয়ম করে ক্লাস নে দিকি। এক ঢিলে দুই পাখি—স্কুলটারও উন্নতি হবে, তোরও উন্নতি হবে। কাল থেকেই লেগে পড়।

হিটুর মাথা ঘুরে গেল।

হিটু মলিন মুখে বললো,—তোমার স্কুল তো সেই বেলেঘাটায়? সেখানে রোজ যাওয়া যায়?

শুনে ছোট্‌কা মাটিতে ঘুষি মারেন। মেরে বলেন,—রোজ যাওয়া যায় না? আমি যাচ্ছি না রোজ দুবেলা? অলসতাই জীবনের সেরা শত্রু, বুঝলি? পৃথিবীতে করবার কাজের শেষ নেই। করে যেতে পারলেই হল। যত পারো কাজ করো।

কথাটা বেশ ভালই লাগল হিটুর।

বেশ মহান-মহান।

যেন বিবেকানন্দের বাণীর মতো। সত্যি, ছোটকাকা শুধু তো তেমনি আদর্শবাদী মহানই। হিটু ওঁর কথা শুনবে। প্রথমে কয়েকটা দিন জিরিয়ে আর বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরে-

Table of Contents

টুরে নেবে। না হলে ওরা ঠাট্টা করবে। ওরা ধরে নিয়েছে, ওদের এখন যা ইচ্ছে করার স্বাধীনতা হয়েছে। তাই হিটুকে বলে, থাক্ ভাই, তুই আমাদের সঙ্গে মিশিস না, তুই ভাল ছেলে।

কাজেই কিছুদিন ওদের ব্যাপারে যোগ দিতেই হবে, তারপর লেগে পড়বে কাজ নিয়ে। জ্যেঠু, কাকা, বাবা—যে যা বলেছেন, সব করবে। হাতে অনেক সময়। অগাধ সময়। এতো বড় সময়টার মধ্যে একখানা পড়ার বই ছুঁতে হবে না, সময় তো ফুরোতেই পারবে না হিটু।

ব্যায়ামটা সত্যিই দরকার।

ভারী পটকা চেহারা হিটুর, কলেজে ঢুকলে সহজে পোজিশন পাবে না। আর ওই মহাভারত। দেখলে ভয় করলেও পড়া দরকার। কলেজ লাইফ তো স্কুলের মতো নয়, অনেক কিছু জ্ঞান-ট্যান সঞ্চয় করে নিয়ে যাওয়া দরকার। ডিবেট-ফিবেটে কাজে লাগতে পারে। আর বঙ্কিম, রবীন্দ্রও পড়ে নেওয়া উচিত। যাক্, সময় অনেক পাওয়া যাচ্ছে। পড়া না থাকলে পড়বার সময় পাওয়া যায় অঢেল।

ওদিকে আর এক বিপদ।

হিটুর ঠাকুমা এই ফাঁকে হিটুর পৈতে দেবার জন্যে রসাতল করছেন। বলছেন, ন্যাড়া হতে রাজি নয় বলে এতখানি বয়েস অবধি পৈতে হল না ছেলের। বামুনের গরু হয়ে আর কতকাল থাকবে? এ কী আহ্লাদ দেওয়া ছেলেকে! আমি পুরুত মশাইকে ডাকাচ্ছি দিন দেখতে। এখন তো লম্বা ছুটি হিটুর, এইবেলা শুভকাজটা সেরে নিলে আবার ইস্কুলে যেতে-যেতে ন্যাড়ামাথায় চুল গজিয়ে যাবে।

শুনে হিটুর মা কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলেন,—কী বলছেন মা আপনি! হিটু আবার ইস্কুলেই যাবে?

ঠাকুমা কথা শুধরে নেন—না হয় কলেজেই যাবে বৌমা। কথা একই। আসল কথাটা হচ্ছে এই অবসরে পৈতেটা দেওয়া।

ব্যাপারটা প্রায় ঘটিয়েই তুলছিলেন হিটুর ঠাকুমা। তা, পঞ্জিকাই হিটুকে রক্ষা করল। হিটুর এই লম্বা ছুটির মধ্যেও মাথা ন্যাড়া করবার মতো শুভদিন, পঞ্জিকা একটাও বার করে দিতে পারল না। কাজেই রইল তোলা। তা রইল, কিন্তু এইসব কথাটথায় কটা দিন বেমালুম উবে গেল।

এদিকে হিটুর মা কেবল লেটার-বক্স দেখছেন জামালপুর থেকে চিঠি আসবার আশায়।

জামালপুরে হিটুর বড় মাসির বাড়ি। হিটুর মা দিদিকে চিঠি দিয়েছিলেন ঃ ছেলেটা পরীক্ষা দেওয়া পর্যন্ত সবাই মিলে যেন ওকে নিয়ে ডাংগুলি খেলছে। বন্ধুরা, বাড়ির লোকেরা। ভাবছি, তোমার কাছে কিছুদিন পাঠিয়ে দিই, শরীরটা সেরে আসুক।

তা সে চিঠির আর উত্তর আসে না। হিটুর মার মাথা হেঁট। দিনি এরকম করল। অথচ পিতুর পরীক্ষার পর দিদি নিজে থেকে বলে-কয়ে নিয়ে গিয়েছিল তাকে। বলতে নেই, পিতুটা এক মাস পরে ফিরে এল যেন মুটকি হাতি হয়ে।

আর হিটুর বেলায় কিনা—

হ্যাঁ, হিটুর বেলায় জানা গেল ঃ তার বড় মাসির বাড়িতে এখন বাসন মাজার ঝি নেই, রান্নার লোক পালিয়েছে, টিউব ওয়েলে জল উঠছে না, কুঁয়োর জল শুকিয়ে গেছে, আর ওখানে এখন খোলা বাজারে চাল পাওয়া যায় না।

Table of Contents

এ সব অসুবিধে সহ্য করে যদি থাকতে পারে হিটু, অবিলম্বে চলে আসুক। খুব খুশি হবেন মাসি-মেসো। চিঠিটা মেসোই লিখেছেন। মাসির শরীর বিশেষ কারণে খারাপ।

চিঠি দেখে হিটুর বাবা বললেন,—ভালই হলো। তোর মা তোকে মাসির বাড়ি চালান করার তালে ছিল। খুব ভুল করছিল। এই গরমে লোকে জামালপুরে যায়? তাছাড়া মাসির আদর খেয়ে খেয়ে মুটিয়েই যেতিস, হেল্‌থ ভালো হতো না। 'নবজীবন যোগব্যায়ামাগার'—ক্লাসটা শুধু শুধু বন্ধ যেত।

ক্লাস বন্ধ।

শুনে হিটুর বুক ধড়াস করে ওঠে।

ভর্তি হলো কবে হিটু?

রোজই যাই-যাই করছে, হয়ে উঠছে না। আর কোনো কথা নয়, কালই ভর্তি হয়ে নেবে। এখনো হাতে সময় আছে।

এদিকে জ্যেঠুও খবর নিচ্ছেন মহাভারত পড়তে কেমন লাগছে হিটুর। হিটু এমন উত্তর দেয়, যাতে মিথ্যাও বলা হয় না, সত্যও প্রকাশ হয় না। হিটু দৃঢ় সঙ্কল্প করে, কাল ভোরবেলাই ধরবে। রোজ বেশি বেশি করে পড়ে ফেললেই সেরে নেওয়া যাবে।

কিন্তু সেই আরম্ভটা কি হল?

হয় কি?

হঠাৎ একদিন বুকের ওপর হাতুড়ির ঘা! সামনের তেরো তারিখে রেজাল্ট বেরোচ্ছে। রেজাল্ট সম্পর্কে হিটু বরাবরই নিশ্চিন্ত ছিল, কিন্তু রেজাল্ট বেরোবার তারিখ ঘোষণার খবরে কেমন যেন আতঙ্ক শুরু হয়ে গেল। যদি রোল নম্বর গড়বড় হয়ে যায়, যদি খাতা হারিয়ে যায়, যদি খাতা দেখার সময় কোনো এগজামিনারের মুড ভাল না থাকে।

'খুব ভাল লিখে এসেছি' ভেবে যে বুকের বলটা ছিল এতদিন, সেটা যেন কোথায় মিলিয়ে যায়। এখন এমনও মনে হতে থাকে, সব পেপারগুলো লিখেছিলাম তো?

মনের এই অশান্ত অবস্থায় কিনা ছোট্‌কা এসে ঘেন্না দিতে বসল,—অনেক সোস্যাল ওয়ার্ক করা হয়েছে তো বৎস? আর দরকার নেই, এখন বাকি দিনগুলোও তোমার ওই গোল্ডেন মুন ফ্রেন্ডদের সঙ্গে হিন্দি সিনেমা দেখে আর আড্ডা দিয়ে কাটিয়ে দাও গে। শেম্ শেম্।

শুনে হঠাৎ কান্না পেয়ে যায় হিটুর।

কদিনই বা ওসব করতে পেল বেচারী? এই এতদিনের মধ্যে তো মাত্র পাঁচটা সিনেমা দেখেছে। আর আড্ডার মতো আড্ডা—সেই বা কদিন? বাড়ি থেকে বেরোতে গেলেই তো হুকুম হয়ে যায়, হিটু, বেলা করিসনে, হিটু, রাত করিসনে, হিটু, সকাল-সকাল ফিরবি...

তাহলে?

তাহলে এতখানি 'সময়' হিটুর গেল কোথায়? কিসে খরচ হল?

Table of Contents

সামার ভ্যাকেশন মামার!

শিবরাম চক্রবর্তী

সামার ভ্যাকেশনে মামার বাড়ি আম খেতে গিয়ে মামার ভ্যাকেশন দেখতে হলো আমায়—বলব কি দুঃখের কথা! আর সেই ভ্যাকেশনে আম খাবার পালাটা আমার কাবার হলো।

এক পৌষে শীত যায় না ঠিকই। কিন্তু সেই এক সামারেই সামার গেল আমার। মামার বাড়ি গিয়ে মামার ভ্যাকেশনটা কাটাবার মজাটা খতম হয়ে গেল সেই ধাক্কায়।

আমার নকুড় মামা তখন আমঘাটা না কোথাকার স্টেশন মাস্টার। ডাকলেন আমায়—আম খাবি তো এখানে আয়।

কি করে যাই মামা? পায় ব্যথা যে! জানালাম আমি।

আম খাবি তো পায়ের সঙ্গে কী সম্পর্ক? হাত দিয়ে তো আম খাবি? দু হাত দিয়ে চুষে কামড়ে। পা দিয়ে কি কেউ আম খায় নাকি আবার?

'বারে! আমবাগানে মালির পাহারা থাকে না? আম খেতে গেলে তার চোখে পড়লে সে তাড়া করবে না? পায়ে ব্যথা যে! দৌড়ে পালাতে পারব না, ঠ্যাঙানি খেয়ে ঠ্যাংটা ভাঙবে—মাঝখান থেকে পা হারাতে হবে আমায়।' বুঝিয়ে দিলাম মামাকে।

'আমরা কি গাছের থেকে আম পেড়ে খাই নাকি? আম ফলে আমাদের ট্রেনে! ট্রেনের থেকে পাড়ি আর মারি।' মামা ব্যক্ত করেন।

'ট্রেন থেকে?' শুনে অবাক হতে হয়—'গাছের মতন ট্রেনেও আম ধরে নাকি, মামা?'

Table of Contents

'ট্রেনে আম ধরে না। মালগাড়ি বোঝাই হয়ে আসে—ঝুড়ি ঝুড়ি আম। অ্যাতো আম যে ট্রেনে ধরে না! ল্যাংড়া, বোম্বাই, বেগুনফুলী, গোলাপখাস, হিমসাগর! ইয়া ইয়া ফজলি! যত খেতে চাস খা না। যা তোর প্রাণে চায়।'

'বলে কি মামা?' আমার মুখে কথা সরে না, জিবে জল সরে।

'আমরা তো গাড়ির থেকে পাড়ি আর খাই। একটা পয়সাও লাগে না। ঠ্যাঙানিও খেতে হয় না কারো।'

শুনেই চলে যাই আমঘাটায়—মামার এক কথায়।

ইস্টিশনের কাছেই মামাদের কোয়ার্টার—লাইনের ধারে। মামা ঝুড়ি ঝুড়ি আম নিয়ে আসেন। মামা খায়, আমি খাই—নামি নামি দামি দামি আম যতো না!

এক ঝুড়ি আম নিয়ে চলে যাই আমি সেই লাইনের ধারে। উঁচু একটা ঢিবির ওপর একান্তে গিয়ে বসি। একটার পর একটা আম ছাড়াই আর খাই। খেয়ে যাই আমের পর আম—সারাদিন। খোসার পাহাড় স্তূপাকার হয়ে জমে জাম্ হয়ে যায় ঢিবিটার চারপাশ।

খোসাগুলোও কিছু পড়ে থাকে না, বুঝলে! তারও খদ্দের আছে। আমার আম খাওয়া চুকিয়ে চলে আসার পরই সে আসে। হেলে দুলে সেখানে এসে হাজির হয় পেল্লায় এক ষাঁড়। কোথ্ থেকে আসে কে জানে! আমার সার ভাগ খেয়ে খতম করার পর সেই ষাঁড়টা আমের অসার অংশ এসে হজম করে।

এইভাবে আমাদের দুজনের খাবার পালা চলে—রোজ রোজ। চলতে চলতে একদিন হলো কি, হঠাৎ এক ট্রেন এসে পড়ল আমাদের মাঝখানে।

ষাঁড়টা আমগ্রাসে থাকার কালে কালগ্রাসে পতিত হয়ে গেল হঠাৎ। ট্রেনের ধাক্কায় কাটা পড়ল আমার অংশীদার।

আমি এক দৌড়ে গিয়ে খবরটা দিই মামাকে।

মামা বললে,—কী সর্বনাশ হলো বলত! তুই আম খাবার আর জায়গা পেলিনে? সেই লাইনের ধারে গিয়ে খেতে গেলি!

কোথায় বসে খাব তাহলে? নিরিবিলি জায়গা চাই তো—কাউকে যদি আমার আম বিলিয়ে দিতে না চাই?

—গাছের ডালে বসে খেতে পারতিস। তাহলেও ষাঁড়টা আর তোর নাগাল পেত না রে! গাছে উঠতে যেত না সে।

—কিন্তু খোসাগুলো ঠিক তার গাল পেত মামা গাছের ডালে বসে খেলেও খোসা কিছু আটকে থাকত না গাছে। খসে পড়ত সেই মাটিতেই। আর ষাঁড়টা এসে তখন...

—কী সর্বনাশ হলো এখন দ্যাখ তো! লাশ পড়ে রইল লাইনের ওপর। কে খালাস করবে সেই লাশ? গাড়ি যাবে কি করে লাইন দিয়ে? অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যাবে নির্ঘাত!

দারুণ ভাবনায় পড়লেন মামা।

শেষে বললেন,—খবরটা পাঠিয়ে দিই বড় সাহেবকে। তার করে দিই রানাঘাটে। তিনি যা করতে বলবেন তাই হবে।

কেন, আমিই তো ঠ্যাং ধরে টেনে আনতে পারি ষাঁড়টাকে লাইনের থেকে, তাহলেই তো লাইন ক্লিয়ার হয়ে যায়। —আমি জানাই ঃ এর জন্যে আবার সাহেব সুবো ডাকতে হবে কেন?

না রে! তা হয় না। রেললাইন কি আমার বাবার? রেলগাড়ি কি আমার চোদ্দ

Table of Contents

পুরুষের? কার লাইন কে ক্লিয়ার করে! —তিনি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েন ঃ এরকম কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে লোকো সুপারিন্টেনডেন্টকে খবর দেওয়া দরকার। তাঁকে না জানিয়ে কোনো কাজ করা যায় না।

এই বলে না তিনি টেলিগ্রাফ মেশিনের পাশে গিয়ে বসলেন। টরেটক্কা শুরু করবেন এমন সময় খট্‌কা লাগলো তাঁর,—কী বলা যায় বল্ তো? কী বলব টেলিগ্রামে?

সোজাসুজি জানিয়ে দাও না খবরটা।

পাগল! সোজাসুজি বলা যায় নাকি কখনো? অনেক বোঝাবুঝির আছে এর ভেতর। অমনি দিলেই হলো খবর? খাস বিলিতি সাহেব, খাসা ইংরেজিতে দিতে হবে না? বলছিস কী তুই?

আমি আবার কী বলব? তুমিই বলো না কী বলতে চাও? —আমি বললাম।

এই তো আমি লিখেছি রে! —বলে তিনি নিজের মুসাবিদাটা দেখালেন ঃ One cow is run over.

বেশ তো হয়েছে মুসাবিদা। অসুবিধাটা কোথায়? —আমি জানতে চাই।

Cow হবে, না bull হবে, এই হচ্ছে কথা! —তিনি জানান ঃ দেখে আয় তো দৌড়ে গিয়ে গরুটা মেয়ে গরু, না ছেলে গরু।

তাতে কোথায় আটকাচ্ছে, মামা! গরু হলেই হল—আমার বক্তব্য রাখি। অকারণে দৌড়ঝাঁপ আমার ভালো লাগে না। তাছাড়া, ছেলেরা কি গরু হয় না? ক্লাসে আকচারই তো কত ছেলেকে মাস্টারদের কাছে অকাতরে গরু আখ্যা পেতে শুনেছি—আমি নিজেও কিছু তার ব্যতিক্রম নই কো।

না রে! ওটা জরুরি। ছেলে গরু কি মেয়ে গরু, জানা দরকার। সাহেব বলে কথা! দেখে আয় চট করে।

অগত্যা দৌড়তে হলো অকুস্থলে।

মেয়ে গরু মামা! এসে জানালাম হাঁপাতে হাঁপাতে।

ব্যস্, এই তো হলো! হয়ে গেল! বলে উল্লসিত হলেন মামা, তারপর লিখলেন —Mrs. Bull run over, Advice solicited.

চলে গেল টেলিগ্রাম—সারবার্তা নিয়ে রানাঘাট জংশনে মামার তারবার্তা।

তারপর—হ্যাঁ তারপর ওদিকে টরেটক্কার খবর পেয়ে না বেটক্করে পড়ে গেলেন লোকো সুপারিন্টেনডেন্ট। তিনি ছিলেন Mr. Bull। তাঁর ওই বুল নাম মাতুলের জানা ছিল না।

ঘটনাচক্রে হয়েছে কি, তাঁর স্ত্রী সেই ট্রেনেই সেদিন যাচ্ছিলেন যেন কোথায়। টেলিগ্রাম পেয়েই তো সাহেব হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন।

আর কাঁদতে কাঁদতে তারপরই তিনি স্পেশাল ট্রেনে ছুটে এলেন সেই স্টেশনে।

মাই মিসেস বুল হ্যাজ এক্সপায়ারড! ওহো হো হো! —কেঁদে পড়লেন এসে তিনি মামার কাছে—ওহো হো হো হো! মাই ডিয়ার মিসেস বুল...

নো ক্রাই, নো ক্রাই সার! নট ভেরি ইম্পরটান্ট ম্যাটার। —সান্ত্বনা দিতে গেলেন মামা।

আর আড়ালে ডেকে জিগ্যেস করলেন আমায়—সাত ছেলের মা-র ইংরেজিটা কী হবে রে? গরু-ছেলে গরু-মেয়ের সবাইকে জড়িয়ে।

Table of Contents

—মাদার অব বয় কাউজ অ্যানড গার্ল কাউজ।

হাউ নো ইম্‌পরটান্ট? কাউ? —হাউ মাউ করে শুধোলেন সাহেব। আর কাঁদতে লাগলেন হাউ মাউ করে।

—নট ভেরি ভ্যালুয়েবল মিসেস বুল, সার! নট মাচ কম্‌পেন্‌সেসন্‌ টু বি পেড টু এনিবডি। শী ইজ মাদার অব অ্যাট লীস্ট সেভেন বয় অ্যান্ড গার্ল কাউজ। গিভস্‌ নো মিল্ক আই ডাউট।

মাদার অব সেভেন? সো হোয়াট? —ঝাঁঝিয়ে উঠেছেন সাহেব—ডু ইউ নো দি ভ্যালু অব মাই মিসেস বুল? অ্যান্ড হার চিলড্রেন?

ওয়াজ দ্যাট মিসেস বুল ইয়োরস? রিয়্যালি? —মামা তো হতভম্ব ঃ আই ডিড্‌ নট্‌ হ্যাপেন্‌ টু নো সার। প্লীজ এসকিউজ মি। আই বেগ ইওর পার্ডন! ইয়েস সার।

—হোয়্যার ইজ মাই মিসেস বুল? মাই ডিয়ার ডিয়ার মিসেস বুল?

অন দা লাইন—দেয়ার লাইং! —আমি জানাই। এতক্ষণে বাদ আমিও নিজের বিদ্যে জাহির করার সুযোগ পাই ঃ কাট ইনটু টু। টু নাইস্‌ পিসেস। দ্যাট ইজ্‌, ওয়ান মিসেস বুল ইজ নাউ টু মিসেস বুলস্‌!

সাহেব দেখতে চললেন লাইনে। তাঁর পেছনে মামা। মামার পিছু পিছু আমি। সঙ্গে সঙ্গে অ্যাসিস্টান্ট স্টেশনমাস্টার, লাইনসম্যান, সিগনালার, স্পেশাল ট্রেনের ড্রাইভার, গার্ড, সব্বাই।

সে এক শোভাযাত্রা!

দ্বিখণ্ডিত মিসেস বুল তখনো লাইনের ওপরে পড়ে। আর তার ধরাশায়ী দেহটার আশেপাশে যতো চিল-শকুনের দল।

ইজ দিস্‌ মাই মিসেস বুল? হোয়াট ডু ইউ মীন? —বোমার মতই ফাটলেন যেন সাহেব—ইজ দিস্‌ মাই... ওহ্‌! হাই স্টুপিড!

—ইয়েস সার। দিস ইজ দ্যাট মিসেস বুল... ইওরস।

শাট্‌ আপ্‌। ইউ আর ফায়ারড্‌।

ফায়ার। হোয়ার? —হকচকিয়ে যান মামা। চারধারে তাকান—নো ফায়ার, নো হোয়্যার সার।

সামারিলি ডিসমিসড্‌ ইউ আর! —বলে সাহেব আর অধিক বাক্য ব্যয় না করে গটগটিয়ে নিজের স্পেশালে গিয়ে ওঠেন। সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দেয় ট্রেনটা।

কী বলে গেল রে লাল মূলোটা? —জানতে চান মামা অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্কর এই আমার কাছেই—সামারিলি ডিসমিসড্‌—মানে কী এর? সাহেব বলল বটে, কিন্তু কথাটা কি গ্রামারিলি কারেকট্‌?

গ্রামাটিক্যাল মিসটেক হচ্ছে তোমার। —গ্রামারের কথায় গোড়াতেই আমার প্রতিবাদ ঃ গ্রামারিলি কি হয়? গ্র্যামাটিক্যালি বলো।

ড্রামাটিক্যালি ঘুরে দাঁড়ান মামা—তোকে বলেছে! গ্রামার শেখাতে এসেছিস আমাকে? তোর মামাকে? খাপ্পা হয়ে ওঠেন তিনি ঃ সামারিলি যদি হতে পারে, গ্রামারিলি হবে না কেন?

মানে মোদ্দা কথাটা হচ্ছে, তোমার ডিসমিস্‌ হয়ে গেল! চাকরি খতম তোমার। সোজা কথায় আমি বোঝাতে চাই।

Table of Contents

ঢের আগেই টের পেয়েছি। কিন্তু সামারিলি কেন? তাই তো আমি জানতে চাইছি রে!

সামার মানে গ্রীষ্মকাল, জানো তো মামা? বোঝাতে হয় আমায় তখন—আর এই সামারেই তো যতো ভ্যাকেশন হয়ে থাকে। ইস্কুলের, কলেজের, কতো কী-র! হয় না?

জানি জানি। যেমনটা তোর এই সামার ভ্যাকেশন হয়েছে...

হ্যাঁ, যেমন আমার এই সামার ভ্যাকেশন চলছে এখন, তেমনি তোমারও এবার ভ্যাকেশন হয়ে গেল এই সামারেই।

আমার আবার ভ্যাকেশন কী? আমি কি ইস্কুল মাস্টার। স্টেশন মাস্টার তো আমি। আমার আবার ভ্যাকেশন হয় নাকি কখনো? আমরা তো দরকার মতন ছুটি নিয়ে থাকি।

ভ্যাকেশন মানে তোমার এই ইস্টিশন আর ওই রেলের কোয়ার্টার—এসব তোমাকে ভ্যাকেট করতে হবে এবার। ভ্যাকেট হলো গিয়ে ভার্ব... তার মানে... তার মানে হচ্ছে ভ্যাকেট করা। আর ভ্যাকেশন হলো গে তার থেকে নাউন। বুঝলে তো?

মামা বুঝলেন। আর আমারও বোধগম্য হলো যে, এই সামারেই আমঘাটায় মামার বাড়ি এসে... ফি সামারে সামারিলি এই আম খাবার... আমের চোকলা খাবার... খোসমেজাজে আমের চাকা খেয়ে খোসা ফেলার পালা চিরটা কালের মতই চুকলো আমার!

Table of Contents

ঘুঁটেপাড়ার সেই ম্যাচ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

চোরবাগান টাইগার ক্লাবের সঙ্গে পটলডাঙা থান্ডার ক্লাবের ফুটবল ম্যাচ হয়ে গেল। প্রথমে টাইগার ক্লাব ঝাঁ ঝাঁ করে আমাদের ছ'টা গোল ঢুকিয়ে দিলে, ওদের সেই ট্যারা ন্যাড়া মিত্তির একাই দিলে পাঁচখানা। আর বাকিটা দিলে আমাদের ব্যাক বলটুদা সেমসাইডে।

তারপরেই পটলডাঙা থানার ক্লাব পর পর ছ'টা গোল দিয়ে দিলে। টেনিদা দুটো, ক্যাব্‌লা তিনটে, দলের সবচেয়ে ছোট্ট আর বিচ্ছু ছেলে কম্বল দিলে একটা। তখন ভারি একটা গোলমাল বেধে গেল, আর গোলই হল না। রেফারি ফুর্‌র্‌ করে হুইসিল বাজিয়ে খেলা শেষ করে দিলেন।

ব্যাপারটা এই ঃ

আমাদের গোলকিপার পাঁচুগোপাল চশমা পরে। সেদিন ভুল করে ওর পিসিমার চশমা চোখে দিয়ে মাঠে নেমে পড়েছে। তারপর আর কী—একসঙ্গে তিনদিকে তিনটে বল দেখতে পায়, ডাইনের বলটা ঠেকাতে যায় তো বাঁয়েরটা গোল হয়ে যায়। বলটুদা আবার বুদ্ধি করে একটা ব্যাক পাস করেছিল, তাতে করে একটা সেমসাইড!

এখন হল কী, ছ'টা গোল দিয়ে টাইগার ক্লাব কি রকম নার্ভাস হয়ে গেল। আনন্দের চোটে ওদের তিনজন খেলোয়াড় অজ্ঞান হয়ে পড়ল, বাকিরা কেবল লাফাতে লাগল, সেই ফাঁকে বল ফেরৎ গেল ওদের গোলে। তখন সেই ফুর্তির চোট লাগল থান্ডার ক্লাবে—

Table of Contents

আর কে যে কোন্ দলে খেলছে খেয়ালই রইল না। টেনিদা বেমক্কা হাবুল সেনকেই ফাউল করে দিলে, আর ন্যাড়া মিত্তির তখন নিজেদের গোলে বল ঢোকাবার জন্যে মরিয়া। থান্ডার ক্লাবের দুজন তাকে জাপটে ধরে মাঠময় গড়াগড়ি খেতে লাগল। ব্যাপার দেখে রেফারি খেলা বন্ধ করে দিলেন, আর কোত্থেকে একটা চোঙা এনে সমানে ভাঙা গলায় চ্যাঁচাতে লাগলেন ঃ ড্র—ড্র—ড্রন্ গেম—এক্ষুণি সব মাঠ থেকে কেটে পড়ো, নইলে পুলিশ ডাকব —হুঁ!

সেদিন সন্ধ্যের পর এই নিয়ে দারুণ আলোচনা চলছিল আমাদের ভেতরে। হঠাৎ টেনিদা বললে,—ছোঃ, বারোটা গোল আবার গোল নাকি? একবার একাই আমি বত্রিশটা গোল দিয়েছিলুম একটা ম্যাচে।

অ্যাঁ! —চুয়িং গাম চিবুতে চিবুতে ক্যাবলা একটা বিষম খেলো।

হাবুল বললে হু,—ফাঁকা গোলপোস্ট পাইলে আমিও বায়ান্নখান গোল দিতে পারি।

—নো স্যার নো ফাঁকা গোল বিজনেস! দু-দলে এ ডিভিসন বি ডিভিশনের কমসে কম বারোজন প্লেয়ার ছিল। যা-তা খেলা তো নয়—ঘুঁটেপাড়া ভার্সাস বিচালিগ্রাম।

খেলাটা কোথায় হয়েছিল?

—ঘুঁটেপাড়ায়। কী পেলে, ইউসেবিয়ো, মূলার নিয়ে লাফালাফি করিস! জীবনে একটা ম্যাচে কখনো বত্রিশটা গোল দিয়েছে তোদের রিভেরা, জেয়ারজিন্হো? ববি চার্লটন তো আমার কাছে বেবি রে!

একটা মোক্ষম চাল মারতাছে—বিড় বিড় করে আওড়ালো হাবুল সেন।

হাবলার কপাল ভালো যে টেনিদা সেটা ভালো করে শুনতে পেলো না। বললে,—কী বললি, মোক্ষদা মাসি? কী করে জানলি রে? ওই মোক্ষদা মাসির বাড়িতেই তো আমি গিয়েছিলুম ঘুঁটেপাড়ায়। সেইখানেই তো সেই দারুণ ম্যাচ। কিন্তু মোক্ষদা মাসির খবর তোকে বলল কে?

আমি জানি—হাবুল পণ্ডিতের মতো হাসল।

ওর ওস্তাদী দেখে আমার রাগ হয়ে গেল। বললুম,—বল্ দেখি ঘুঁটেপাড়া কোথায়?

—ঘুইট্যাপাড়া আর কোথায় হইবো? গোবরডাঙার কাছেই। গোবর দিয়াই তো ঘুইট্যা হয়।

ইয়াহ্! —টেনিদা এত জোরে হাবুলের পিঠ চাপড়ে দিলে যে হাবুল চ্যাঁ করে উঠল। নাকটাকে জিভেগজার মতো উঁচু করে টেনিদা বললে,—প্রায় ধরেছিস। তবে ঠিক গোবরডাঙার কাছে নয়, ওখান থেকে দশ মাইল হেঁটে, দুই মাইল দৌড়ে—

দৌড়োতে হয় কেন? —ক্যাবলা জানতে চাইল।

—হয়, তাই নিয়ম। অত কৈফিয়ৎ চাসনি বলে দিচ্ছি। ওখানে সবাই দৌড়োয়। হল?

ক্যাবলা বললে,—হল। আর পথের বিবরণ দরকার নেই, গল্পটা বলো।

গল্প! —টেনিদা মুখটাকে গাজরের হালুয়ার মতো করে বললে, এমন একটা জলজ্যান্ত সত্যি ঘটনা, আর তুই বলছিস গল্প! শিগগির উইথড্র কর—নইলে এক চড়ে তোর নাক—

আমি বললুম,—নাগপুরে উড়ে যাবে।

ক্যাবলা বললে,—বুঝেছি। আচ্ছা আমি উইথড্র করলুম। কিন্তু টেনিদা—ইংরিজিতে উচ্চারণ উইদ্ড্র—উইথ্ ড্র নয়।

Table of Contents

আবার পণ্ডিতী! —টেনিদা গর্জন করল ঃ টেক কেয়ার ক্যাব্‌লা। ফের যদি বিচ্ছিরি একটা কুরুবকের মতো বকবক করবি তো এক্ষুনি একটা পুঁদিচ্চেরি হয়ে যাবে—বলে দিচ্ছি তোকে। যা—শিগগির আট আনার ঝালমুড়ি কিনে আন—তোর ফাইন!

আলুভাজা-আলুভাজা মুখ করে ক্যাব্‌লা ফাইন আনতে গেল। ওর দুর্গতিতে আমরা কেউ অবাক হলুম না—বলাই বাহুল্য। সব কথাতেই ক্যাব্‌লা এই রকম টিকটিকির মতো টিকটিক করে।

বুঝলি—ঝালমুড়ি চিবুতে চিবুতে টেনিদা বলতে লাগল ঃ ছ দিনের জন্যে তো বেড়াতে গেছি মোক্ষদা মাসির বাড়িতে। মেসোমশাই ব্যবসা করেন আর মাসিমা যা রাঁধেন না, খেলে অজ্ঞান হয়ে যাবি। মাসির রান্না বাটি-চচ্চড়ি একবার খেয়েছিস তো ওখান থেকে নড়তেই চাইবি না—ঘুঁটেপাড়াতেই ঘুঁটের মতো লেপটে থাকবি।

আমার খুব মনের জোর, তাই বাটি-চচ্চড়ি আর ক্ষীরপুলির লোভ কাটিয়েও কলকাতায় ফিরে আসি। সেবারেও গেছি—দুটো দিন একটু ভালোমন্দ খেয়ে আসতে। ভরা শ্রাবণ, থেকে থেকেই ঝুপঝাপ বৃষ্টি হচ্ছে। সেদিন সকালে মাসিমা তালের বড়া ভেজে ভেজে তুলছেন আর আমি একটার পর একটা খেয়ে যাচ্ছি। এমন সময় ক'টা ছেলে এসে হাজির।

অনেকবার তো ঘুঁটেপাড়ায় যাচ্ছি, ওরা সকলে আমায় চেনে। বললে,—টেনিবাবু, বড়ো বিপদে পড়ে আপনার কাছে ছুটে এলুম। আজ বিকেলে শিবতলার মাঠে বিচালিগ্রামের সঙ্গে আমাদের ফুটবল ম্যাচ। ওরা ছ'জন প্লেয়ার কলকাতা থেকে হায়ার করেছে, আমরাও ছ'জন এনেছি। কিন্তু মুশকিল হল আমাদের এখানকার একজন জাঁদরেল খেলোয়াড় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আপনাকেই আমাদের উদ্ধার করতে হচ্ছে দাদা।

জানিস তো, লোকের বিপদে আমার হৃদয় কেমন গলে যায়। তবু একটু কায়দা করে বললুম,—সব হায়ার করা ভালো ভালো প্লেয়ার, ওদের সঙ্গে কি আর আমি খেলতে পারব? তা ছাড়া এ বছরে তেমন ফর্ম নেই আমার। ওরা তো শুনে হেসেই অস্থির।

—কী যে বলেন স্যার, আপনি পটলডাঙার টেনিরাম শর্মা—আপনার ফর্ম তো সব কাজে, সব সময়েই থাকে। প্রেমেন মিত্তিরের ঘনাদা, হেমেন্দ্রকুমারের জয়ন্ত, শিব্রামের হর্ষবর্ধন —এদের ফর্ম কখনো পড়তে দেখেছেন?

আমি হাত জোড়া করে প্রণাম করে বললুম,—ঘনাদা, জয়ন্ত, হর্ষবর্ধনের কথা বলবেন না—ওঁরা দেবতা—আমি তো স্রেফ নস্যি। ওঁরা যদি গরুড় পাখি হন, আমি স্রেফ চড়ুই।

ওরা বললে,—অত বুঝিনে দাদা, আপনাকে ছাড়ছিনে। আমাদের ধারণা মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল, আপনি ইচ্ছে করলে বিশ্ব একাদশে খেলতে পারেন। আর আপনি যদি চড়ুই পাখি হন, আমরা তা হলে—কী বলে মশা!

আমি বললুম,—ঘুঁটেপাড়ার মশাকে তুচ্ছ করবেন না মশাই, এক একটা প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা।

ওরা হেঁ-হেঁ করে চলে গেল, কিন্তু আমাকে রাজি করিয়েও গেল, আমার ভীষণ ভাবনা হল রে। থান্ডার ক্লাবে যা খেলি—তা খেলি, কিন্তু অতগুলো এ-ডিভিশন বি-ডিভিশন খেলোয়াড়ের সামনে! ওরা না হয় আপ করে গেল, কিন্তু আমি দাঁড়াব কি করে?

কিন্তু ফিরিয়েও তো দেওয়া যায় না। আমার নিজের প্রেস্টিজ—পটলডাঙার প্রেস্টিজ

Table of Contents

সব বিপন্ন! কোন্ দেবতাকে ডাকি ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মা নেংটীশ্বরীকে মনে পড়ে গেল। আরে সেই নেংটীশ্বরী—আরে সেই যে রে—'কম্বল নিরুদ্দেশে'র ব্যাপারে যে দেবতাটির সঙ্গে আমাদের দেখা হয়ে গিয়েছিল। মনে মনে বলতে লাগলুম, এ বিপদে তুমিই দয়া করো মা—গোটা কয়েক নেংটি ইঁদুর পাঠিয়ে দাও তোমার—খেলার সময় ওদের পায়ে কুটুর কুটুর করে কামড়ে দিক। নিদেন পক্ষে পাঠাও সেই 'অবকাশরঞ্জিনী' বাদুড়কে—সে ওদের সকলের চাঁদি ঠুকরে বেড়াক।

এ সব প্রার্থনা-ট্রার্থনা করে—শ-দেড়েক তালের বড়া খেয়ে আবার বেশ একটা তেজ এসে গেল। কেবল মনে হতে লাগল, আজ একটা এস্‌পার-ওস্‌পার হয়ে যাবে। তখন কি জানি, গুনে গুনে বত্রিশটা গোল দিতে পারব, আমি একাই?

বিকেলে আকাশ জুড়ে কালো কালো হাতির পালের মতো মেঘ। মনে হল, দুর্দান্ত বৃষ্টি নামবে। তবু মাঠে গিয়ে দেখি বিস্তর লোক জড়ো হয়ে গেছে। এক দল হাঁকছে ঃ 'বিচালিগ্রাম—হিপ্ হিপ্ হুররে—' আর একদল সমানে উত্তোর চড়াচ্ছে ঃ 'ঘুঁটেপাড়া—হ্যাপ্-হ্যাপ্-হ্যার্‌রে!'

ক্যাব্‌লা হঠাৎ আঁৎকে উঠল ঃ হ্যাপ্-হ্যাপ্-হ্যার্‌রে মানে কী? কখনো তো শুনি নি।

—ওটা ঘুঁটেপাড়ার নিজস্ব স্লোগান। ওরা হিপ্-হিপ্ বলছে কিনা, তাই পালটা জবাব। ওরাও যদি হিপ্-হিপ্ করে, তা হলে এরা বলবে না, এদের নকল করছে? ওরা যদি বলতো বিচালিগ্রাম জিন্দাবাদ—এরা সঙ্গে সঙ্গে বলতো ঘুঁটেপাড়া মুর্দাবাদ।

—অ্যাঁ, মুর্দামাদ! নিজেদেরই?

—হ্যাঁ, নিজেদেরই। পরের নকল করে অপমান হওয়ার চাইতে মরে যাওয়া ভালো —বুঝলি না?

—বিলক্ষণ! আচ্ছা—বলে যাও।

এতেই বুঝতে পারছিস, দুটো গ্রামে রেষারেষি কি রকম। দারুণ চিৎকারের মধ্যে তো খেলা শুরু হল। দু-মিনিটের মধ্যেই বুঝতে পারলুম, বিচালিগ্রামকে এঁটে ওটা অসম্ভব। এরা ছ'জনই এ ডিভিশনের প্লেয়ার এনেছে—খেলায় তাদের আগুন ছোটে। আর ওদের গোলকিপার! সে একবার ছ'হাত লাফিয়ে ওঠে, তার লম্বা লম্বা হাত বাড়িয়ে বল তো বল, বন্দুকের গুলি অব্‌দি পাক্‌ড়ে নিতে পারে।

ঘুঁটেপাড়ায় মাত্র দুজন এ-ডিভিশনের, বাকি চারজনই বি-ডিভিশনের। এ-মার্কা দুজনও ওদের তুলনায় নীরেস। খেলা শুরু হতে না হতেই বল এসে একেবারে ঘুঁটেপাড়ার ব্যাক লাইনে চেপে পড়ল, মাঝ মাঠও আর পেরোয় না। আর ওদের গোলকিপার শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগল ঃ একটা বালিস আর সতরঞ্চি দাও হে—একটু ঘুমিয়ে নেব।

আমি আর কি করব—মিড্-ফিল্‌ডে দাঁড়িয়ে আছি, দাঁড়িয়েই আছি। নিতান্তই ঘুঁটেপাড়ার বাকি দশজনই ডিফেন্স লাইনে দাঁড়িয়ে আছে তাই গোল হচ্ছে না—কিন্তু দেখতে দেখতে ওরা গোটা পাঁচেক কর্নার কিক পেয়ে গেল। আর কতক্ষণ ঠেকাবে!

আমি তখনো মা নেংটীশ্বরীকে ডাকছি তো ডাকছিই। এমন সময় আকাশ ভেঙে ঝমঝম বৃষ্টি। এমন বৃষ্টি যে চারদিক অন্ধকার। কিন্তু পাড়াগেঁয়ে লোক, আর কলকাত্তাই খেলোয়াড়ের গোঁ—খেলা দাপটে চলতে লাগল। বল জলে ভাসছে—ধপাধপ আছাড়—এই ফাঁকেও পর-পর দুখানা গোল খেয়ে গেল ঘুঁটেপাড়া। ভাবলুম,—যাঃ, হয়ে গেল!

Table of Contents

বিচালিগ্রাম তারস্বরে চিৎকার করছে, হঠাৎ এদিকের লাইন্‌সম্যান ফ্ল্যাগ ফেলে মাঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বললে,—শিবতলার পুকুর ভেসেছে রে—মাঠ ভর্তি মাছ!

অ্যাঁ—মাছ!

দেখতে দেখতে যেন ম্যাজিক। গাঁয়ের লোকে বর্ষায় পুকুর-ভাসা মাছ তো ধরেই, কলকাতার ছেলেগুলোও আনন্দে ফেঁপে গেল। রইল খেলা, রইল বিচালিগ্রাম আর ঘুঁটেপাড়ার কম্পিটিশন—তিনশো লোক আর একুশজন খেলোয়াড়, দুজন লাইন্‌সম্যান—সবাই কপাকপ মাছ ধরতে লেগে গেল। প্লেয়াররা জার্সি খুলে ফেলে তাতেই টকাটক মাছ তুলতে লাগল। খেলতে আর বয়ে গেছে তাদের।

এই রে, মস্ত একটা শোল মাছ পাকড়েছি।

আরে—একটা বাটা মাছের ঝাঁক যাচ্ছে রে।

ঈস্—কী বড়ো বড়ো কই মাইরি! ধর্‌-ধর্‌—

সে যে একখানা কী কাণ্ড, তোদের আর কী বলব! খেলার মাঠ ছেড়ে ক্রমেই দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল সবাই। শেষে দেখি, মাঠে আমরা দুজন। আমি আর রেফারি।

রেফারি ওখানকার স্কুলের ড্রিল-মাস্টার। বেজায় মারকুটে, ভীষণ রাগী। দাঁত খিঁচিয়ে বললেন,—হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছো কী? ইয়ু গো অন্‌ প্লেয়িং!

ঘাবড়ে গিয়ে বললুম,—আমি একাই খেলব?

ঈয়েস—একাই খেলবে। আমি তো খেলা বন্ধ করি নি। —ধমক দিয়ে রেফারি বললেন,—খেলো। প্লেয়াররা মাঠ ছেড়ে মাছ ধরতে দৌড়োলে খেলা বন্ধ করে দিতে হবে, রেফারিগিরির বইতে এমন কোনো আইন নেই।

তখন শুরু হল আমার গোল দেবার পালা। একবার করে বল নিয়ে গিয়ে গোল দিয়ে আসি, আর রেফারি ফুরর করে বাঁশি বাজিয়ে আবার সেন্টারে নিয়ে আসে। এই-ই চলতে লাগল।

ওদের দু-একজন বোধ হয় টের পেয়ে ফেরবার কথা ভাবছিল, এমন সময় মা নেংটীশ্বরীর আর এক দয়া। মাঠের কাছেই ছিল সারে সারে তালগাছ। হঠাৎ হু হু করে ঝোড়ো হাওয়া, আর ঝপাস-ঝপাস করে পাকা তাল পড়তে লাগল।

তাল পড়ছে—তাল পড়ছে—

যারা ফিরতে যাচ্ছিল, তারা প্রাণপণে ছুটল তা কুড়োতে।

এর মধ্যে আমি যা গোল দেবার দিয়ে দিয়েছি—মানে গুনে গুনে বত্রিশটি! আমি গুনছি না, গোল দিতে দিতে আমার মাথা বোঁ বোঁ করছে, আর ওই ভারী ভেজা বল বার বার সেন্টার থেকে জলের ওপর দিয়ে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছি—চাড্ডিখানি কথা নাকি! একবার বলেছিলুম, অনেক তো গোল দিয়েছি স্যার, আর পারছি না—পা ব্যথা করছে! রেফারি আমায় তেড়ে মারতে এলেন, বিকট মুখে ভেংচে বললেন,—ইয়ু গো অন গোলিং—আই সে!

গোলিং আবার ইংরেজি হয় নাকি—ক্যাবলা বলতে যাচ্ছিল, টেনিদা একটা বাঘা ধমক দিয়ে বললে,—ইয়ু শাট আপ! যে মারকুটে মাস্টার, তার ইংরিজির ভুল ধরবে কে? আমি গোল দিচ্ছি আর উনি গুনেই যাচ্ছেন, থার্টি-থার্টি ওয়ান—থার্টি টু—

ওরে গোল দিচ্ছে বুঝি—বলে ওদের সেই গোলকিপারটা দৌড়ে এল। সে যে রকম

Table of Contents

জাঁদরেল, হয়তো একাই বত্রিশটা গোল ফেরত দিত, আমি আটকাতে পারতুম না—বেদম হয়ে গেছি তখন। কিন্তু রেফারি তক্ষুনি ফাইন্যাল হুইসেল বাজিয়ে দিলেন। দিয়ে বললেন,—খেলা ফিনিস। তারপর আমাকে বললেন,—এখন যাও—কই মাছ ধরো গে, তাল কুড়োও গে।

কিন্তু তখন কি আর মাছ, তাল কিছু আছে? খেলা ফিনিসের সঙ্গে তাও ফিনিস! অতগুলো লোক!

টেনিদা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ঃ তখন প্রাণের আনন্দে মাছ ধরে আর তাল কুড়িয়ে বিচালিগ্রাম চিল্লোতে লাগল, থ্রী চিয়ার্স ফর বিচালিগ্রাম, আর ঘুঁটেপাড়া চ্যাঁচাতে লাগল, থ্রী টীয়ার্স ফর ঘুঁটেপাড়া!

টীয়ার্স? মানে চোখের জল? —ক্যাব্‌লা আবার বিস্মিত হল।

হাঁ—হাঁ—টীয়ার্স। পালটা জবাব দিতে হবে না? সে যাক। কিন্তু একটা ম্যাচে একাই বত্রিশটা গোল দিলুম, পেলে-ইউসেবিয়ো-রিভেরা-চার্লটন সব কাৎ করে দিলুম, কিন্তু একটা কই মাছ, একটা তালও পেলুম না—এ দুঃখ মরলেও আমার যাবে না রে! —আবার বুক ভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলল টেনিদা।

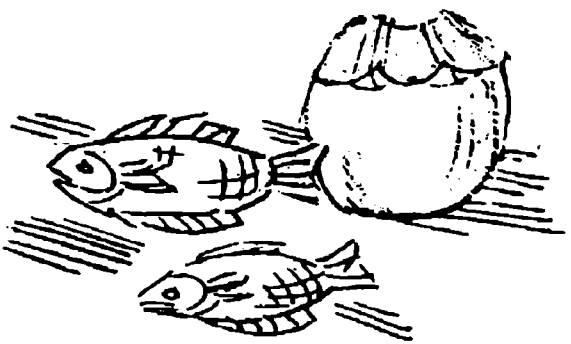

Table of Contents

পিন্‌ডিদার সিংহ

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

ব্রেজিলের স্মরণীয় ফুটবল প্লেয়ার নারায়ণ দত্ত অর্থাৎ পি এন ডি অন্যথায় সেখানকার জনতার উল্লাসের 'পিন্‌ডি' মানে এখন আমাদের এই বর্ধমানের বাবুগঞ্জের পিন্‌ডিদা যে শিকার আর প্রাণিজগৎ সম্পর্কেও এমন বিশারদ সেটা এই প্রথম জানলাম আমরা, আর জেনে হাঁ হয়ে গেলাম। অঘটনের ফলে হাঁটুর চাকতি খুলে ফুটবলের দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে না হলে সেও যে পৃথিবীর বাছাই একাদশের একজন হতে যাচ্ছিল এখন সেটা আমরা প্রায় বিশ্বাসই করি। সেই বাছাইয়ের নম্বর একবার পিঠে লাগিয়ে মাঠে নামার সুযোগ পেলে হাঁটুর চাকতি খোলা কেন—ঠ্যাং কেটে বাদ দিলেও পিন্‌ডিদার রাজার হালে কাল কেটে যেত। কিন্তু পিন্‌ডিদার সে-জন্যে খুব একটা আক্ষেপ নেই। সে স্পোর্টসম্যান, তার মতে জীবনটাই একটা স্পোর্ট। এতে ওঠা-নামা না থাকলেই জীবন বিস্বাদ।

আর, এখন আমাদেরও এমন অবস্থা যে সামনের ওই আধ-হাত প্রমাণ উঁচু জায়গাটাতে একটা দিন পিন্‌ডিদা এসে না বসলে সকলের জীবন বিস্বাদ। অথচ ওই হোঁৎকা

Table of Contents

হেবো ছাড়া আমরা বাকি চারজন, অর্থাৎ আমি, চটপটি, কেবলু আর কার্তিক সর্বদাই যে পিন্‌ডিদার ওপর তুষ্ট এমন নয়। বোকা-বোকা মুখ করে, আর ঠোঁটের ফাঁকে আকাশের প্রায় মুছে যাওয়া বাঁকা চাঁদের মতো একটু হাসি বুলিয়ে পিন্‌ডিদা যার দিকে তাকায় তারই বুকের ভেতরটা গুড়ুগুড়ু। বরফে পালিশ করা ছুরির মতো কখন যে এক-একটা প্রাণান্তকর বিদ্রূপ কার মাথা থেকে পা পর্যন্ত কেটে দিয়ে যাবে ঠিক নেই। আমাদের মধ্যে হোঁৎকা মানে হাবুলটাকেই পিন্‌ডিদা যা একটু স্নেহের চোখে দেখে। মেজাজ বিগড়লে পিন্‌ডিদা তাকেও যে এক হাত নেয় না এমন নয়। কিন্তু ওটার গণ্ডারের চামড়া। তারপর পিন্‌ডিদাকে তোয়াজ তোষামোদে খুশি রাখার জন্য যা করে সেও আমাদের দ্বারা হয় না। কথায় কথায় পিন্‌ডিদার পায়ের ধুলো নেয়। পিন্‌ডিদা ওকে কখনো কোণঠাসা করলে ও রাগত চোখে আমাদের বলে, মুখ টিপে হাসছিস, গুরুর কোণঠাসা যে আশীর্বাদের মতোই সেটা যেদিন দেখবি সেদিন হাসির বদলে হিংসে করবি আমাকে। তারপর ভাবের বন্যা চোখে এনে বলে, পিন্‌ডিদা, তুমি আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে দিলে। আর কখনো এ-রকম বোকামি করব না, দেখে নিও।

পিন্‌ডিদা যত উঁচু দরের মানুষই হোক—মানুষ তো বটে। এরকম চাটু বাক্যে কোন্ দুর্বাসা না সদয় হয়। আমাদের আবার এই কারণেই হাবুলের ওপর রাগ। কিন্তু সেই রাগও অনেক সময় চেপে যেতে হয়, কারণ কিছু বললেই ও দ্বিগুণ রেগে গিয়ে এমন করে পিন্‌ডিদার দিকে তাকায় যেন অপমানটা তারই। ফলে পিন্‌ডিদা ওরই ওপর সদয় হয়ে মিছরির ছুরি দিয়ে আমাদেরই গায়ের ছালচামড়া ছাড়ানোর ফাঁক খোঁজে।

যাক, দলের মধ্যে পিন্‌ডিদার সম্পর্কে সব থেকে সজাগ আর সতর্ক থাকতে হয় আমাকেই। প্রথম কারণ, পিন্‌ডিদার সর্বদাই আমার পকেটের ওপর সব থেকে বেশি চোখ। ওই হেবো হতভাগাটাই নিশ্চয় আমার পকেটের খবর তাকে দিয়ে থাকবে। ঠাকুমার একটি মাত্র আদরের নাতি আমি। একটু প্যাঁচ কষলেই তার কাছ থেকে টাকা বার করতে পারি। আর আমার পকেট থেকে সেই টাকা প্যাঁচ কষে বার করে নেবার ব্যাপারে পিন্‌ডিদা আবার সিদ্ধহস্ত। অনেক ঠকে আমাকে তাই মুখ শুকিয়ে শূন্য পকেট দেখাতে হয়। কিন্তু হাবুলের বিশ্বাসঘাতকতার ফলেই পিন্‌ডিদা সর্বদা সেটা বিশ্বাস করে না। আর দ্বিতীয় কারণ পিন্‌ডিদার হুল ফোটানোর সব থেকে সেরা শিকারও আমিই।

বুদ্ধির খেলায় এতদিন আমিই ছিলাম দলের প্রধান, সেখানে পিন্‌ডিদার পঞ্চাশগুণ প্রাধান্যের অধিকার আমি মেনে নিলেও অন্ধের মতো সর্বদা তার সকল কথায় সায় দিয়ে উঠতে পারি না। কেবলু কার্তিক বা চটপটিরও অনেক সময় সংশয় উপস্থিত হয়। কিন্তু সাহস করে আর হাবুলের বোকামার্কা রাম গাঁট্টার ভয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেক সময় তারা মুখ বুজে থাকে। কিন্তু আমি অতটা পেরে উঠি না। তাছাড়া পিন্‌ডিদার কোনো কথার জবাবে সন্দেহ প্রকাশ না করলে বা একটু-আধটু তর্ক না তুললে আসর জমে কি করে?

যাক, এবারে আসল কথায় আসি। সেদিন বিকেলের আসরে আলোচনার বিষয় ছিল বাঘ এবং সিংহ। পিন্‌ডিদার আধ-হাত উঁচু জায়গায় বসে ছিল, সামনে আমরা। জাতীয় পশু হিসেবে সিংহকে বাতিল করে সে-জায়গায় বাঘকে এনে বসানো হয়েছে—সেটাই যে একমাত্র বিবেচনার কাজ হয়েছে আমার কলকাতার পদস্থ অফিসার কাকার মুখে শোনা বুলি আউড়ে যাচ্ছিলাম। বলছিলাম, বাঘ আমাদের একেবারে নিজস্ব পশু, সে-জায়গায় প্রায় পরদেশী সিংহকে এ-রকম সম্মান দেওয়ার কোনো অর্থই হয় না, এতদিনে একটা ভুল শুধরানো হয়েছে মাত্র, ইত্যাদি।

Table of Contents

আড়চোখে শুধু আমি কেন, সকলেই এক-একবার পিন্‌ডিদার দিকে তাকাচ্ছিল। কিন্তু পিন্‌ডিদার কানে কিছু যাচ্ছে কিনা সন্দেহ। মাঝে মাঝে হাই তুলছিল, নিরাসক্ত মুখে দূরের আকাশ দেখছিল, ঘাড় বাঁকিয়ে উড়ন্ত পাখি দেখছিল, আর মাঝে মাঝে দাঁতে দাঁত ঘষে কল্পিত চানাচুর, ডালমুট চিবুচ্ছিল বোধহয়। কিছু একটু চিবুতে না পারলে পিন্‌ডিদার মুড আসে না—কিন্তু অনেক গচ্চা দিয়ে আমিও সেয়ানা হয়ে গেছি। বিকেলের আসরে এসে বসার সময় পকেট ঝেড়েঝুড়ে আসি। কখনো দু-এক আনা সংগ্রহ করতে পারলে হেবো চানাচুর কিনে পুজোর নৈবিদ্যের মতো ঠোঙাসুদ্ধু পিন্‌ডিদার দিকে এগিয়ে দেয়। আমার ধারণা, আমাদের ভাগ দেবার ভয়েই পিন্‌ডিদা তখনো নিরাসক্ত অন্যমনস্কভাবে প্রাকৃতিক শোভা দেখতে দেখতে চানাচুরের ঠোঙা শেষ করে। কিন্তু আজ হাবুলের পকেটও শূন্য।

আমার কথা শেষ হতেই আবার একটা হাই তুলে ক্লান্তিকর বিরক্তির সুরে পিন্‌ডিদা বলে উঠল, কি যে বাজে কপচাচ্ছিস সেই থেকে ঠিক নেই। বাঘও চিনিস না সিংহও চিনিস না, মাঝখান থেকে বকিয়ে মাথা ধরিয়ে দিচ্ছিস।

মজার গন্ধ পেয়ে মোটা হাবুল নড়েচড়ে বসে কুতকুত করে তার গুরুর দিকে তাকালো। চটপটি কার্তিক কেবলুও উৎসুক চোখে আমার দিকে ফিরল, অর্থাৎ, এই নস্যাৎ করে দেওয়াটা বরদাস্ত করি কি না, সেই কৌতূহল।

আমার আত্মাভিমানে লাগল ঠিকই। বাঘ সিংহ চিড়িয়াখানায় কত দেখেছি ঠিক নেই। বাইরের বইয়ের মধ্যে শিকারের গল্পই আমি গোগ্রাসে গিলি। বিলিতি শিকারের ছবি দেখানো হচ্ছে খবর পেলে পাগলের মতো দেখতে ছুটি। হিংস্র জানোয়ার সম্পর্কে আমার যা জ্ঞান তার ধারে কাছেও কেউ যেতে পারে কিনা আমার সন্দেহ।

আমি জবাব দিলাম,—বাঘও চিনি সিংহও চিনি—অনেকের থেকে ভালোই চিনি।

মুখের দিকে এমন করে খানিক চেয়ে রইল পিন্‌ডিদা যেন আমিই অদ্ভুত জীব একটা।

—কি করে চিনিস, বই পড়ে?

—তুমি কি করে চেনো, ওদের সঙ্গে মেলামেশা করে?

মুখের ওপর এমন বেয়াদপি প্রশ্ন শুনে হাবুল চোখ পাকালো। কিন্তু পিন্‌ডিদাকে রাগতে না দেখে পাকানো চোখ আবার ঠাণ্ডা করল। পিন্‌ডিদা ঠোঁটের ফাঁকে খুব ঠাণ্ডা এক টুকরো হাসির রেখা ফুটিয়ে জবাব দিল, তাও বলতে পারিস।

কার্তিক সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করল,—সামনা-সামনি বাঘ সিংহ দেখেছ নাকি তুমি পিন্‌ডিদা?

বাঘ না, সোনা সিংহের সঙ্গে তুলনা করছিল, সিংহ দেখেছি—বন্দুক ছেড়ে একেবারে খালি হাতেও সামনা-সামনি বিশ গজের মধ্যে দেখেছি।

বরাবর সংস্কৃতয় ফেল মারা কেবলু বলে উঠল,—চিড়িয়াখানায় নাকি?

পিন্‌ডিদা ভুরু কুঁচকে তাকালো তার দিকে। তারপর সংস্কৃততে ব্যঙ্গ করে উঠল, —মস্তকে গোবরং—হেবোকে বলব গাঁট্টার চোটে গোবর ফাঁক করে দিতে?

হাবুল মহাখুশি। কিন্তু পিন্‌ডিদার আসল লক্ষ্য আমি। ঠাণ্ডা চোখ দুটো আমার মুখের ওপর বুলিয়ে বললো,—সিংহের মেজাজ সম্পর্কে কতটুকু জানিস যে মাতব্বরের মতো মাস্টারি করছিস?

আমারও রোখ চাপল, জবাব দিলাম,—মেজাজের কোন্ দিকটা জানি না সেটা বলো।

Table of Contents

যতো বড় প্লেয়ারই হোক, পিন্‌ডিদা বাঘ সিংহ সম্বন্ধে আমার থেকে বেশি খবর রাখে এ আমি বিশ্বাস করতে রাজি নই।

চটপটির এর মধ্যে আমার দিকে একটু বেশি টান। পিন্‌ডিদাকে আরো একটু তাতিয়ে তোলার জন্য সায় দিয়ে মন্তব্য করল,—যাই বলো পিন্‌ডিদা, জন্তু-জানোয়ারের আচার আচরণ সম্পর্কে সোনাকে মোটামুটি এক্সপার্ট বলতে পারো—ঢের পড়াশুনা করেছে।

জবাবে পিন্‌ডিদা আমাকে ছেড়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে এমন একটা হাসি হাসলে যা দেখলে সত্যিই পিত্তি জ্বলে যায়। সেই হাসির সঙ্গে বিস্ময়ে হাবুডুবু খাওয়া মুখ—তাই নাকি! সোনার এত গুণ! এরপর ডাক্তারির বই পড়ে কোন্‌দিন বলবে বড় বড় অপারেশনের ব্যাপারেও সোনা একজন মস্ত এক্সপার্ট। বলি, সিংহকে যে খাটো করে মাতব্বরী করছিস, সত্যিকারের সিংহর পাল্লায় কোনদিন পড়েছিস? হ্যাঁ রে সোনা?

রাগে আমার মুখ কালো। কিন্তু আমি কিছু বলার আগেই কেবলু এবারে একটু সংস্কৃত ঝাড়ার মওকা পেল। বললো, তার মানে পিন্‌ডিদা তুমি বলতে চাও সোনা বালভাষিতং অমৃতং!

ঠিক ধরছিং। —পিন্‌ডিদা একটা প্রায় ভেঙচি কেটে আবার আমার দিকেই ফিরল, বলি জীবনে ক'টা ছাড়া সিংহর সঙ্গে মোকাবিলা করেছিস যে তাদের আচার-আচরণ সম্পর্কে একেবারে বেদব্যাস হয়ে বসে আছিস?

এবারে ভয়ে ভয়ে কার্তিক জিজ্ঞাসা করল,—তুমি নিজের হাতে মোকাবিলা করেছ নাকি?

পিন্‌ডিদার ঠাণ্ডা দুই চক্ষু এবারে ওকে নস্যাৎ করে নিল একদফা। তারপর মোলায়েম করে পাল্‌টা প্রশ্ন করল,—বলি ব্রেজিল জায়গাটার কতটুকুতে মানুষ বাস করে, আর কতটা জায়গা জুড়ে জন্তুজানোয়ার বাস করে—মানে কতটা সূর্যের আলো ঢোকে না এমন জঙ্গল—সে সম্পর্কে ছিটেফোঁটা জ্ঞান আছে না তাও নেই ?

হাবুল হতভাগা হাসি-হাসি মুখে সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যে ফলিয়ে বললো,—প্রায় সবটাই তো জঙ্গল—আর সিংহের সংখ্যাও নিশ্চয় মানুষের থেকে বেশি সেখানে—তাই না পিন্‌ডিদা?

পিন্‌ডিদা সস্নেহে একবার তাকালো তার দিকে। ওর কথার জবাব না দিয়ে অন্য সকলের উদ্দেশে গলা দিয়ে এমন একটা শব্দ বার করল যেন একসঙ্গে এতগুলো অর্বাচীন আর দেখেনি। বলল,—ও-দেশ থেকে আসার সময় সঙ্গে সাত-সাতটা নানারকমের বন্দুক আর রাইফেল ছিল। বম্বেতে পা দিয়েই সে-সব জমা করে দিতে হয়েছে—নইলে পুলিশের টানা হেঁচড়ায় প্রাণান্ত। আর হাঁটুর চাকতিই যখন গেছে ও-সব বয়ে বেড়িয়ে আর কি লাভ।... আট-দশটা শিকারের অ্যালবাম ছিল, সে-সব দেখলে তোদের মতো বীর পুরুষেরা মূর্ছা যেত কিনা কে জানে—লন্ডনের কালচার অ্যাসোসিয়েশনে সেগুলো একরকম ছিনিয়েই নিল—যদি একটাও আনতাম সোনার জন্য, আফশোস থাকত না।

শুনে হাবুল বিস্ময়ে টইটম্বুর, নতুন করে আবার যেন পিন্‌ডিদাকে দেখছে। ওদিকে চটপটি কার্তিক কেবলুও মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল, আমিও হঠাৎ কেমন হকচকিয়ে গেলাম, কি বলব ভেবে পেলাম না। বিশ্বাস হচ্ছে না—সেটাও আর তেমন জোর দিয়ে বলতে পারছি না।

এবারে আনন্দে গদগদ হেবো হোঁতকাটাই মওকা পেয়ে বলে উঠল,—তাহলে

Table of Contents

পিন্‌ডিদা নিজের দুই-একটা অভিজ্ঞতার ঘটনা বলে আমাদের জানোয়ার এক্সপার্ট সোনাকে সিংহের আচরণ সম্পর্কে একটু সমঝে দাও না?

পিন্‌ডিদা অল্প অল্প হাসতে লাগল। টেনে টেনে বলল,—এতবড় এক্সপার্টকে সমঝে দেব না, একটা ঘটনা বলে সামান্য একটু যাচাই করব। ঘটনাটা সম্পর্কে সিংহের রাজসিক মেজাজ আর আচরণ নিয়ে একটা মাত্র প্রশ্ন করব—শুধু সোনা কেন, পুরো একটা দিন চটপটি, কেবলু, কার্তিকের সঙ্গে মাথা খাটিয়ে জবাব দিক। সেই একটা সামান্য প্রশ্নের দশটা জবাব দিক ওরা—দশটার মধ্যে একটা জবাবও ঠিক হলে আমি দশটাকা বাজি হারব—আর দশটার একটাও ঠিক না হলে সোনার দল দশ টাকা হারবে—কি হে সোনামণিরা, রাজি?

বাজির কথা উঠতে সকলেই সচকিত, কেবল হেবো হোঁতকার আনন্দ ধরে না। যে-ই জিতুক তার ষোল আনা লাভ। বাজির ব্যাপারে বাদ পড়লেও খাওয়ার ব্যাপারে তো পিন্‌ডিদা ওকে ডাকবেই।

পিন্‌ডিদাকে দশ টাকা বাজিতে নামতে দেখে আমি অবাক—সেও আবার দশটা জবাবের মধ্যে একটা জবাব ঠিক হলেই সে হারবে। সিংহের মেজাজ বা আচরণ সম্পর্কে এমন কি প্রশ্ন হতে পারে যে পুরো চব্বিশ ঘণ্টা ভেবেও দশটা জবাবের মধ্যে একবারও ঠিক বলতে পারব না? তাছাড়া চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দরকার হলে এনসাইক্লোপেডিয়া পর্যন্ত ঘাঁটাঘাঁটি করতে পারব। এছাড়া অন্য বইও আছে।

সবার ওপরে মানের প্রশ্ন। ওয়ান ইজ টু টেন বাজি ধরার হিম্মতও যদি না থাকে—প্রেস্টিজ থাকে কি করে। ওদিকে চটপটি, কেবলু, কার্তিক অসহায় মুখে আমার দিকে চেয়ে আছে। হারলে ওরা সমান ভাগ নিতে কখনই রাজি হবে না জানা কথা—আবার জেতার লোভও পুরো মাত্রায় আছে।

আমি জবাব দিলাম, ঠিক আছে—তুমি হারলে হেবো শেয়ার নেবে, না দশ টাকা তুমি একলাই দেবে?

পিন্‌ডিদা মুখ শুকিয়ে জবাব দিল, আমি একলা দেব—ও বেচারাকে আর মিথ্যে লোকসানের মধ্যে টানি কেন।

ফলে আমার গোঁ আরও বেড়ে গেলো। বললাম, যে চটপটি, কেবলু আর কার্তিককে আমি দলে নিলেও হারলে দশ টাকা আমি একলাই দেব। কিন্তু আমরা জবাব দিলে তুমি যদি ইচ্ছে করে বলো জবাব ঠিক হয়নি?

পিন্‌ডিদা ভুরু কুঁচকে তাকালো আমার দিকে—এত অধঃপতন হয়েছে তোর! পিন্‌ডিদা দশটা টাকার জন্য মিছে কথা বলবে?... ঠিক আছে, প্রশ্নের উত্তর আমি কাল কাগজে লিখে আনব। আর ওই একটা প্রশ্নের দশ-দশটা উত্তর তোরাও আর একটা কাগজে লিখে নিয়ে আসবি। তারপর আমার উত্তর লেখা কাগজ তোর হাতে দেব—তোদেরটা আমার হাতে দিবি। তোদের সবকটা উত্তর পড়া হলে তারপর আমার উত্তরটা দেখবি। দশটা জবাবের একটা জবাবও ঠিক হলে তক্ষুনি দশ টাকা দিয়ে দেব। —এবার বিশ্বাস হচ্ছে?

এরপর আর অবিশ্বাসের কোনো প্রশ্নই থাকতে পারে না। আমি তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে পিন্‌ডিদার হাত ধরলাম। অর্থাৎ, এর ওপর আর কোনো কথা নেই।

পিন্‌ডিদা চিবিয়ে চিবিয়ে শুরু করল, আগে ঘটনাটা বলি শোন্। ব্যাপারটা ঘটেছিল ব্রেজিলের ম্যানটশ থেকে মাইল তিরিশ দূরের একটা জঙ্গলে। সেই জঙ্গলের একজন

Table of Contents

কেয়ারটেকারের অতিথি হয়ে দিনকতক ছিলাম আমি। তার কোয়ারটারস-এর পর থেকেই জঙ্গল শুরু।

সকলে উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনছি। বাজির ব্যাপার আছে পরে, তাই প্রতিটি কথা মনে গেঁথে নেওয়ার তাগিদ আমাদের।

পিন্‌ডিদা বলতে লাগল, এক দুপুরে অন্যমনস্কের মতো বেড়াতে বেড়াতে কতদূরে যে চলে গেছি খেয়াল নেই। আসলে মাথায় তখন ফুটবল ঘুরছিল আমার।

...হঠাৎ চমকে উঠে দেখি সামনে তিরিশ গজের মধ্যে পেল্লায় এক সিংহ—কালচে মেটে রং, ঘাড়ে-গর্দানে দেড় হাত ফাঁপানো কেশর। আমার খালি হাত, সঙ্গে একটা বন্দুক পর্যন্ত নেই। আমার হাত-পা অসাড়।

কয়েক পলকের মধ্যেই সেই বিরাট সিংহ বিকট এক গর্জন করে তীরের মতো ছুটে এসে চৌদ্দ হাত দূর থেকে আমার মাথা লক্ষ্য করে মারল প্রচণ্ড এক লাফ। আর ঠিক সেই মুহূর্তে দিশেহারার মতো চোখ-কান বুজে আমি মাটিতে বসে পড়লাম। সিংহ আমার ওপর দিয়ে টপকে বারো চৌদ্দ হাত দূরে গিয়ে পড়ল।

...কিন্তু পশুরাজ একেই বলে, বুঝলি সোনা? একবার শিকার ফসকে ফিরে আর আক্রমণ করল না। ঘুরে গম্ভীর বিরক্তিতে আমাকে একবার দেখে নিল, তারপর নিজের উপরেই রাগে গজগজ করতে করতে চলে গেল।

ঘটনা শুনে সকলেই হতভম্ব আমরা। বিশ্বাস করব কি করব না ভেবে পেলাম না।

পিন্‌ডিদা আবার শুরু করল, প্রাণে বেঁচে আমার মাথায় একটা প্ল্যান এলো। সিংহটা আশপাশেই থাকে ভেবে নিয়ে পরদিন খুব ভোরে সেখানে একটা ছাগল বেঁধে রেখে দুপুরে ঠিক আগের দিনের সময় ধরে বন্দুক নিয়ে চুপিচুপি সেদিকে এগোলাম।

কিন্তু কিছুদূর থেকে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে যা দেখলাম, আমার চক্ষুস্থির। আর তক্ষুনি বুঝলাম আগের দিনের শিকার অর্থাৎ আমাকে ফসকে পশুরাজের মেজাজ কি হতে পারে। আর বুঝলাম, এই মেজাজ আর এই আচরণ বলেই সিংহ পশুরাজ।

পিন্‌ডিদার হাসিমাখা চোখ দুটো সকলের মুখের ওপর এক চক্কর ঘুরে আমার মুখের ওপর এঁটে বসল। খুব আলতো করে বললো,—তুই তো জানোয়ার এক্সপার্ট—এখন ভেবেচিন্তে বল্, ওই সিংহর কোন্ মেজাজ আর কি আচরণ দেখে অত অবাক হলাম আমি—কি অবস্থায় দেখা সম্ভব, আর কেনই বা সিংহকে যোগ্য পশুরাজ বলছি আমি। এক কথায় আমি গাছের আড়াল থেকে ওই সিংহকে কি অবস্থায় দেখেছিলাম দশ বারের চেষ্টায় আঁচ করতে পারলেই আমি দশ টাকা হারব।

আমি চটপটি, কেবলু আর কার্তিক দস্তুরমতো একটা উত্তেজনা নিয়েই বাড়ি এসে আলোচনায় বসে গেলাম। একটা সিংহ কি এমন করতে পারে যা দশ রকমের উত্তর লিখেও ঠিক মেলাতে পারব না?

সেদিন রাত এগারোটা পর্যন্ত আর পরদিন সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত মাথা ঘামিয়ে আমরা সম্ভাব্য দশটা উত্তর লিখলাম, যথা ঃ

এক। সিংহ ছাগলটাকে না খেয়ে আগের দিনের প্রতিশোধ নেবার জন্য শিকারীর আশায় ওত পেতে ছাগলটার পাশে বসে আছে।

দুই। সিংহ ছাগলটাকে খেয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে, কিন্তু বুদ্ধি করে তার সিংহীকে পাহারায় মোতায়েন রেখেছে।

Table of Contents

তিন। সিংহ শিকারীর মতলব বুঝে ওটাকে না খেয়ে ওটার সঙ্গে খেলা করছে।

চার। আগের দিনের শিকার ফসকে সিংহর এমন ঘেন্না ধরে গেছে যে, ছাগলের খুঁটি উপড়ে দড়ি টেনে সে ছাগলটাকে জঙ্গলের বাইরে ছেড়ে দিতে যাচ্ছে।

পাঁচ। শিকার ফসকাবার লজ্জায় সিংহ ছাগলটাকে ছোঁবে না, কিন্তু সিংহী তাকে খেতে চায়; ফলে সিংহর সঙ্গে সিংহীর লড়াই বেঁধে গেছে।

ছয়। রাগের চোটে সিংহ নিজে ছাগল না খেয়ে সেখানকার বিষাক্ত পিঁপড়ে দিয়ে ছাগলটাকে খাওয়াচ্ছে, আর সে গম্ভীর চোখে তাই দেখছে।

সাত। সিংহ চালাকি করে পিন্‌ডিদা আসার ঢের আগেই ছাগল নিয়ে চম্পট দিয়েছে।

আট। ছাগলটাকে ভয় পেয়ে ব্যা ব্যা করতে দেখে সিংহ ওটার গা চেটে অভয় দিচ্ছে।

নয়। সিংহ ওই ছাগলের সামনে আরো অনেক জন্তু-জানোয়ার মেরে এনে সেখানে ফেলে রেখে শিকারীকে তার তেজ দেখিয়ে গেছে।

দশ। ছাগলটাকে রক্ষা করার জন্য সিংহ অন্য জানোয়ারের সঙ্গে তুমুল লড়াই করছে।

মোট কথা এর বাইরে আর কিছু হতে পারে বলে আমাদের মনে হল না। এক-মত হয়েই আমরা পাঁচটার পর মাঠে এলাম। শেষেরগুলো খুব সম্ভব নয়—প্রথম দিকের একটা না একটা মিলবেই।

যথাসময়ে হাবুলের সঙ্গে পিন্‌ডিদাও এসে হাজির। উঁচু জায়গায় বসতে বসতে পিন্‌ডিদা বললো,—কি রে, মনে হচ্ছে দশটা টাকা খসলই আমার। দেখি কি উত্তর এনেছিস। আর এই নে আমার উত্তর।

হাত বাড়িয়ে একটা খাম আমার হাতে দিয়ে আমাদের উত্তর লেখা কাগজটা টেনে নিল।

তারপর পিন্‌ডিদা যতো পড়ে ততো হাসে।

পড়া শেষ করেও পিন্‌ডিদা হেসে অস্থির। শেষে বললো,—গাধা বটে তোরা এক-একটা। পরে বিশেষ করে আমাকে বললো,—এই জ্ঞানগম্যি নিয়ে পশুরাজের মেজাজ আচরণ জানার বড়াই করিস! নে টাকা দশটা বার কর।

টাকা বার করার আগে খাম থেকে পিন্‌ডিদার উত্তর লেখা কাগজ বার করলাম। ওতে লেখা ঃ

গাছের আড়াল থেকে আমি দেখলাম, আগের দিন বুক-মুখ-মাথা টপকে শিকার ফসকাবার ফলে সেই সিংহ বাঁধা ছাগলের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে একমনে লো জাম্প্ (নিচুপাল্লার লাফ) প্র্যাকটিস করে চলেছে।

Table of Contents

রামকেষ্টর শ্বশুরবাড়ি

দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দুর্বিপাকটা হঠাৎ ঘটলো।

রামকেষ্টর বাপের আমলের গামছাখানা হারিয়ে গেল হঠাৎ। বাপ মারা যাবার বছর চারেক আগে আট আনায় সে কিনেছিল গামছাখানা। বুড়ো বাপ দেহ রক্ষা করেছেন বড় জোর বছর বারো হবে। না, বাপ শুধু দেহ রক্ষাই করেননি, নিজের খাই-খরচটাও বাঁচিয়ে গেছেন তার সঙ্গে।

এরই মধ্যে ঘটে গেল এই অঘটন।

বাপের সুযোগ্য বংশধর রামকেষ্ট। তিন কুলে বোধ করি কেউ নেই—অন্তত আছে বলে কেউ শোনেনি, দেখা তো দূরস্থান।

অনর্থক খরচ এড়ানোর তাগিদে রামকেষ্ট বিয়ে-থাও এড়িয়েছে। পড়শীরা পারতপক্ষে তার ধারে কাছে ঘেঁষে না, বিশেষ করে সকাল বেলায়। কিংবদন্তি আছে, সেদিন তাহলে নাকি উনুনে হাঁড়ি ওঠে না।

এ হেন রামকেষ্টর বরাতে, বলা নেই কওয়া নেই, এত বড় দুর্বিপাকটা ঘটে গেল। পাতি পাতি করে ত্রিভুবন তোলপাড় করেও গামছাখানার পাত্তা মিললো না কোথাও।

Table of Contents

শোকে রামকেষ্টর হৃদয় প্রায় বিদীর্ণ হবার উপক্রম। সে ডুকরে উঠলো, 'বাবা গো—'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব এল, 'ব্যাঁ—'

চমকে উঠলো রামকেষ্ট। এদিক-ওদিক তাকাতেই উঠোনের এক কোণে নজরে পড়লো পাঁঠাটা। আর অমনি ঝিলিক খেলে গেল মগজের মধ্যে। অবশ্যি বিদ্যুতের নয়—বুদ্ধির। চোখের পলকে দাওয়া থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েই সে ছুটে গিয়ে জাপটে ধরলে পাঁঠাটাকে। তারপর তার পেট টিপে টিপে আর পেটের কাছে কান নিয়ে গিয়ে গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে অনেকক্ষণ পরীক্ষার পর অ্যাদ্দিন পরে অর্থাৎ দুর্বিপাক ঘটে যাবার দুদিনের দিন সে স্থিরনিশ্চয় হলো, নির্ঘাৎ এই হারামজাদাটাই তাকে ফাঁসিয়েছে। তেলজল আঁর তালির পর তালি খেয়ে খেয়ে গামছাখানা বোধহয় গাড়োল পুত্তুরের অতি প্রিয় সুখাদ্যে পরিণত হয়েছিল, তাই এই সর্বনাশ।

তার মাথায় যেন খুন চেপে গেল। দারুণ রাগে পাঁঠাটার কানে সে এক মোক্ষম মোচড় বসাতেই, ওটা কাঁপা গলায় ডেকে উঠলো, ব্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ—

সঙ্গে সঙ্গে রামকেষ্টর আবার চোখ পড়লো পাঁঠটার দিকে। অ্যাঁ, দণ্ডীরামের পাঁঠা! সব্বোনাশ! এদিক-ওদিকে সে তাকায়। গোঁয়ার দণ্ডীরামের চেহারার সঙ্গে রাগের অমন যুৎসই মিল কদাচিৎ নজরে পড়ে। ততক্ষণে তার মুঠি আলগা হয়ে গেছে, দণ্ডীরামের পাঁঠাও পগার পার।

শোকে দুঃখে রামকেষ্ট তখন ওঠ-বোস শুরু করেছে ঃ হায় ! হায়! শেষ পর্যন্ত গামছাখানার হদিস মিললো বটে, কিন্তু করার কিছু নেই। হারামজাদা গোঁয়ারটার ছাগল! ওর পেটে এখনো গজ্‌গজ্‌ করছে গামছাখানা।

শেষ পর্যন্ত অনেক ভেবেচিন্তে সে ঠিক করলো—নাঃ, নাপিতকে আর পয়সা দেয়া নয়। সেই পয়সায় নতুন গামছা আর পুরনো গামছার দাম উসুল, দুটোই করতে হবে একসঙ্গে।

যেমন ভাবা তেমনি কাজ। সেদিন থেকেই নাপিত আর রামকেষ্টর চুলদাড়ির নাগাল পায় না। যত দিন যায়, ততই উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটে চুলদাড়ির। আরামে চুলদাড়ি চুলকোতে চুলকোতে চোখ বুজে রামকেষ্ট ভাবে—এঃ, জমজমাট অবস্থা! এই সব আপনজনদের ছাঁটাই করার মতো আহাম্মুকি আর নেই।

সুতরাং নাপিত ছাঁটাই হলো চিরতরে।

তারপর দিন যায়। মাস যায়। বছরও কাটলো।

খোঁজখবর নিতে নিতে রামকেষ্ট এত দিনে জেনে ফেলেছে, হাওড়ার হাটে গামছা খুব সস্তা। অতএব সে রওনা হয় একদিন।

হাবড়া থেকে হাওড়ার হাট—পথটা নেহাৎ কম নয়। রাত থাকতে থাকতে রামকেষ্ট বেরিয়ে পড়লো, সোজা পায়দল। কাঁধে লাঠি। তার ডগায় ন্যাকড়ায় বাঁধা ছোট্ট এক পুঁটুলি।

চলতে চলতে বেলা বাড়ে। সামনে এক পুকুর। রামকেষ্টর ভারি তেষ্টা পেয়েছে। পুকুরের ঘাটে বসে সে পুঁটুলি খুললো। পুঁটুলির মধ্যে ছোট্ট এক পেতলের গেলাস, দুখানা বাতাসা আর আধমুঠো আলো চাল।

বাসি পেটে রামকেষ্ট পারত পক্ষে কাঁচা জল খায় না। ওতে স্বাস্থ্য খারাপ হয়।

Table of Contents

দু আঙুলে সে একখানা বাতাসা সন্তর্পণে তুলে নিলে। তারপর জলভরা গেলাসে সেটা একবার চুবিয়েই আলগোছে আবার রেখে দিলে ন্যাকড়ার ওপর—রোদে শুকোবার জন্যে। তারপর গুনে গুনে চারটে চাল মুখে ফেলে গেলাসের জলটা সে খেয়ে ফেললে ঢুক করে। ব্যস্! এরপর গেলাসের পর গেলাস পুকুরের জল সাবাড় করে সে প্রাতঃকালীন জলখাবারটা যখন শেষ করলো, ততক্ষণে পেট ফুলে ঢাক। আরাম করে সে ঢেকুর তুলতে যাবে, হঠাৎ অন্য পাড়ে নজর পড়তেই চক্ষু চড়কগাছ।

ঢেকুরটা সে চেপে গেল।

অপর পাড়ের ঘাটে আর একজন লোক জলের ওপর বাঁ হাতে একখানা কঞ্চি ধরে আছে। কঞ্চির আগায় সরু সুতোয় বাঁধা একখানা বাতাসা ঝুলছে। জলে যেখানে বাতাসার ছায়া পড়েছে, সেই জল লোকটা খাচ্ছে হাপুস্-হুপুস্ করে।

রামকেষ্টর চোখ জুড়িয়ে যায়। হ্যাঁ, হিসেবীই বটে! এক বাতাসায় সারাটা জীবন-উঁহুঁ—অধস্তন চৌদ্দ পুরুষ পর্যন্ত! দেখে দেখে রামকেষ্টর আর আশ মেটে না।

শেষ পর্যন্ত পুঁটুলি গুটিয়ে গুটি গুটি সে গিয়ে হাজির হলো ও পাড়ে। লোকটিকে ভক্তিভরে প্রণাম করতে করতে বললে,—আপনার খুরে পেন্নাম হই। জ্ঞেনী মহাজন ব্যেক্তি আপনি, আমার গুট্ঠাকুর দশ্‌শন পেয়ে জম্মো সার্থক হলো।

গুট্ঠাকুর প্রথমে একটু অবাক হয়েছিলেন, পরে বুঝলেন শিষ্যের ভক্তির কারণ। গুরু-শিষ্যের বাতচিৎ হলো কিছু সময়।

তারপর গুরুর আশীর্বাদ ও উপদেশ মাথায় চাপিয়ে রামকেষ্ট একসময় রওনা হলো আবার।

কলকাতার রাজপথ। গাড়িঘোড়া ঝক্কি-ঝামেলা বাঁচিয়ে রামকেষ্ট চলেছে হাওড়া হাটের দিকে। হঠাৎ অদূরে এক আধাবয়সী ভদ্রলোকের ওপর নজর পড়তেই সে থমকে দাঁড়ালো।

ভদ্রলোকের মাথায় কাঁচাপাকা লম্বা বাবরি চুল। আর মুখে? ইস্ দাড়িগোঁফের সে কী বাহার! আবক্ষচুম্বিত লম্বা দাড়ি, বোধহয় নাভিদেশ পর্যন্ত লম্বমান—রামকেষ্ট মনে মনে আন্দাজ করে—লম্বায় তার নিজের দাড়ির চেয়ে নির্ঘাৎ দ্বিগুণ হবে।

তাড়াতাড়ি সে এগিয়ে গেল ভদ্রলোকের কাছে। দুহাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বললে—আহা রে! মশায়ের বুঝি শাল হারিয়েছে?

ভদ্রলোক থতমত খেয়ে তাকান ওর দিকে।

হ্ হ্! —রামকেষ্ট বলে—শাল গেলে মুখে বাক্যি সরে কখনো? এ কি আর আমি বুঝতে নারি? মাথায় জমজমাট অবস্থা দেখেই তা বুঝে নিয়েছি।

ভদ্রলোক তখনো বেহুঁশ। মুখে চুক্‌চুক্ শব্দ করে রামকেষ্ট আবার বললে,—ইস! আমার গামছা হারিয়েই এই দশা, আর মশায়ের কিনা শাল গেছে! ঈঃ, শাল গিয়েও জিব্‌তো আছেন, কলজের জোর বলতে হয়ে! পেন্নাম হই, পেন্নাম হই।

বলতে বলতে রামকেষ্ট আবার পা চালিয়ে দেয়।

ভদ্রলোক তখনো ধাতস্থ হননি; যখন হলেন রামকেষ্ট তখন অনেকখানি এগিয়ে গেছে। খুশিতে সে টইটম্বুর ঃ কি শুভক্ষণেই না আজ সে বাড়ি থেকে পা বাড়িয়েছিল!

ভদ্রলোক কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বিড়বিড় করে বললেন,—কী সাংঘাতিক! অতি অল্পে বেঁচে গেলুম বদ্ধ উন্মাদটার হাত থেকে!

Table of Contents

হাওড়ার হাট। লোক গিজগিজ করছে।

দোকানে দোকানে ঘুরছে রামকেষ্ট। ধ্যুৎ, কোথায় সস্তা! একে কি সস্তা বলে!

পুরো হাট সে চক্কর দিয়েছে বার কয়েক। এক-এক দোকানে গেছে চার-পাঁচ বার করে। দোকানীরা আর ফিরেও তাকাচ্ছে না ওর দিকে। একজন তো তেড়েই এল।

এমন সময় হঠাৎ সোরগোল উঠলো, চোর—চোর—

চারদিকে হৈ-হল্লা-হট্টগোল। 'চোর-চোর' বলে লোকজন ছুটছে। ঘাবড়ে গিয়ে রামকেষ্টও ছুটতে শুরু করলো। তারপর পড়বি তো পড়্, পড়লো গিয়ে এক পুলিশের সামনে।

পুলিশ সাপটে ধরলো তাকে ঃ ব্যাটার যা চেহারা, চোর না হয়ে যায় না।

তারপর কত কান্নাকাটি, হাতে পায়ে ধরাধরি! কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। রামকেষ্টর রাত কাটলো থানার গারদে। পরদিন আদালত। তারপর চুরির দায়ে দুই মাস সশ্রম-কারাদণ্ড।

রামকেষ্ট জেলে গেল।

দিন কাটে। পড়শীদের কারো কারো ভাবনা হয়, কোথায় গেল রামকেষ্ট? অবশ্যি ভাবনা হয়, যখন কোন কাজকর্ম থাকে না। তাও এক-আধবার—ক্ষণেকের জন্যে।

তারপর মাস দুয়েক পরে—একদিন বাড়ি ফিরলো রামকেষ্ট। পড়শীরা তো প্রথমে চিনতেই পারে না। চেহারা তার নাদুসনুদুস। মাথার চুলে কেয়ারী ছাঁট, দাড়িগোঁফ কামানো। জামাকাপড়ও বেশ ধোপদুরস্ত।

খুশিতে ডগমগ রামকেষ্ট। এ সবই হয়েছে কিনা বিনি পয়সায়। তার ওপর দু মাসের খাই-খরচটাও বাদ।

লাঠি ঠুকঠুক করতে করতে বুড়ো মোড়ল মশাই এসে হাজির হলেন এক সময়—অবিশ্যি বিকেলের দিকে। তার সঙ্গে আরো দু-চার জন পড়শী। মোড়ল মশাইয়ের দৃষ্টিশক্তি কমে গেছে। তাই চোখ কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন,—কে কালীকেষ্টর ছেলে রামকেষ্ট না?

এক গাল হেসে রামকেষ্ট বললে,—এজ্ঞে হ্, পেন্নাম হই।

তা অ্যাদ্দিন কোথায় ছিলে বাবা?

এজ্ঞে শ্বশুরবাড়ি। —হাত কচলাতে কচলাতে রামকেষ্ট জবাব দেয়। মুখে আকর্ণবিস্তৃত হাসি।

অ্যাঁ, শ্বশুরবাড়ি! —মোড়লের বাঁকা কোমর প্রায় সোজা হবার যোগাড়।

এজ্ঞে হ্, শ্বশুর বাড়ি—রামকেষ্ট বলে।

কিন্তুক, বাপু—নাচার কণ্ঠ মোড়লের—কুথায় হলো বিয়ে? বৌমা কুথায়?

এক হাত জিব্ কেটে রামকেষ্ট বললে,—কি যে কন, গুরুজন আপনি। ও কম্মো আর হলো কই? ও আমাকে দিয়ে হবেকনি।

কিন্তুক তবে যে বললে—

এজ্ঞে হ্, ঠিকই কইছি। —পুলকিত কণ্ঠ রামকেষ্টর—শ্যালোরা ছাড়লে না, জাপটে ধরে নিয়ে গেল। কি করবো, যেতেই হলো, তা খাইয়েছে-দাইয়েছে বেশ। একটু যা খাটতে হতো।

অ্যাঁ! খাটতে হতো!! শ্বশুরবাড়ি!!!

লে-ব্বাবা! —পড়শীরা কেটে পড়লো।

টাক চুলকোতে চুলকোতে কেটে পড়লেন মোড়ল মশাইও। লাঠি তখন বগলে।

Table of Contents

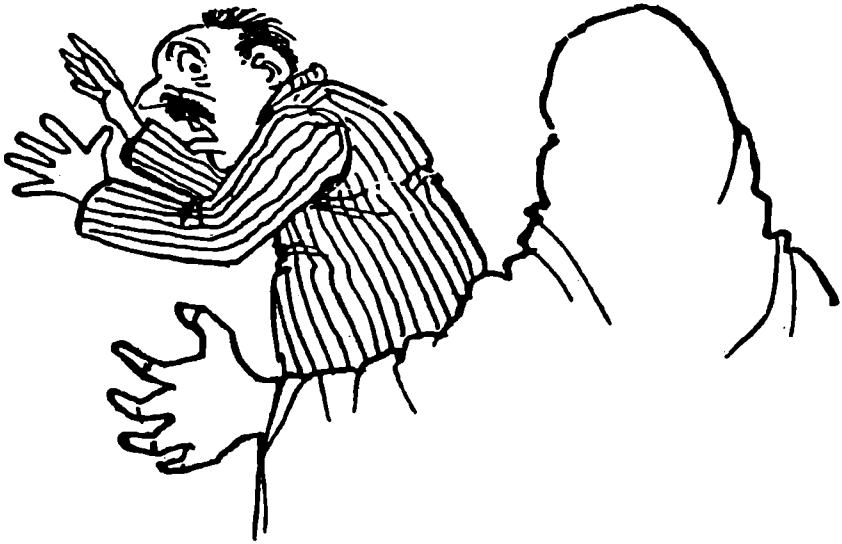

দাদুতাড়ুয়া

মহাশ্বেতা দেবী

"কাকতাড়ুয়া" বলে একটা কথা তোমরা শুনেছ। ব্যাপারটা যে আসলে কি, গ্রামের ছেলেরা জানো, শহরের ছেলেমেয়েরা জানো কি?

কাক বা অন্য পাখি এসে পাকা ধান খাবে বা উঠোনের মাচা থেকে পাকা কুমড়োটা ঠোকরাবে। এ রকম হয়েই থাকে। তাই গ্রামের লোকজন একটা মাটির হাঁড়ির পেছনে ভুষো কালি মাখায়। তারও চোখ মুখ আঁকে। সেটা বাঁশে ঢুকিয়ে একটা ছেঁড়া জামা বাঁশে গলিয়ে হাঁড়ির মুখে বেঁধে ধান ক্ষেতে, ঘরের চালে বা উঠোনে বাঁশটা পুঁতে রাখে। পাখি দেখলে ভাববে, ও বাবা! এ আবার কে।

"দাদু তাড়ুয়া" বলে কোনো শব্দ তোমরা কেউ শোননি। এটা দাদু তাড়ুয়ার গল্প।

গরমের ছুটি হয়েছে। রাজাদের বাড়িতে একটা পোস্টকার্ড পৌঁছল। রাজার বাবাকে লেখা। গোপাল দাদু লিখছেন ঃ এ বছর কিছু আগেই যাব মনে করছি। তেসরা পৌঁছে যাব। মজঃফরপুরে গরমটা খুব বেশি পড়েছে। পুরো গরমটা আরামে কাটিয়ে একেবারে আষাঢ়ে পুরীতে রথ দেখে ফেরার ইচ্ছে।

চিঠিটা দেখেই রাজার হাড়পিত্ত জ্বলে গেল। একে তো দার্জিলিং যেতে পারেনি বলে ওর মেজাজ বেশ খারাপ। মা আর বাবা ছোট বোন পাখিকে নিয়ে গেছেন। কি ব্যাপার? না, জামাইবাবু বদলি হয়ে যাচ্ছেন। রাজাকে কেন নিয়ে যাননি? না, ছেলের যে স্কুল খুললে পরীক্ষা। এমন যাচ্ছেতাই স্কুলে একমাত্র ছেলেকে ভর্তি করো কেন বাপু, যেখানে সপ্তাহে সপ্তাহে পরীক্ষা?

Table of Contents

বেশ! রেখে গেছ তো দীনুদার জিম্মায়। রাজাকে দিয়ে গেছ পনেরো দিনে হাত খরচ সাকুল্যে দশটা টাকা। দীনুদাকে তো ভালোই ক্যাশ দিয়ে গেছ। সে সব সময় রাজাকে দুধ নিয়ে তাড়া করছে। তাছাড়া সকালে মাস্টার, দুপুরে মাস্টার!

রাজা নিরুদ্দেশ হবে বলেই ভাবছিল। প্রাণের বন্ধু রাণাও রাজি। বিশেষ করে ওদের গুরু ভীমেশ্বরদা যখন নিরুদ্দেশ হবে বলে সবই ঠিক করেছে। ভীমদা অবশ্য ওদের বোঝাচ্ছে অনেক।

—আমার মনে ব্যথা লেগেছে, আমি যাচ্ছি, তোরা যাবি কোন্ দুঃখে?

—এত ব্যথা লাগল যে নিরুদ্দেশ হবে?

—ওরে! গাধার দল! থিয়েটার নামার আগে নিরুদ্দেশ না হলে এই হতভাগা ক্লাব আমার মর্যাদা বুঝবে না। শুধু নিরুদ্দেশ হব না, গ্যাং ফিট করে দিয়ে যাব। চারটে করে ছেলে প্রতি সীনে বেড়াল ডাকবে।

—বের করে দেবে।

—আরো চারটে ঢুকবে।

—বের করে দেবে।

—বাইরে দাঁড়িয়ে হল্লা করবে। তারা বাবা ওপাড়ার ছেলে। এই পাড়ার ন্যাকা ন্যাকা ভদ্দর-ভদ্দর ছেলে নয়।

—থিয়েটারটা পণ্ড করবে?

—করব না? কথা বললে তিনটি সুর বেরোয়, মানছি। তা আমার তো ছিল বৃদ্ধ অশরীরী মহিমবাবুর পার্ট। স্টেজে ঘুরব। এক ক্রিমিনাল দেখতে পাবে। আর কেউ দেখতে পাবে না। শেষে ভয়ের চোটে বাপধনকে "খুন করেছি" বলতেই হবে।

—হ্যাঁ, চমৎকার পার্ট ছিল।

—আমার কিরকম একটা সুযোগ গেল বলতে পারিস? ওঃ ফিলমে ফিট্ হয়ে যেত।

—সিনেমায়?

—নয়তো কি? রাজুদা, সুভাষদা, তোরা অবশ্য নাম শুনিসনি। সবে পরিচালক হচ্ছে। ওদের ডেকেছিলাম... ওরা দেখলে... ছিঃ ছিঃ আমার ইজ্জত গেল। কেন? না, ওই যে পলাশের দাদু, কবে যাত্রা করত না কি করত যেহেতু সে হাজার টাকা চাঁদা দিচ্ছে, ওকেই ওই পার্ট দিতে হবে। অবিচার। অবিচার।

—তুমি না থাকলে আমরা কি দুঃখ পাব না?

—মানে এত দুঃখ পাবি, যে নিরুদ্দেশ হবি?

—নিশ্চয়ই।

—ওঃ। তোদের মতো ছেলে...

—কোথায় যাবে?

—সব ফিট করে রেখেছি। মেসোর ভেড়ি আছে রাজাতলায়। সাতদিন থাকব। সেঁটে মাছ খাব। তারপর কাগজে "বাবা ফিরে আয়" দেখে তবে ফিরব।

মেসোর ভেড়ির বড় বড় মাছ, আর মাসির হাতের খাসা রান্নার কথা রাজারা অনেক শুনেছে। ভীমদা বলেছে, ওই চাকরির পরীক্ষা দিয়ে ফেল করে করে বাবার বিষ চোখে পড়েছি। আর দিচ্ছি না। এবার ভেড়িতেই লেগে যাব। নাঃ, বাবা দোকানে বসতে দেবে না, বলে তোর মাথায় গোবর। আমার দুঃখ কি একটা রে?

Table of Contents

—তোমার মাসি জানিয়ে দেবে না?

—না, না, সেসব আমি দেখব। তোরা, চল্ তোরাও যখন চাইছিস।

এর মধ্যে গোপাল দাদুর চিঠি।

মায়ের জ্যাঠাইমার মাসতুতো কাকা কেমন করে রাজার দাদু হবেন, তা রাজা বোঝেই না। "দাদু" তো সম্পর্কে হয় না। ব্যবহারে হয়। মায়ের সম্পর্কে এমন দাদু রাজার আরো কয়েকজন আছেন। তাঁরা কি ভালো, কি ভালো, এসে থাকলেও ভালো লাগে।

তাঁদের এমন "গুল্‌পো সাগর" নেই। গোপাল দাদু আসবেন শুধু হাতে। যদ্দিন থাকবেন নো টেলিভিশন, যখন তখন প্রত্যয়-সমাস-অব্যয় জিজ্ঞেস করবেন, খেলার সময় বেঁধে দেবেন, আর কি গুল্‌পো, কি গুল্‌পো।

যেমন, ইস্। ট্রেনে উঠে মনে হল, বাগানের খাসা ল্যাংড়া আম এক ঝুড়ি আনবো।

বা—নাঃ পরের বার পুকুরের মাছ তোদের খাওয়াবই। একেবারে টাটকা, তরতাজা, স্বাদই আলাদা।

আনো না যখন, গুল্‌পো কেন বাপু? দিব্যি তো বাগানের ফল, পুকুরের মাছ বিক্রি করো। মস্ত গাড়িও বানিয়েছ। স—ব শুনেছে রাজা। গোপাল দাদুর আরেক ভাইয়েরই কাছে।

এতেও কি নিস্তার আছে। বলবেন,—আমরা, বুঝলে রাজা! আজ হয়তো ছড়িয়ে আছি, কিন্তু গ্রামের সূত্রে টান আমাদের শিকড়ে।

সুতরাং প্রতিটি রবিবার নষ্ট। আজ ওঁর সঙ্গে যাও বাদুড়বাগানের ভাইয়ের কাছে। অন্যদিন যাও চন্দননগরে কাকার কাছে।

রাজা একদিন বলেছিল,—মা! তোমাদের গ্রামের লোকরা সবাই এত দূরে দূরে থাকেন কেন?

—যার যেখানে বাড়ি।

গোপাল দাদু অমনি ফ্যাচর ফ্যাচর হেসে বললেন,—বুঝলি খুকি! আমাকে নিয়ে যেতে হয় তো! বিরক্ত হঁয়। গ্রামের টান ও কি বুঝবে?

গ্রামের কথা বললেই রাজার মা মুচ্ছো যান। আহা সেই পুজো পাব্বণ! আহা, সেই পায়েস পিঠে।

গোপাল দাদু বলেন,—আমি তো জানি, কলকাতায় থেকে থেকে ওর চরিত্রই গড়ে উঠছে না! আমি সেই জন্যেই ওকে নিয়ে... আমাদের মতো হতে হবে, বুঝলে রাজা? সেই মজঃফরপুরে... সেই আমি আর ক্ষুদিরাম... ওঃ। ওর যখন ফাঁসি হল, গানটা বেঁধেছিল কে, জানো? দিস ওল্‌ড গোপাল দত্ত!

বাবা গোপাল দাদুকে অত পছন্দ করেন বলে রাজার মনে হয় না। কিন্তু তা নিয়ে কিছু বলার উপায় নেই মায়ের কাছে।

—কি আর জ্বালাতন করেন বাপু? তুমি যখন আপিসে যাও, উনি পার্কে হাঁটেন।

—হ্যাঁ। অতগুলো লুচির পর না হাঁটলে...

—যাও। তুমি যখন ফেরো, তখন উনি রাজাকে পড়াতে বসেন।

—যাক্‌গে! ছেলেমেয়েদের পড়া নষ্ট না হলেই আমি বাঁচি।

রাজার মা সহাস্য মুখে বলেন,—ভাগ্যে দুটো ঘর আরো করেছিলে। রাজার ঠাকুর্দা ঠাকুমা মারা যাবার পর আমার তো... আমি বাপু লোকজন ভালবাসি।

—ওঁর কি আর কেউ নেই?

Table of Contents

—ও মা! জানো না? ওঁর সব অঙ্ক কষা থাকে। পাঁচ বছর এর কাছে যাব, পাঁচ বছর ওর কাছে,... আমার তো ভাবলেই কান্না পায় যে দু বছর বাদে উনি আর আসবেন না, খবর যা পাব, একেবারে শেষ খবর!...

—না, না ভেব না, তোমাদের আত্মীয়স্বজন কম তো না। সব জায়গায় পাঁচ বছর করে ঘোরা হয়ে গেলে আবার উনি আসবেন। উনি ক্ষুদিরামের সময়ের লোক, প্রায় একশো বছর বেঁচেছেন। আর একশো বছর নির্ঘাত—

রাজার মা খুবই সহজ সরল। রাজার মা সহাস্য বদনে বললেন,—ওঁর যখন একশো বছর সত্যিই হবে, তখন একটা ফাংশান করবে?

—ওরে বাব্বা! যাই, যাই আপিসের গাড়ি আসছে।...

দীনুদাও মহাখাপ্পা। থাকবে কয়েক মাস, নিত্যি খেতে বসে বলবে এ মাছটা বাসি, ও রান্নাটা বাজে, আজ পাটপাতা ভাজা খাব, কাল নিম ঝোল, এ কি বাপু?

তা নিরুদ্দেশ যাত্রার সব ঠিকঠাক। এর মধ্যে গোপাল দাদুর চিঠি! রাজা ভীমের কাছে দৌড়ল,—কেস খুব খারাপ হয়ে গেছে ভীমদা! আবার সেই নিচ্ প্রত্যয় আসছে!

ভীম বললো,—হুম্!

—এখন?

—উপায় হবে। ভাবতে হবে। বিকেলে দীনুদাকে মাংসের কাবাব বানাতে বলিস। তোদের বাড়িতে বসেই প্ল্যানটা বলব।

রাজা দীনুদার পায়ে পড়ে গেল,—বাবার বন্ধুরা এলে হরদম ভাজো। আমি একটা দিন বলছি—।

দীনুদা বললো,—ঠিক আছে।

—ভয়ানক বিপদ যে।

—কি বিপদ।

—গোপাল দাদু আসছেন। রথ অব্দি থাকবেন!

—অ্যাঁ?

দীনুদা কি বুঝল সেই জানে, কিন্তু বিকেলে কাবাব, ঘুগনি, কফি সব ঠিকঠাক সাজিয়ে দিয়ে বলল,—আমি গিয়ে একটা পুজো দিয়ে আসি। হে মা শেতলা! বুড়োর মন থেকে এ বাড়ির ঠিকানাটা ভুলিয়ে দাও।

ভীম বললো,—হ্যাঁ, হ্যাঁ যাও! ঠাকুর দেবতার ইচ্ছেতেও অনেক সময়ে কাজ হয়।

রাজাকে বললো,—এখন প্ল্যান যা করেছি, মাস্টার প্ল্যান। দীনুদাকেও দলে নিতে হবে।

—কী প্ল্যান?

ভীম মুচকি হেসে বললো,—বলবো রে, বলবো। ওঃ, মনে খুব বল পাচ্ছি, জানিস? রবীন্দ্রনাথই তো বলেছেন, সৎ কাজ করে যেই, মনে তার ভয় নেই!

—কোন্ কবিতায় বলেছেন?

—সে বলা সম্ভব নয়। একটা লোক যদি কয়েক হাজার পদ্য লেখে, তাহলে... এই যে গোয়ালারা দুধে জল মেশায়, ওরা কি ভয় পায়? পায় না। কেন না ওরা জানে, খাঁটি দুধ যত জনকে দিতে পারত, জল মিশিয়ে তার ডবল লোককে দিতে পারছে।

রানা বলল,—আচ্ছা রাজা, মজঃফরপুরে সত্যিই কি ওঁর...?

Table of Contents

রাজা বলল,—সব সত্যি। অন্য দাদুরাও বলেছেন, আর বাবার আপিসের কে যেন বলছিল, গোপাল দত্ত নাম করা কৃপণ আর বেজায় ধনী।

—নেভার আম কিংবা লিচু?

—নেভার।

—নাঃ, এ রকম লোককে টাইট দেয়া খুব সৎ কাজ। তাই তো রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

যখনি দেখিবে অতীব কিপটে দাদু
নির্ভয়ে তাঁরে টাইটটি দিবে চাঁদু।

ওঃ, এ রকম কত ভাল পদ্য যে লিখে গেছেন... হায়রে কেউ খবরই রাখে না।

—তুমি জানলে কি করে?

—পরীক্ষায় পাশ করার জন্যে "সাফল্যের হাজার উপায়" কিনেছিলাম না? কী মেমারি! কোনো পদ্য ভুলি নি। যাক গে! তাহলে সব কথা পাকা?

—নিশ্চয়ই।

পরদিনই গোপাল দাদু তাঁর পেল্লায় ট্রাঙ্ক আর বিছানা, থলি, দাঁতন, জলের সোরাই, সব নিয়ে এসে পড়লেন। বললেন,—খুকিরা নেই?

—দার্জিলিং গেছে।

—গেছে নয়, গেছেন। নাঃ, বছর খানেক টানা না থাকলে তোমার চরিত্র...

—আপনার বেলের পানা।

—এই যে দীনু! দাঁড়াও, বিছানাটা পেতে ফেলি। সদাই করিবে নিজের কাজ! জীবনে কখনো পাবে না লাজ! কার লেখা পদ্য তা জানো?

—না, বাবু।

—আমার! রবীন্দ্রনাথ পিঠ চাপড়ে বলতেন,—রাইট, গোপাল রাইট! আমার তখন স্বাধীনতার স্বপ্ন। বাঙালির ছেলে গাছপালা চাষবাস গরু গোয়াল করে পায়ে দাঁড়াব, পথ দেখাব।

ঘর তো ওঁর চেনা। বিছানা পাতলেন, দাঁতন করে স্নান করলেন। চৌদ্দটা লুচি খেলেন। পার্কে চলে গেলেন।

এসে দেখেন রাজা ওঁর জুতো পালিশ করছে, দীনু ওঁর পছন্দমতো সব রান্না করছে। দেখে খুব খুশি হলেন। না এ কথাটা খুকিকে লিখতে হচ্ছে! তোমার ছেলের মধ্যে অনেক সদগুণ দিস টাইম দেখতে পাচ্ছি। এর কারণ, প্রতি বছর নিয়মিত আমার সাহচর্য লাভ!

খেতে বসে অবশ্য বললেন,—আমি ডায়েট বদলেছি। কাল থেকে আমাকে দুবেলাই হালকা করে মুরগির ঝোল দেবে। আর বিকেলে ল্যাংড়া আম... তা আমার বাগানের মতো আম আর কোথায় পাব?

দীনুদা বলল,—আমের সময়টা চলে এলেন?

—হুঁ হুঁ বাবা, বাড়িতে কাউকে খেতে হচ্ছে না। পাঁচশো গাছ। সব ফল বিক্রি করে এসেছি। আম, লিচু, জাম, কাঁঠাল, মাছ, স—ব বিক্রি।

সন্ধ্যেবেলা ল্যাংড়া আম খেয়ে, পার্কে ঘুরে এসে গোপাল দাদু চিঠি লিখতে বসলেন। তাড়া তাড়া পোস্টকার্ড ওঁর সঙ্গেই থাকে।

রাজা বললো,—আমি অঙ্ক কষছি দাদু।

—খুব ভালো।

Table of Contents

কিছুক্ষণ বাদেই ওঁর গলা শোনা গেল,—কে, কে ওখানে? কে তুমি?

রাজা আর দীনু দৌড়ে গেল।

—ও কে?

—কোথায় কে?

—ওই যে! লম্বা পানা বুড়োটা, জানলা দিয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে?

—কোথায় কে দাদু?

—সে কি! তোমরা দেখতে পাচ্ছ না?

—না তো!

—ওই যে হাসছে! এ কি শব্দ হচ্ছে না কেন?

দীনু বলল,—ওই গুরুপাক আহার। তাতে ল্যাংড়া আম...

—আরে! চলে যাচ্ছ যে? দেখি...

রাজা আর দীনু ওঁকে চেপে বসাল। রাজা বললো,—কোথায় কে? আপনি ভুল দেখেছেন।

—ভুল দেখলাম?

—তা ছাড়া কি হবে?

—তাহলে... চলো, নিচের ঘরেই বসি। ঠিক সন্ধ্যেবেলা ভুল দেখলাম?

গোপাল দাদু নিচে গিয়ে বসলেন। রীতিমত বিচলিত। কি যেন ভাবছেন আর ভাবছেন। রাত্রে তেমন মন দিয়েও খেলেন না। বললেন,—ভাবছি, রাতে আলো জ্বেলে শোব।

—তাই শোবেন।

পরদিন উনি বাদুড়বাগানে গেলেন। বললেন,—রাজা! যাবে না কি?

দীনুদা বললো,—এবারে আর ওকে পাচ্ছেন না বাবু। সকালে একজন মাস্টার, দুপুরে একজন, সন্ধ্যেবেলা বন্ধু আসবে, আঁক করবে, এবারে ওর বড় কড়াকড়ি।

রাতে দীনুদা বললো,—বাবু! দরজা বন্ধ করে শোবেন কিন্তু। বড্ড চুরিচামারি হচ্ছে।

—তুমি সব দরজা জানলা ভাল করে—

—হ্যাঁ হ্যাঁ, একেবারে!

রাত এগারোটা নাগাদ ভীম ঢুকল পেছনের দরজা দিয়ে।

গোপাল দাদুর সে কি চিৎকার। —কে? কে তুমি?

দীনু দৌড়ে এল, রাজাও!

—কি হল?

—ও কে? আমার মশারির পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আমাকে আঙুল তুলে ডাকছে?

—কোথায় কে?

—ওই তো! ওঃ, কি ভয়ঙ্কর চাহনি! আমি... আমি একা দেখছি কেন? ওঃ, ওঃ, ওই যে চলে যাচ্ছে।

—কোথা দিয়ে?

—ইডিয়ট!... দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

দীনু ঘন ঘন মাথা নাড়ল,—বাবু! বিশ্বাস না করেন তো দেখে যান। নিচে প্রতিটি ঘরে তালা, কোলাপসিবল গেট প্রতি দরজায়। গ্রিলের জানলা তাও বন্ধ।

গোপাল দাদু কেঁদে ফেললেন,—বিশ্বাস করো তোমরা, আমি না দেখলে...

Table of Contents

দীনু চটে গেল,—নতুন বাড়ি। বিশ বছরও হয়নি। বাবু, মা বাস করলেন। মারা গেলেন। রাজার দিদির বিয়ে হল। কত সময়ে আমরা একলা থাকি, কেউ কিছু দেখল না। আপনি এবারে... নিশ্চয় কিছু পাপ করেছেন... নইলে ভূতপ্রেত পাছু ধরবে কেন?

—ভূ... ত!

—নইলে কি? আপনার সঙ্গেই এসেছে মনে হচ্ছে। চলো রাজা, আজ তোমার ঘরে শুই। ছোট ছেলেটা! আহা, ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে।

—না না, দীনু তুমি আমার ঘরে শোও।

রাজা বললো,—না্-না! আমি একা শোব না।

দীনু বললো,—তাহলে নিচতলাটা একবার দেখে আসি। মাঝের দরজা খোলা রেখে তুমি আমি পাশের ঘরে শুই।

—হ্যাঁ দীনুদা।

গোপাল দাদু আলো জেলেও ঘুমোতে পারলেন না। ঘুমোলেন সকালের দিকে, উঠলেন বেলায়।

দীনুদা গম্ভীর মুখে বললো,—হাত বাড়ান।

—কেন?

—আপনার জন্যে সাতসকালে মন্দিরে গেলাম। জাগ্রত ঠাকুর! পুরুতমশাই বললো, —বাড়িতে মেলেচ্ছ খাবার ঢোকাবে না। সেদ্ধ ভাত খাবে, আর তোমরা তিনজনেই হাতে এই লাল সুতো বেঁধে রাখবে।

—যাক্ তবু রক্ষে! তবে রান্না বান্না...

—ওসব মুরগি পেঁয়াজ চলবে না।

—রাজা খেতে পারবে?

—পারতেই হবে। আজ আবার শনিবার! শনিবারটা—

তা দীনু! আজ না হয় আমিও সিনেমা দেখব তোমাদের সঙ্গে টেলিভিশনে।

গোপাল দাদুর মুখে টেলিভিশনের কথা।

পার্কে গিয়ে গোপাল দাদু খুব বেইজ্জত হলেন। দীনু সকলকে বলেছে,—আমি বা রাজা কিছু দেখছি না, উনি শুধু পিশাচ দেখছেন! এ কিরকম একটা বদনাম নয় বাড়ির ওপর! এতকাল ধরে বাড়ি হয়েছে, ভিতপুজো থেকে কোন্‌টা হয়নি?

গোপাল দাদুকে তো সবাই চেনে। পলাশের দাদু বললেন,—এ মশাই পাড়ার বদনাম। নতুন কলোনি, বিশ বছর হয়েছে, আমাদের পাড়ায় ভূত?

—স্বচক্ষে দেখলাম!

—অথচ ওরা দেখছে না?

—না মশাই।

—আমার মনে হয়,... আচ্ছা, কোনো দৈবাদেশ লঙ্ঘন করেছেন?

—দৈবাদেশ!

সন্ধ্যেবেলা হঠাৎ মনে পড়ল, কি যেন এক মাতার আদেশ লেখা পোস্টকার্ড এসেছিল বটে। তাতে পরিষ্কার লেখা ছিল—একশো আটটা পোস্টকার্ড... কাকে লিখতে হবে?... যারা লেখেনি তাদের যেন কি হয়েছে... এঃ, কিছুই মনে আনতে পারছেন না কেন? ইহ্, সে চিঠিটাও তো মজঃফরপুরে পড়ে আছে। একবার ফিরতে পারলে...

Table of Contents

ওঃ, অন্ধকার মানে আতঙ্ক, অন্ধকার মানে...

আজ অবশ্য টেলিভিশন দেখবেন। ওঃ, কপাল বটে! সিনেমার নাম "কঙ্কালের প্রতিহিংসা"! এ কি ষড়যন্ত্র রে বাবা! উঠে যাবেন? যাবেনই বা কোথায়? রাজা, রানা, দীনু, সবকটা একেবারে সেঁটে বসে দেখছে। হাতে লাল সুতোটা আছে তো?

ছবি দেখছেন, দেখছেন, এমন সময়ে তাঁর ঘাড়ে কে নিশ্বাস ফেলল।

চমকে ঘাড় ঘোরাতেই গোপাল দাদু 'ওঁ রেঁ বাঁবাঁ আঁমাকেঁ ডাঁকছে যেঁ' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন।

—কে ডাকছে? ধেৎ জমাটি জায়গাটা...

—ওঁই তোঁ... আঁঙুল তুঁলেঁ...

দীনু বললো,—কোথায়?

রানা তো হেসেই ফেলল।

গোপাল দাদু কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর লাঁল সুঁতোটাঁ সুঁতোটাঁ বলতে বলতে পড়ে গেলেন। পড়েই অজ্ঞান হতে হতেও অনুভব করলেন ঠাণ্ডা শক্ত আঙুল তাঁর হাতের সুতো ছিঁড়ছে।

মনে হল, কে যেন কানের কাছে বলছে,—আয়! আয়!

ব্যস্, পুরো অজ্ঞান, অবশ গোপাল দাদু।

ফ্রিজের বরফে রীতিমত ঠাণ্ডা করা আঙুল ভীমের। সে বলল,—অ্যাকশান! আমি মেকাপ ছেড়ে আসি। তোরা ডাক্তার ডাক্। দেখ, টেঁসে গেল নাকি?

দীনু বললো,—না না। বাথরুমে নিয়ে জল ঢালছি। এমন আহার দুবেলা, টাঁসবে না।

জ্ঞান ফেরাতে আধঘণ্টা লেগেছিল। ডাক্তারও এসেছিলেন। প্রেত দর্শন? মাথার দোষ নেই তো?

দীনুদা বললো,—আমার তো তাই মনে হচ্ছে গো। ফি বছর আসেন। আহার নিদ্রা কুম্ভকর্ণের মতন। কোনোবার তো... এবারে একা উনিই দেখছেন আর দেখছেন। আমরা কেউ কিছুটি দেখিনি।

গোপাল দাদু চোখ মেলে ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন,—আজকের রাতটা কাটলে কালই বিদায় হচ্ছি দীনু! প্রেতপিশাচের অভিশাপ—

দীনুদা বললো,—এ তবে তোমার সঙ্গে এসেছে। কই, এ বাড়িতে কোনোদিন...

ডাক্তারও বললেন,—নেভার।

ভীমও ততক্ষণে এ ঘরে। সে বললো,—না, এটা পাড়ার বদনাম হচ্ছে।

—আমি বাড়ি যাব।

—নিশ্চয়ই যাবেন। আমি আপনাকে টিকিট কেটে তুলে দিয়ে আসব।

পরদিনই গোপাল দাদু রওনা হলেন। ভীম ওঁকে ট্রেনে তুলে দিয়ে এল।

তারপর রাজাদের বাড়িতে জমপেশ ভোজ হল একখানা। দীনুদা বলল,—কত লোক কত খেতাব পায়।

তা আমি তোমার খেতাব দিলাম দাদু তাড়ুয়া!

ভীম বললো,—বাপ্‌রে কঞ্জুষ! ট্রেনে শোবার ব্যবস্থা করে দিলাম, একটা টাকা দিয়ে বলে কি, জোয়ান ছেলে! বাসেই চলে যাও বাবা।

Table of Contents

এই হল দাদু তাড়ুয়ার গল্প। অবিশ্যি, এর উপসংহারটুকু বাকি রয়ে গেল।

পলাশের দাদু হঠাৎ পা মচকে পড়ে থাকলেন। ফলে ভীমই আবার পেয়ে গেল অশরীরী মহিমের পার্টটা।

আর দার্জিলিং থেকে ফিরে এসে রাজার মা বললেন,—গোপাল দাদু এ কি লিখেছেন, কিছুই বুঝছি না। 'মা খুকি! তোমার বাড়িতে ভৌতিক উপদ্রবে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছি। বাড়িতেও বলিতেছে, আমারও সংকল্প, এ ভাবে এ বয়সে আর মজঃফরপুর ছাড়িয়া ঘুরিব না। শান্তি স্বস্ত্যয়ন করাইয়াছি, তাগা তাবিজ লইয়াছি, কিন্তু বিদেশে আর যাইব না। যাহা হউক, তুমি অবিলম্বে তান্ত্রিক ডাকাইয়া গৃহশোধন করাইবে। অন্যথা করিও না।'

দীনুদা বললো,—ওনার মাথার দোষ হয়েছে বউমা! নইলে ঘরে আমি, রাজা, রানা সবাই, একা উনি দেখছেন, আমরা কেউ দেখলাম না?

রাজার মা ভীতু মানুষ! তিনি বললেন,—যা হোক্, একটা কিছু করতে হয়।

দীনুদা বললো,—মোট্টেই না। পাড়ার সবাই ছ্যা-ছ্যা করবে। এ বাড়ি কেন, এ পাড়ায় কোনো ভূতপ্রেত নেই। থিয়েটারটা সবাই দেখেছিল। দেখে রাজার বাবা কি বুঝলেন কে জানে, থিয়েটার দেখে ভীমের নামে একটি মেডেল ঘোষণা করলেন।

দীনুদা বললো,—দাদাবাবু ঠিক বুঝেছে।

রাজা বললো,—মা! মেডেলটা দেবার দিন ভীমদাকে খাওয়াতে হবে, খাওয়াবে তো?

—খাওয়াব, খাওয়াব। কিন্তু গোপাল দাদুর জন্যে মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল রে।

রাজাও করুণ মুখ করল,—আমারও!

Table of Contents

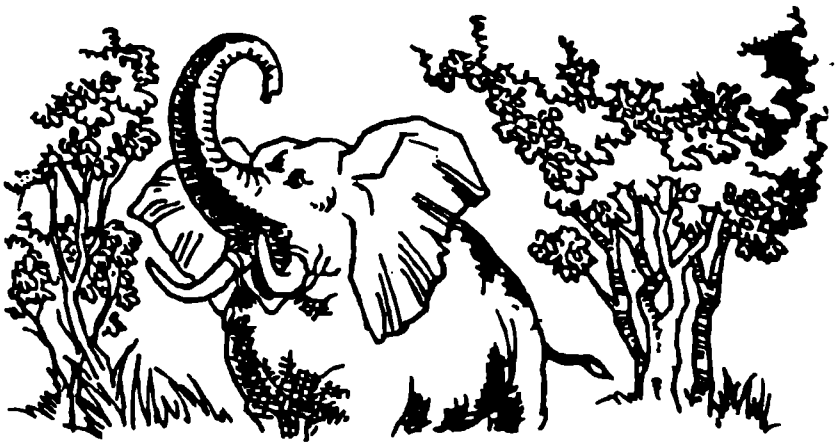

একটি তৈলাক্ত কাহিনী

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সকাল বেলা। সবে চায়ের পেয়ালাটি হাতে নিয়ে বাইরের ঘরে এসে বসেছি, সঙ্গে সঙ্গে এক দিকে খোলা জানলা দিয়ে পড়ল পরপর দুখানা খবরের কাগজ, অন্যদিকে সদরের নাম-ঘণ্টাটা করে উঠল করর করর!

তারপরই এসে ঢুকলেন কিশোরীবাবু। মেজকাকার বন্ধুত্ব সূত্রে রোজই আসেন তিনি। দুকাপ চা খেয়ে এবং খবরের কাগজখানা উল্টেপাল্টে দেখেই চলে যান। যেদিন বাড়ি থাকি, এটা সেটা নিয়ে গল্প ফাঁদেন। যেদিন বেরিয়ে যাই, একাই বসে বসে পাঠ ও পান সেরে চলে যান।

আজ আছি, তাই আমাকে দেখে এক গাল হেসে বললেন, ডিগবয় গিয়েছিলে? চমৎকার জায়গা!

বললাম,—কোন সময় গিয়েছিলেন বুঝি?

কিশোরীবাবু বললেন,—শুধু যাওয়া? ডিগবয় তিনসুকিয়া নাহরকাটিয়া মার্গারিটা সব তো তৈরি হল আমারই চোখের ওপর। কি ছিল আগে ওসব জায়গায়? শুধু বন, পাহাড়, আর তাতে বাঘ, হাতি, গণ্ডার ও পাইথন। ওখানে যে তেল আছে, আর সে তেল যে কোটি কোটি টাকার সম্পদ, এ কে জানত?

ততক্ষণে চা এসে গেছে। পেয়ালায় গোটা দুই চুমুক দিয়ে কিশোরীবাবু বললেন,—একটি মাত্র মানুষের বুদ্ধিতে এত বড় সোনার খনি আবিষ্কার হয়েছে, আর তার পিছনে ছিলেন একটি বাঙালি যুবক!

কৌতূহলী হয়ে বললাম, কিরকম? বলুন তো শুনি একটু।

কিশোরীবাবু একটানা তিন চার চুমুক চা গলাধঃকরণ করে বললেন,—ফেয়ারবোর্ন সাহেবের নাম শুনেছ তো? তিনি ছিলেন বিখ্যাত শিকারী। আসামে এসেছিলেন হাতির দাঁত

Table of Contents

ও বাঘের চামড়ার ব্যবসা করবেন বলে। গৌহাটীতে ছিল তাঁর অফিস, আর সেই অফিসের হেডক্লার্ক ছিলাম আমি।

তারপর?

তারপর ইতিহাসের দেবতা অদ্ভুত কাজ করিয়ে নিলেন দুজনকে দিয়ে। অথচ অকৃতজ্ঞ ইতিহাস দুজনকেই কেমন ভুলে গেছে দেখ! ফেয়ারবোর্ন ইংরেজ সন্তান, তিনি তবু লাখ দুই টাকা বাগিয়ে নিয়ে দেশে গেলেন, আর আমি স্রেফ গলাধাক্কা খেয়ে রিক্ত হস্তে কলকাতায় এসে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরছি আজ বাইশ বছর।

কিশোরীবাবু গল্পের এইখানেই গলদ। তিনি যা নিয়েই কাহিনী ফাঁদুন, শেষ পর্যন্ত তা হয়ে দাঁড়ায় তাঁর আপন জীবনী। তখন তাঁকে মোড় ফিরিয়ে দিতে হয়, নইলে মূল গল্পটা একদম মাঠে মারা যায়।

আস্তে আস্তে বললাম,—হ্যাঁ, এবার বলুন ডিগবয় শহর তৈরির ইতিহাস। খুব আগ্রহ হচ্ছে শুনতে।

কিশোরীবাবু বললেন হ্যাঁ গো, তাই তো বলছি। আচ্ছা, ডিগবয় কথাটা লক্ষ্য করেছ ভাল করে? ডিগ আর বয়, তার মানে বাচ্চা লোক খোঁড়। কিন্তু কি খুঁড়বে? কে বলল এই কথা? কেন বললো? সেটাই হল ইতিহাস... শোন বলছি।

এই বলেই হাত বাড়ালেন তিনি। খবর কাগজের ভেতরের অংশটা তাঁকে ধরিয়ে দিলাম, আর বাইরের অংশটা তাঁর হাত থেকে নিয়ে বললাম,—বলুন কাকাবাবু।

কিশোরীবাবু বললেন,—সেটা বোধ করি জানুয়ারির শেষ কি ফ্রেব্রুয়ারির গোড়া। হঠাৎ সাহেবের সখ হল শিকারে যাবেন। সার্কাসের জন্যে একটা জ্যান্ত ভালুকের, আর একটা অজগরের চামড়ার অর্ডার এসেছিল বিদেশ থেকে। আসল কারণ অবশ্য সেটাই।

সাহেব বললেন,—কিশুরী, বি রেডী ম্যান। আমি সোমবার সকালেই রওনা হব।

বহুৎ আচ্ছা সাহেব, বলে তোড়জোড় শুরু করে দিলাম। তারপর দুজন আর্দালি, জঙ্গল ঠেঙানর লোক ছজন, দুটো হাতি আর বন্দুক ও খানাপিনার পুঁজি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম সোমবার ভোরে। এখন যেখানে তেল শোধনের কারখানা, সেখানে তাঁবু পড়ল দুপুর নাগাদ। সাহেব ঘোড়ায় আসবেন, তাঁর আসতে তাই বিকেল হয়ে যাবে।

রান্নাবান্না হচ্ছে। আমার তো জানই, চিরদিন পড়ুয়া স্বভাব, একখানা বই খুলে একটা মেহগিনি গাছের নিচে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়েছি। হঠাৎ বেজে উঠল ঢোল ডগর এবং ফটাফট বন্দুকের আওয়াজ হল তাঁবুর এপাশ ওপাশ থেকে।

ভারি জমে গিয়েছিলাম বইখানা নিয়ে। বিরক্ত হয়ে উঠে এলাম। হাঁপাতে হাঁপাতে পিয়ন পানিগ্রাহী বলল,—হাতি বাবু জংলা হাতি। এখনি তাঁবু ফাঁবু তছনছ করে দিত। তাই সবাই মিলে খেদিয়ে দিলাম তাকে। ঢুলীদের নিয়ে গিরিধারী জঙ্গলে গেছে বন্দুক হাতে তাকে পিছু তাড়া করে। নইলে ফের যদি ফিরে আসে।

বইয়ের নেশা ছুটে গেল। জংলা হাতির স্বভাব তো আমি জানি। ভীষণ গোঁয়ার ওরা। আর কিছুই ভোলে না। যার ওপর রাগ হয়, তাকে খতম করবে নয়ত নিজে খতম হবে, তবে ছাড়বে।

বললাম,—একটানা অনেকক্ষণ ফাকা আওয়াজ কর বন্দুকের। তাহলেই ঘন বনে ঢুকে পড়বে।

চারটের একটু আগে সাহেব পৌঁছলেন। তাঁর সাদা টাট্টুর পিঠে মস্ত এক টোটার বাক্স।

Table of Contents

আমাকে বললেন,—খাওয়া হয়েছে কিশুরী?

বললাম,—হ্যাঁ সাহেব, আপনার অনুগ্রহে।

আমার পিঠে আলতো করে একটা থাবা মেরে ফেয়ারবোর্ন বললেন,—সব ঠিক আছে তো? কাল কিন্তু সূর্য ওঠার আগেই...

আমি বললাম,—বহুৎ আচ্ছা। তারপরেই আমতা আমতা করে বুনো হাতি বেরনোর ঘটনাটা বললাম।

সাহেব সঙ্গে সঙ্গে বললেন,—কাম এলং কিশুরী। চল, হাতি আসার পথটা একটু পরীক্ষা করে দেখি। তাহলে এই পথ ধরেই এগোতে সুবিধা হবে। তাছাড়া...

দুজনে চলেছি। বন্দুক হাতে সাহেব আগে আগে, পিছনে আমি। বুক দুর দুর করছে।

হঠাৎ দেখলাম মাটিতে গোল গোল পায়ের ছাপ। হাতির পা ওটা, বুঝতেই পারছ। কিন্তু শুকনো মাটির ওপর তেলতেলে হয়ে রয়েছে কেন ছাপগুলো?

বললাম,—স্যার, স্যার, দেখুন, অয়েলী অয়েলী ফুটপ্রিন্টস অব দ্যা এলিফ্যান্ট। হাতির তেলতেলে পায়ের ছাপ।

সাহেব ঝুঁকে দেখলেন। একটা দাগে আঙুল ঘষে সেটা নাকের কাছে বার দুই ধরলেন। তারপর বললেন,—কিশুরী, আনটোল্ড ওয়েলথের অকল্পনীয় ঐশ্বর্যের নিশানা মনে হচ্ছে এগুলো। চল গভীরে, শিকারের চেয়ে অনেক বড় কাজই হয়ত সামনে এসে পড়েছে। কিন্তু চুপ, কেউ যেন না জানে!

ঐ চিহ্ন ধরে দুজনে মাইল দুই চলে গেলাম পাহাড় জঙ্গল ও কাঁটা খোঁচা গ্রাহ্য না করে। তারপরই চারদিকে পাথুরে প্রাচীরের মাঝে একটা ফাঁকা মত জায়গায় দেখলাম ঝর্নার মত বেগে ফিনকি দিয়ে ঠেলে উঠছে একটা তরল জিনিস এবং তা থেকে আসছে কেমন একটা ভোঁটকা গন্ধ।

বললাম,—হোয়াটস দিস্ সাহেব? এটা কি?

সাহেব বললেন,—পেট্রোল! এই খনিজ তেলে মোটর চলে, এরোপ্লেন চলে। দূর প্রাচ্য, মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, আর রাশিয়ায় আছে এই সম্পদ। দেখা যাচ্ছে আছে ভারতেও।

তারপরেই বললেন,—আমরা কোটি কোটি টাকা কামাব এই থেকে। গলাটা কেঁপে উঠল তাঁর উত্তেজনায়।

পরদিন সকালে একজন কুলি লাগান হল আশপাশ থেকে জোগাড় করে এনে। সে গাঁইতি কোদাল নিয়ে খুঁড়তে লাগল, আর ফেয়ারবোর্ন সামনে দাঁড়িয়ে হাঁকতে লাগলেন, ডিগ বয়, ডিগ! এই ডিগবয়ের আদি পর্ব বুঝলে।

তারপর কি হল, জিজ্ঞাসা করলাম আমি। পকেট থেকে কৌটো বের করে একটি পান সশব্দে মুখে পুরে কিশোরীবাবু বললেন,—কি আর হবে? খবর পেয়ে গভর্নমেন্ট এসে আগলে বসল। সাহেবকে ভিড়তেই দিল না আর ধারে কাছে। কিন্তু ইংরেজ বাচ্চা তো! ঢের লেখালেখি করে ঐ টাকাটা আদায় করলেন তিনি। আর এই শর্মারাম, গরীবের ছাওয়াল, শুধু হাতে ঘরে ফিরল।

এই পর্যন্ত বলেই কিশোরীবাবু ভাঁজকরা কাগজের বাকিটা ফেরত দিলেন এবং ছাতাটা বগলে নিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

ছোট ভাই মোহিনী মুখে একটা বিদ্রূপের আওয়াজ করে বললো,—সব বাজে কথা! একদম বোগাস!

Table of Contents

অথ রসময় ও সারমেয় কথা

স্বপনবুড়ো

প্রায় একই সময়ে ওদের দুজনের গৃহপ্রবেশ হয়েছে দুই বাড়িতে। সারমেয় অর্থাৎ সখের দামি কুকুরটি আসছে আগে। রসময় পরে। সারমেয়র একেবারে বাঘের মতো চেহারা। শিকারী কুকুরও বলা যায়। তার কণ্ঠস্বর শুনলে বুকের ভেতর গুর গুর করে ওঠে।

এই সারমেয়র আগমনে গোটা বাড়িতে একেবারে হৈ চৈ পড়ে গেল।

কুকুরটি নিয়ে এসেছিল বাড়ির ছেলেমেয়েদের জন্যে। অনেক সখ করে বহু টাকা খরচ করে এই কুকুরটা কিনে এনেছে এই বাড়ির ছেলেমেয়েদের উপহার দেবে বলে। মামু অর্থাৎ মাতুল বললে,—তোমাদের ভয় করার কিছু নেই। এই বাঘের মতো কুকুরটা দু'দিনেই আমাদের পোষমানা বেড়ালের মতো হয়ে যাবে। তবে বাইরের অচেনা লোক এলে আর রক্ষা নেই!

পিনকু জিজ্ঞেস করলে,—আচ্ছা মামু, আমরা কুকুরটাকে কি বলে ডাকবো?

মামু জবাব দিলে,—নাম একটা ঠিক করে নিতে হবে বই কি! তার আগে তোমরা

Table of Contents

ঠিক করো, ইংরেজি নাম না বাংলা নামে ডাকবে। যদি ইংরেজি নামে ডাকতে চাও—তা হলে নাম দাও 'হ-রা-র'!

দাদু ফোকলা দাঁতে ফিক করে হেসে উঠে কইলেন,—হরার! হরি হরি!

বাড়ির গিন্নি বললেন,—তার চাইতে ওকে ডাকো বাঘের মাসি বলে।

বাঘের মাসি আবার একটা নাম নাকি? —ঠোঁট উলটে বলে মন্টু।

নারাণী এগিয়ে এসে বলে,—আচ্ছা মামু, দস্যি নামে ডাকলে কেমন হয়?

মামু উৎসাহিত হয়ে উত্তর দিলে,—তার চাইতে নাম রাখো দু-র্দা-ন্ত! শুনতেও জমকালো, ওর চেহারার সঙ্গে দিব্যি মানাবে।

দাদু দুঃখ করে বললেন,—আমার দুটো মাত্র দাঁত, এখনো পড়েনি, নড়বড় করছে। ওই 'দুর্দান্ত' ডাকতে গিয়ে তাও খসে যাবে।

পিনকু হাততালি দিয়ে উত্তর দিলে,—এমনিতেই দাঁত পড়ে গেলে তোমার ডেন্টিস্টের পয়সা বেঁচে যাবে। আমরা ওকে দুর্দান্ত বলেই ডাকবো। আশেপাশের লোক শুনেও ভয় পাবে।

অবশেষে ভোটের জোরে 'দুর্দান্ত' নামই বহাল হল।

মামু এবার জানালে, শুধু নাম রাখলেই তো হবে না, দিন-রাত ওর দেখাশোনা করতে পারে এমন একজন চৌকস লোক চাই। তা আমি জোগাড় করে দেবো'খন।

সেই দিনই মামু লোক ধরে নিয়ে এল। নাম তার রসময়। নারাণী খিলখিল করে হেসে উঠল,—ভালই হয়েছে, সারমেয়র জন্য এলো রসময়! ভাগ্যিস্ মামু ভুল করে রসমালাই নিয়ে আসে নি।

মামুই রসময়ের সারাদিনের কাজের তালিকা ঠিক করে দিল। সকালবেলা উঠে কিভাবে পার্কে দুর্দান্তকে বেড়িয়ে নিয়ে আসতে হবে, ঘড়ি ঘণ্টা ধরে কখন্ কি খাওয়াতে হবে, কোন্ সময় বল ছুঁড়ে-ছুঁড়ে খেলা শেখাতে হবে, হপ্তায় কয়দিন করে সাবান মেখে স্নান করাতে হবে, কি ভাবে দুর্দান্তের দেহে পাউডার ঘষতে হবে—সব কিছু শিখিয়ে দিল রসময়কে।

রসময়ও চালাক-চতুর চটপটে ছেলে। দিব্যি গাঁট্টাগোট্টা চেহারা। ছুটোছুটি করে কাজ করতে খুব ভালোবাসে। দুর্দান্তের উপযুক্ত সাথী হয়েছে রসময়। ওকে নিয়ে ছুটোছুটি আর লাফালাফি করতে রসময়ের মোটেই আপত্তি নেই।

একটা বল কিনে দিয়েছেন দাদু। সকাল হলেই রসময় বল হাতে দুর্দান্তকে নিয়ে কাছের পার্কে গিয়ে হাজির হয়। সেখানে ছুটোছুটি আর লাফালাফি।

কিছুদিন পর বাড়ির গিন্নি কর্তাকে ডেকে ফিস ফিস করে বললেন,—এ যে মহা মুশকিল।

গিন্নি জবাব দেন,—ওই পার্কে গিয়ে হুটোপুটি করে যেমন রসময়ের খোরাক বাড়ছে, তেমনি ক্ষিদেয় ছোঁকছোঁক করছে কুকুরটা। আগে যে মাংস খেতো, তাতে এখন কুলোচ্ছে না। মনে হয়, কুকুরটা আরো খেতে চায়।

কর্তা বলেন,—তা কুকুর পুষতে গেলে খরচ করতেই হবে। আমরা খাই বা না খাই, কুকুরের খোরাক রাজসিক রাখতেই হবে।

ইতিমধ্যে একদিন মামু এসে হাজির। সব শুনে মামু বললে,—দুর্দান্তের এখন বয়েস বাড়ছে তো! তাই ধীরে ধীরে ক্ষিদেটাও বাড়ছে। ওর মাংসের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হবে।

Table of Contents

খাঁটি দুধও দিতে হবে প্রচুর পরিমাণে। একবেলা মাংস ভাত, আর একবেলা দুধ-ভাত। তাতে শরীরের বাড় হবে তাড়াতাড়ি। আরো তেজী আর দুর্দান্ত হয়ে উঠবে কুকুরটা থুড়ি দুর্দান্ত।

বাড়ির গিন্নি চুপিচুপি জানান, আর ওই হতচ্ছাড়া রসময়ের খোরাকও যে বেড়ে যাচ্ছে। দুবেলা কুকুরটার সঙ্গে পার্কে দৌড়ঝাঁপ করে ওরও খোরাক বেশি হয়ে যাচ্ছে—তার উপায় কি?

মামু হাসতে হাসতে জবাব দিলে, ওর জন্যে ভাবনা কি? মোটা চালের ভাত আরো এক থালা দিলেই হবে। সেই সঙ্গে কড়ায়ের ডাল আর চচ্চড়ি। কত খাবে খাক্ না!

তারপর থেকেই রসময় একেবারে আক্রোশে ফেটে পড়েছে। নিজের চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছে ওর জন্যে মাংসের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে, বাড়িতে গোয়ালা খাঁটি দুধ দুইয়ে দিয়ে যাচ্ছে, মিষ্টি আসছে, ভাত রান্না হবে—দুধ-ভাত মেখে খেতে দেবে কুকুরটাকে। এ ছাড়া আসছে কুকুরের জন্যে নতুন বিছানা, গায়ে মাখার সাবান আর লোমে মাখবার পাউডার, গলায় বাঁধবার জন্যে সৌখীন বিদেশি বকলস। দেখে দেখে রসময়ের চোখ যেন জ্বালা করতে থাকে। আর রসময়ের নিজের জন্যে গিন্নি ব্যবস্থা করেছে মোটা চালের ভাত, কড়ায়ের ডাল আর পুঁই চচ্চড়ি! কেন, ও কি কুকুরের চাইতেও নিচু জাত?

রসময় যত ভাবে, যত দেখে, ততই তার চোখ জ্বালা করতে থাকে। মনে যেন কে আগুন দেয়! যে কুকুরের জন্যে ওর এই বাড়ির চাকরি সেই কুকুরটাকে সে সহ্য করতে পারছে না। ওর ভেতর জিলিপির প্যাঁচ খেলতে থাকে। ওই কুকুরটাকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে।

কিন্তু তারও কি যো আছে? বাড়িসুদ্ধু দৃষ্টি সব সময় ওই কুকুরটার ওপর।

যত ভাবে, তত রসময়ের মাথাটা গরম হয়ে যায়। সে সারারাত পাগলের মতো শুধু পায়চারি করে।

রাত্তিরে উঠে-উঠেও বাড়ির লোকেরা উঁকি দিয়ে দেখে যায়, দুর্দান্ত ঠিক আছে কিনা, ঠিক মতো ঘুমতে পারছে কিনা, ওর গলার বকলসটা রাত্তির বেলা খুলে রাখা হয়েছে কিনা।

রাত্তির বেলা দুর্দান্ত অনেক সময় সারা বাড়ি টহল দিয়ে ফেরে। কোথায় কখন খুট্ করে শব্দ হল, আর সঙ্গে সঙ্গে দুর্দান্তের কান খাড়া হয়ে গেল। হয়তো পাশের গলিতে কারো গলার আওয়াজ শোনা গেল আর সঙ্গে সঙ্গে দুর্দান্ত জানালার কাছে গিয়ে হাজির হয়েছে।

দুর্দান্ত যেন একটা ঝক্‌ঝকে ধার দেওয়া তরোয়াল কিংবা বিদ্যুতের একটা চমক! মুহূর্তের মধ্যে বাড়ির এক কোণ থেকে আর এক কোণে চলে যায়। রসময় তাকিয়ে দুর্দান্তের এই চলার ঝিলিক দেখে। তার মগজে নানারকম দুষ্টু বুদ্ধি গজিয়ে ওঠে।

রসময় ভাবে, একদিন রাত্তিরে দরজা খুলে রেখে দেবো, কুকুরটা যে দিকে দু চোখ যায় চলে যাক্ না।

কিন্তু সেই সুযোগ আর রসময় পায় না।

দাদাবাবুদের পরীক্ষা। অনেক রাত জেগে দাদাবাবুরা পড়াশোনা করে। মাঝে মাঝে এসে দুর্দান্তকে আদর করে যায়। ওরা যদি বা শুতে গেল, বুড়োবাবুর ঘরে খুট্‌খাট্ আওয়াজ। অত রাত্তিরে উঠে বুড়োবাবু আফিম খায়, তারপর গুড়ুক গুড়ুক তামাক টানতে থাকে। এ ঘর যদি শান্ত হল তো, ঠাকুমার ঘরে ঠুন্‌ঠুন্ শব্দ শুরু হয়। বুড়ি রাত জেগে জমানো মোহর গোনে কিনা কে জানে! শেষ রাত্তিরে আবার দিদিমণি তানপুরা নিয়ে গলা সাধে।

Table of Contents

কাজেই রসময় আর সুযোগ পায় না মোটে।

একদিন রসময়ের মগজে দুষ্টু সরস্বতী চেপে বসল। সে ভাবলে, বাড়িসুদ্ধ সবাইকে যদি কোনো রকমে সিদ্ধিবাটা খাইয়ে দেওয়া যায়, তাহলে মড়ার মতো ঘুমুবে ওরা সারা রাত। তখন সদর দরজাটা খোলা রেখে দিলেই হবে।

সিদ্ধি বেটে সন্ধ্যে থেকে ঘাপটি মেরে বসে রইল রসময়। কিন্তু কিসের সঙ্গে সেই সিদ্ধিবাটা মেশাবে? দুধের সঙ্গে মেশালে সেই দুধের রং সবুজ হয়ে যাবে। তাহলে উপায়! তরকারির সঙ্গে মিশিয়ে দেখা যেতে পারে। দু একবার রান্নাঘরের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করলে রসময়। কিন্তু বুড়ো বামুন ঠাকুর দোক্তা দিয়ে পান চিবুচ্ছে আর রান্না করছে। ভারি খিট্‌খিটে মেজাজ। ওখানে ঢুকতে দেবে না বামুনঠাকুর। ঝিকে দিয়ে এ কাজ উদ্ধার করা যাবে না। সে প্রস্তাব শুনেই এমন চেঁচামেচি শুরু করবে যে বাড়িসুদ্ধু লোক এসে জড় হবে সেখানে।

অনেক চেষ্টা করেও যখন রসময় সফল হতে পারল না, তখন সে রেগেমেগে নিজেই সবটা সিদ্ধিবাটা খেয়ে রাত্তিরে শুয়ে রইল।

তারপর সারারাত যে কোথা দিয়ে কেটে গেছে, সে জানে না। সকাল বেলাতেও ঘুম ওর দু চোখ থেকে ছুটি নিতে চায় না! বাড়ির লোকের কাছে তখন সে কী বকুনি! লজ্জায় রসময় কাউকে মুখ দেখাতে পারে না।

বাড়িসুদ্ধু লোককে ঘুম পাড়াতে গিয়ে নিজেই ঘুমে কাবু!

অবশেষে একদিন একটা সুযোগ জুটে গেল। বাড়িসুদ্ধু লোকের এক বিয়ে বাড়িতে নেমন্তন্ন সেদিন।

নিকট আত্মীয়-বাড়ির কাজ। সবাইকে যেতে হবে। বাড়ির কর্তা রসময়কে ডেকে সব কিছু বুঝিয়ে দিলেন। ঘরের ভেতর দুর্দান্ত রইল, ভয়ের কিছু নেই। বাড়ির গিন্নি রসময়কে গোপনে ডেকে বললেন,—বাড়ির কেউ আজ দুধ খাবে না। সবটা ক্ষীর করে রেখেছি। তুই খেয়ে নিস রসময়। তাছাড়া তোর জন্যে আলাদা সন্দেশ-রসগোল্লা কৌটোতে রেখে গেলাম। মাথা খাস—খেয়ে নিস। আর দুর্দান্তটার ওপর দৃষ্টি রাখিস। আমরা হয়ত বেশি রাত করে ফিরবো। সব সময় সজাগ থাকবি।

বাড়িশুদ্ধু লোক গাড়ি করে বিয়ে বাড়ি চলে গেল। রসময় বিড়িতে একটা সুখটান দিয়ে ভাবে, আমিই এখন বাড়ির কর্তা। যা খুশি তাই খাবো, তারপর মজাসে ঘুম লাগাবো।

মাদুর পেতে বারান্দায় টান-টান হয়ে শুয়ে আপন মনে গুনগুন করে গান গাইতে লাগলো রসময়।

খানিকক্ষণ বাদে উঠে সে দুর্দান্তের বকলস আর শেকল খুলে নিলে। তারপর বাড়ির সদর দরজাটা হাট করে খুলে রেখে আবার মাদুরে শুয়ে মনের সুখে বিড়ি টানতে লাগলো। চোখ পিটপিট করে সে দেখে দুর্দান্তটা এখন কি করে।

নাঃ, দুর্দান্তটা তো বাড়ির বাইরে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে না। কেবলি এঘর ওঘর ঘুরছে।

আর রসময় বিড়ি টানতে টানতে, নানান কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়ল, তা নিজেই টের পায়নি।

অনেক রাত্তিরে দুর্দান্তের দারুণ চিৎকারে রসময়ের ঘুম গেল ভেঙে। ধড়মড় করে উঠে বসবে সে দেখে, আবলুস কাঠের মতো কালো রঙের এক ষণ্ডা-গুণ্ডা মানুষের কাঁধের ওপর সামনের দুই পা তুলে দুর্দান্ত গর্জন করছে, আর সেই গুণ্ডাটা প্রাণের দায়ে চিৎকার

Table of Contents

করছে। এই দুই রকম কানফাটা শব্দে আশপাশের বাড়ির লোকজন, দারোয়ান, ঝি, চাকর দৌড়ে এসেছে।

তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি করে বাড়ির লোকেরাও এসে হাজির। বাড়িতে একটা হুলস্থুলু কাণ্ড পড়ে গেল।

কেউ কিন্তু দুর্দান্তের কাছে ঘেঁষতে ভরসা পাচ্ছে না। আর সেই গুণ্ডাটাও প্রাণপণে ঁ্যাচাচ্ছে!

বেগতিক দেখে বাড়ির কর্তা থানায় ফোন করে দিলেন। একটু বাদে দারোগা আর কয়েকজন পাহারাওলা এসে হাজির। ওরা কৌশলে গুণ্ডাটার দুই হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিলে।

দারোগা সব দেখে শুনে, ভালো করে তদন্ত করে বাড়ির কর্তাকে বলেন,—নিশ্চয়ই চাকরটার সঙ্গে গুণ্ডাটার যোগসাজশ ছিল। নইলে সদর দরজা কে খুলে দিলে?

সুতরাং আর একটা হাতকড়া পরিয়ে পাহারাওলারা রসময়কে থানায় টেনে নিয়ে চলল।

রসময় যেতে যেতে ভাবছিল, নিশ্চয়ই ওর চাইতে কুকুরটার বুদ্ধি বেশি। গুণ্ডাটাকে ঘায়েল করেছে, বাড়িটার টাকা-কড়ি, ধন-সম্পত্তি সব বাঁচিয়ে দিয়েছে। আর আমি লোকটা দেখছি, নেহাতই বেকুব। নইলে মানুষ হয়ে কুকুরের সঙ্গে লাগতে যাই!

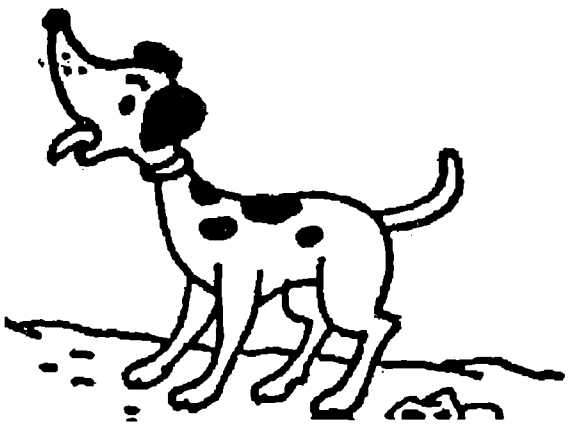

Table of Contents

জোকার

শক্তিপদ রাজগুরু

ন্যাড়ার দিকে চেয়ে থাকি অবাক হয়ে। চকচকে প্যান্ট, টেরিলিনের শার্ট আর ঝকঝকে জুতো পরে ও কদিন আগেই কলকাতা থেকে ফিরে এসেছে। মাঝে মাঝে এমনি দেশভ্রমণে যায় ন্যাড়া। দিল্লি, বোম্বাই, জামশেদপুর, কলকাতা সব তাবড় শহরেই ওর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রা থাকেন। তাঁদের কাছে যেতে হয় তাকে। ন্যাড়া বলে, কুয়োর ব্যাঙ হয়ে এই কাঞ্চনপুরে পড়ে রইলি সমী, সি দি ওয়ার্লড। পৃথিবীকে ঘুরে দেখতে হবে।

ন্যাড়া তাই যেন পৃথিবী ঘুরতে শুরু করেছে। ক্লাস এইটে তিনবার গোঁত্তা খেয়ে এবার আমাদের সঙ্গে পড়ছে। বাজারপাড়ায় ওদের বেশ কয়েকখানা বড় বাড়ি। দোকানপত্রও আছে। ন্যাড়ার বাবা-দাদা এখানকার বনেদী ব্যবসায়ী।

ন্যাড়াও সেবার ক্লাস এইটে গাড্ডু মেরে বাজারের একটা ঘরে দোলের আগেই আবীর, রঙ, পিচকারি, বেলুন, লজেন্স, বিস্কুট নিয়ে একটা দোকান খুলে বসে গেল। আমরা ভাবলাম, ন্যাড়া বোধহয় ব্যবসাতেই নামল। তাই বলি, কী রে, পড়াশুনা করবি না?

ন্যাড়া বিজ্ঞের মতো বলে, পড়ে কী হবে? থার্ড পণ্ডিতের কথাটা মনে নেই—'বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী'? তাই ভাবছি ব্যবসাই করব এবার।

থার্ড পণ্ডিতের বেদবাক্যটা ন্যাড়া জীবনের পাথেয় করে তুলেছে। কিন্তু কদিনের

Table of Contents

মধ্যেই আবীর, বেলুন খতম করে একা একাই সব লজেন্স, বিস্কুট খেয়ে নিয়ে ন্যাড়া আবার স্কুলে এসে হাজির হয়ে বলে, সামার ভেকেশানে এবার বোম্বে যাচ্ছি ছোট পিসির ওখানে।

ন্যাড়া মহাভাগ্যবান। সারা ভারতবর্ষ ও চষে বেড়াচ্ছে। কদিন আগেই দিল্লি থেকে ফিরেছে বোম্বাই হয়ে। দিল্লির কোন মন্ত্রীর বাড়িতে ও নাকি রোজ সন্ধ্যায় ক্যারাম খেলতে যেত। কলকাতার ফুটবল কোচ পি. কে. তো এবার ন্যাড়াকে ছাড়তেই চায় নি নাকি।

খেলার মাঠে এসে গল্প করে ন্যাড়া—বিচিত্র সব গল্প। কত নামি দামি লোক ন্যাড়াকে লুফে নিতে চান। ন্যাড়া বলে, তবু কী জানিস, হোম, হোম, সুইট হোম। কাঞ্চনপুরকে 'লাভ' করি, তাই আই কাম ব্যাক।

ন্যাড়া ক্লাস এইট অবধি রগড়েছে, আর ইংরাজিতে তার নম্বর পনের-বিশের বেশি কোনদিন ওঠে নি। কিন্তু মুখ দিয়ে ইংরাজি বুলি ছোটে তুবড়ির মতো।

আমাদের এখানকার দারোগাবাবুর ছেলে ভুতো আড়ালে বলে,—সব গুল! ও ব্যাটা নাম্বার ওয়ান লায়ার।

ন্যাড়ার যে কোন গুণ নেই, এটা আমার মতো ন্যাড়া ভক্তের মানতে মন চায় না। তাই কথাটা শুনে চুপ করে থাকি।

সেদিন খেলার মাঠে কথা উঠেছে এবারের গুপীবাগানের মেলা নিয়ে। কদিন ধরে শান্ত কাঞ্চনপুরের জীবনে ঐ মেলাটা বিচিত্র উন্মাদনা আনে। রাঢ় অঞ্চলে ধান উঠে যাবার পর সারা দেশের লোকের হাতে বেশ কিছু পয়সা আসে। ঐ সময় গ্রামের বাইরে বিরাট বাগানটার ধারের মাঠে ঐ মেলা বসে। শহর থেকে এখান-ওখান থেকে বড় বড় দোকান-পসার আসে, আসে ম্যাজিকের তাঁবু, সিনেমা। যাত্রা-কবিগানের আসর বসে। দূর-দূরান্তর থেকে আবালবৃদ্ধবনিতা আসে এই মেলায়। গরুর গাড়িতে, বাসে, ট্রাকে, পায়ে হেঁটে ওরা আসে মেলায়, যেন সমুদ্রের ঢল নামে।

এবার গোপীবাগান মেলার প্রধান আকর্ষণ—'দি গ্রেট ক্যামিংটন সার্কাস'। গ্রেটই বটে। বিরাট তাঁবুটা পেল্লায় দুটো খাম্বার ওপর থেকে বিরাট ছাতার মতো নেমে এসেছে বাগানের ফাঁকা জায়গাটায়। আর তাঁবুর চারিপাশের অনেকখানি জায়গা কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে তার মধ্যে ওদের ছোট ছোট তাঁবু গেড়ে যেন একটা উপনিবেশ গড়ে তুলেছে। নিজেদের ডায়নামোতে আলো জ্বলে। আকাশ ছোঁয়া তাঁবুর ওপর থেকে রঙ্গিন মালার মতো আলোগুলো নেমে এসেছে।

ওই গ্রেট ক্যামিংটন সার্কাসের বিজ্ঞাপন নিয়ে ছুটছে এ দিগরের যত বাস ট্যাক্সি। বাজারের দেয়ালে রঙিন ছবিতে দেখা যায় বাঘ-হাতি-ঘোড়ার ছবি। দোলনায় দুলছে মেয়েরা, আর একটা লোক জামা পরে একগাদা মেডেল ঝুলিয়ে একটা ইয়া বড় বাঘের সঙ্গে লড়ছে। বাঘের সঙ্গে লড়তে গেলে বোধহয় ঐসব মেডেল পরতে হয়।

বাজারে এখনও রহিম সেখের ছ্যাকড়া ঘোড়ার গাড়িটা টিকে আছে। সার্কাস কোম্পানি ঐ গাড়িটা ভাড়া করে ব্যান্ড-ব্যাগপাইপ বাজিয়ে সারা গ্রাম চক্কর দিয়ে লাল-নীল হ্যান্ডবিল বিলিয়ে বেড়ায়। আর ঐ সার্কাসের জন্যই এবার খোদ মহকুমা শহর থেকেও নাইট-স্পেশাল বাসও যাতায়াত করছে। এ ঢাকলার লোক ভেঙে পড়েছে মেলায়। রোজ শোয়ের টিকিটের জন্য মারামারি হচ্ছে।

ভুতোর বাবা এখানকার দারোগা। দারোগাদের বোধহয় কোথাও টিকিট ফিকিট লাগে না। ভুতো সেই সুবাদে এর মধ্যেই সার্কাস দেখে এসে আজ গল্প করছে বেশ ডাঁট নিয়ে।

Table of Contents

—বুঝলি, দেখে আয় গ্রেট ক্যামিংটন সার্কাস। খাস বিলেতী সাহেবদের ব্যাপার। যেমন খেলা, তেমনি বাঘ-হাতি-ঘোড়ার খেলা। রিঙের ধারে সোফায় বসে দশটাকার সীট দখল করে সার্কাস দেখে এলাম। বড়সাহেব খাতির করে চা খাওয়ালে। খাস দার্জিলিং টী। বাঘের সঙ্গে লড়াই তো সুপার্ব!

ন্যাড়া বলে ওঠে,—কার সার্কাস বললি? ক্যামিংটন সাহেবের সার্কাস?

ভূতো বলে,—যা, দেখে জন্ম সার্থক করে আয়।

দেখে-শুনে ভূতোর জন্ম সার্থক হয়ে গেছে এমনি ভাবখানা দেখিয়ে ভূতো চলে যাবার আগে বলে, তবে টিকিট পাবি কিনা দেখ্! শুনলাম, তিনদিন আগে থেকে হাউসফুল।

ন্যাড়া কী ভাবছে!

আমরা বাড়ি ফিরছি। কাতারে কাতারে লোক চলেছে মেলার দিকে। দূর থেকে ঐ বিরাট তাঁবুর আলো দেখা যায়। একটা সার্চলাইট আবার ঘুরছে আকাশে। ব্যান্ড-ব্যাগপাইপ-কর্নেটের সুর ওঠে। ওখানে যাবার ভাগ্য যেন আমার নেই। তাই ন্যাড়ার দিকে চাইলাম। ওর তো সারা ভারতের অনেক তাবড় লোকের সঙ্গে আলাপ সালাপ।

কোন্ সাহেব নাকি ওর হাতসাফাইয়ের ফেলা দেখে হোমে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। ন্যাড়াকে শুধোই,—হ্যাঁরে, ও ক্যামিংটন সাহেব না কী যেন নাম বলল। ওর সঙ্গে তোর চেনাজানা আছে?

ন্যাড়া আমার দিকে চাইল—যাবি সার্কাস দেখতে?

আমি যেন হাতে চাঁদ পেয়েছি। বলি, ভূতোটার ডাঁট দেখলি?

ন্যাড়া তাচ্ছিল্যভরে বলে, যেতে দে ফালতু কথা। ক্যামিংটন সাহেবের গুরু পেরেরা সাহেবই তো আমায় বলেছিল,—"গো উইথ মি নোড়া, আই মেক ইউ এ ম্যান।" কাল আয়, আমি ক্যামিংটন সাহেবের সঙ্গে কথা বলে রাখছি। এক্কেবারে তাঁবুর ভিতরে ওর চেম্বারে গিয়ে আলাপ করিয়ে দেব। দেখবি আমায় কেমন খাতির করে। দারোগার ব্যাটা খুব ডাঁট নিচ্ছিল। এবার দেখবি ন্যাড়ার এলেম।

পরদিন সকালবেলা ন্যাড়াদের বাড়ি গেছি। ন্যাড়া তখন চা খাচ্ছে। মুড়ি আর চা। আমাকে দেখে বলে, বুঝলি, বিস্কুট-টোস্ট খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গেছে। মুড়ি দিয়ে চা রিয়েলি নাইস। সেবার দিল্লীতে এক পার্টিতে গেছি হোটেল অশোকাতে।

ন্যাড়ার গল্প শুরু হলে আর থামে না, দিল্লি, বোম্বাই, কলকাতা, কাশ্মীর সব শুরু হয়ে যায়। কোথায় কখন্ মুড়ি খেয়ে কোন্ সাহেব কী বলেছিল তার ফিরিস্তি দিতে থাকে ও। এক ফাঁকে আমি বলি, হ্যাঁরে, আজ যাচ্ছি তো? অনেক আশা নিয়ে এসেছি, সার্কাস দেখতেই হবে। আর ওই সাহেবদেরও দেখা হবে।

ন্যাড়ার যেন খেয়াল হয় এবার। বলে,—ও হ্যাঁ। অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছে সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় বড় সাহেবের সঙ্গে। তা তোর প্যান্ট, ভালো শার্ট, সু, টাই আছে তো?

পাড়াগাঁয়ের ছেলে। ধুতি-পাঞ্জাবিই পরি। দু-একটা ছিটের শার্ট আছে, আর খেলার জন্য হাফপ্যান্ট। জুতো বলতে স্যান্ডেল।

সব শুনে ন্যাড়া বলে,—গেঁইয়াই থেকে গেলি! এখন স্যুট-বুট না পরে গেলে কী করে 'মাই ফ্রেন্ড' বলে পরিচয় করিয়ে দিই সাহেবের সঙ্গে!... ও. কে.। ঠিক আছে আমার এক্সট্রা প্যান্ট শার্ট সু দিয়েই হবে। তবে ব্যান্ডবক্স-এ ধোয়ানো, পাঁচ টাকা চার্জটা আনিস।

Table of Contents

আমি অবাক—ব্যান্ড বাজিয়ে ধোয়ানো হয় ঐ প্যান্ট শার্ট?

ন্যাড়া হাসে—ব্যান্ড বাজিয়ে ধোয়ানো হবে কেন? ডাইং ক্লিনিং-এর নাম ব্যান্ডবক্স। কলকাতার নামি দোকান। ওসব হয়ে যাবে। তাহলে বৈকালে টাকা নিয়ে আসবি অ্যাট সেভেন থার্টি। ওরা আবার পাক্কা সাহেব। ভেরি পাংচুয়াল। ভেতো বাঙালির মতো নয়।

সন্ধ্যার আগেই দুরুদুরু বুকে ন্যাড়াদের বাড়ির দিকে চলেছি। সঙ্গে শেষ সম্বল একটা দশটাকার নোট। বহু কষ্টে অনেকদিন ধরে ওটা রেখেছিলাম। দু-চার আনা পয়সা বাঁচিয়েছি টিফিনের পয়সা থেকে। বৌদি-মা-কাকিমাদের লাইব্রেরির বই এনে দিয়ে, ফাইফরমাস খেটে যা পেয়েছি, তা থেকে টাকা, পাঁচটাকা, দশটাকার নোটে পরিণত করে সযত্নে রেখেছিলাম। আজ ওটাকেই বের করতে হয়েছে।

আমায় দেখে ন্যাড়া বলে,—টাকা এনেছিস?

নগদ দশটাকার নোটটা দেখে-শুনে পকেটস্থ করে সাহেবী ঢঙে বলে,—ও. কে.। হ্যাঁ শোন্, সাহেবের সঙ্গে দেখা হলে এমনি করে শেকহ্যান্ড করে বলবি—'হাড়ু ডু'।

অবাক হই—হাড়ুডু তো খেলে রে? হাত ধরে ওসব বলতে হবে কেন?

ন্যাড়া বলে ওঠে, যা বলছি, তা-ই করবি। নো টক। নে, তৈরি হয়ে নে।

তালগোল পাকানো একটু পুঁটলি থেকে বিরাট ঢাউস সাইজের লাল প্যান্ট আর লাল-নীল-হলুদের ছোপ ছোপ কাটা সব ইয়া পেল্লায় শার্ট বের করে ন্যাড়া বলে, আয় তোকে পরিয়ে দিই।

—এ যে দলামোচা পাকানো রে। বললি, ব্যান্ড বাজিয়ে কাচা! ব্যান্ড বাজিয়ে কাচলে এমনি হয় নাকি?

ন্যাড়া ধমকে ওঠে—ব্যান্ডবক্স-এ কাচা। এসব তুই বুঝবি না। নে পর্।

আমি যেন ঐ বিরাট ছালার মধ্যে সেঁধিয়ে গেছি। প্যান্টটা নড়বড় করছে। শার্টটার গহ্বরে আমাকে যেন খুঁজে পাওয়া যায় না। আর ঐ রঙচঙ দেখে নিজেই ঘাবড়ে গেছি। ন্যাড়া ততক্ষণে একটা লাল চওড়া ফিতে দিয়ে আমার গলাটা ফাঁস দিয়ে টানছে। ঘাবড়ে গিয়ে বলি, অ্যাই ন্যাড়া, দমবন্ধ করে মারবি নাকি! ন্যাড়া গর্জে ওঠে—টাই! একে বলে টাই। সাহেব তো দেখলি না জীবনে।

গিঁটটা এবার একটু আলগা করে দিল ন্যাড়া। আয়নায় এবার নিজেকে দেখে অবাক লাগে। পায়ে পরেছি ন্যাড়ার একজোড়া জুতো। ইয়া লম্বা, ইয়া চওড়া ডোঙার মতো জুতোয় কাগজ আর ন্যাকড়া ঠেসে পা ঢুকিয়েছি।

ন্যাড়া বলে,—একটু চলে-ফিরে প্র্যাকটিস করে নে।

এবার আমার হাত ধরে ও শেকহ্যান্ড করতে আমিও ওর শেখানো পোজমতো হাতটা ধরে বলে উঠি, হা-ডু-ডু-ডু-ডু।

ন্যাড়া গম্ভীরভাবে বলে,—ও. কে.। তবে অতগুলো ডু-ডু-ডু বলবি না, দু-একটা বলবি। ব্যস্, তাতেই হবে। সাহেবরা আবার বাড়াবাড়ি পছন্দ করে না।

এই বিচিত্র পোশাকে গ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে সাহস হয় না। অনেকেই হাসাহাসি করবে। হয়তো বা পাড়ার তাবৎ কুকুরই পিছনে লাগবে। তাই ন্যাড়াদের বাড়ির পেছনে দিঘির পাড় ধরে ধানক্ষেতে নামব আমরা। রাতের অন্ধকারে মাঠ দিয়ে গেলে কেউ দেখার থাকবে না। ঐ মাঠ দিয়ে সোজা মেলার ধারে পৌঁছানো যাবে।

Table of Contents

শীতের রাত। কুয়াশায় অস্পষ্ট সব কিছু। হিম পড়ে আলপথের ঘাসগুলো ভিজে পিছল হয়ে উঠেছে। ঐ বেঢপ প্যান্ট, নড়বড়ে শার্ট আর ইয়া ডোঙার মতো তিন-সাইজ বড় জুতো পরে হাঁটতে পারি না। আল-মাঠ টপকাতে কষ্ট হয়।

আমি বলে উঠি, এ কী পোশাক র‍্যা? মাঠ দিয়ে হাঁটা যায় না, কেমন জাপটে ধরেছে।

ন্যাড়াও প্যান্ট-শার্ট পরেছে। আমার কথায় ও বলে ওঠে, সাহেবরা কখনও আল-পগার টপকে হাঁটে? ইডিয়ট কোথাকার!

কথাটা হয়ত সত্যি। বিলেতে বোধহয় তাদের এমনি গমক্ষেত-আল-পগার টপকাতে হয় না, গাড়ি চড়েই ঘোরে। এদিকে জামা-প্যান্টের বোটকা গন্ধটা এবার বেড়ে ওঠে। আমি বলি, ব্যান্ড বাজিয়ে কাচা বললি,—তবে বোকাপাঁঠার মতো বোটকা গন্ধ—

কথাটা শেষ করার আগেই ভিজে ঘাসে পা পড়ে তিনহাত উঁচু পগার থেকে পা হড়কে সপাটে গমের ক্ষেতে পড়েছি।

চমকে ওঠে ন্যাড়া—কী হলো সমী।

আমি তখন হাঁটুভোর গমের ক্ষেতে পড়ে হাঁচড়পাঁচড় কাটছি। ঐ জামা-প্যান্ট যেন ছেঁড়া সামিয়ানার মতো আমাকে জড়িয়ে ফেলেছে। জানাই, তোল্ আমাকে।

ন্যাড়া টেনে টেনে কোনমতে আমাকে খাড়া করে গজগজ করে—ভূত কোথাকার!

খাড়া হয়েই খেয়াল হয়, ঐ পড়ার ধমকে ন্যাকড়া-কাগজের ডেলা গুঁজে ফিট করা তিনসাইজ বড় ডোঙাকৃতি জুতোর একটা কোথায় ছিটকে পড়েছে। হাতড়ে হাতড়ে সেটা বের করে আবার পায়ে চড়িয়ে রওনা হলাম।

মেলায় গিয়ে যখন পৌঁছলাম,—তখন আলোর বন্যা বইছে সেখানে। গ্রেট ক্যামিংটন সার্কাসের তাঁবুর টঙ থেকে আলোর মালা ঝুলছে। আলোকিত তাঁবুর ভিতরে দেখা যায় লোকজনের ছায়ামূর্তি। ব্যান্ডের শব্দ ওঠে। তাঁবুর টিকিটঘরের ওদিকে বিরাট ভিড়, লাইনে মারামারি চলছে। দারোগাবাবু, কন্‌স্টেবলেরা ভিড় সামলাতে ব্যস্ত। পরের শোয়ের টিকিট বিক্রী হচ্ছে। গেটের মুখে হাজার খানেক লোক।

কী হবে রে ন্যাড়া? ঢুকবি কী করে? —আমি হতাশাভরে জানাই। ন্যাড়া এদিক-ওদিক দেখে বলে,—এপাশে আয়।

দামি প্যান্ট পরে সেজেগুজে সাহেব হয়ে এসেছি। ভেবেছিলাম, ন্যাড়া গিয়ে গেটে খবর দিলেই ক্যামিংটন সাহেবের লোক আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে ভিতরে। কিন্তু ন্যাড়া গেটের মাথায় ঐ লোকদের ধারে কাছেই গেল না। আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলল পিছনের আবছা আলো-অন্ধকারময় জায়গাটার দিকে।

কতকগুলো পুরনো আম জাম গাছের জটলা এদিকে, তাই অন্ধকার। এক-আধটু আলো দেখা যায়। এটা বোধহয় তাঁবুর পেছন দিক। এখানে ওখানে ছোট-বড় তাঁবু, অস্থায়ী চালামতো দেখা যায়। দু-একটা করে খাটিয়া পাতা। কোথায় হ্যারিকেন জ্বলছে টিমটিম করে। এগুলো সার্কাসওয়ালাদের থাকার আস্তানাই মনে হয়। জিনিসপত্রও রয়েছে এখানে ওখানে।

সেঁধিয়ে পড়্! —ন্যাড়া চাপা স্বরে বলে আমাকে।

কাঁটাতারের বেড়াটা এখানে একটু ফাঁক মতো। বোধ হয় তাঁবুর বাসিন্দারা এই পথ দিয়েই ওদের এলাকার বাইরে যাতায়াত করে। নিঃশব্দে একটা তাঁবুর পেছন দিয়ে কয়েকটা আমগাছের নিচে আবছা অন্ধকারে এসে দাঁড়ালাম।

Table of Contents

আমি শুধোই, কী রে ন্যাড়া, বললি ক্যামিংটন সাহেবের সঙ্গে কথা হয়েছে, দেখা করতে যাবি, তা চুরি করে ঢুকছিস কেন পিছন দিয়ে? যদি জানতে পারে?

কথাটা শেষ করার আগেই একটা গোলমাল শুনে সামনে তাকালাম। কজন সার্কাসের লোক একজনকে ধরাধরি করে আনছে। লোকটা গড়িয়ে পড়ছে, আর কী সব গালাগাল করে এলোপাথাড়ি হাত চালাচ্ছে। ওরা তাকে ধরে এনে পথের ধারে ঐ তাঁবুটাতে একটা খড়ের গাদার ওপরে শুইয়ে দেয়।

ওদিকে কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে। অর্থাৎ আমাদের পালাবার পথও বন্ধ হয়ে গেল। ওদিক থেকে দুজন লোক গটগট করে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকেই। ন্যাড়া আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে একটা গাছের গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়াল। লোকদুটো যেন আমাদের দেখে ফেলেছে, আর ধরা পড়লে ঐ গাবদা লোকটা কেমন প্রহার দেবে তা ভাবতেও শিউরে উঠি। দম বন্ধ করে আছি।

বরাত ভালো। ওরা এদিক-ওদিক ঘুরে ঐ তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে চড়া গলায় কাকে যেন ধমকাতে লাগল। একজনের চেহারা মুগুরের মতো, অন্যজন কালো আর তেমনি দশাসই চেহারা। হাতে চেনে বাঁধা একটা কুকুর।

আমার সার্কাস দেখার সখ ঘুচে গেছে। নগদ যে দশটা টাকা গেছে ন্যাড়ার খপ্পরে, সেটাও এখন ছাড়তে রাজি। বের হতে পারলে বাঁচি। তাই বলি, ন্যাড়া, অন্ধকারে কেটে পড়। লোকগুলো কাদের যেন খুঁজছে। ধরতে পারলে বৃন্দাবন দেখিয়ে দেবে!

ন্যাড়াও বিপদের গুরুত্ব বুঝে বলে, ক্যামিংটনকে তো দেখছি না। বরং বাইরেই চল্।

ন্যাড়ার ওপর রাগটা এবার জমে উঠেছে। বাজে কথাই বলেছিল। এবার কোনরকমে বাইরে যেতে পারলে ওকে দেখে নেব। দুজনে এখন পালাবার পথ খুঁজছি। ওদিক থেকে সেই লম্বা মিশকালো লোকটা কাকে গজরাচ্ছে—কিল হিম! খতম কর্ দেগা!

ওর গলার আওয়াজ যেন হাঁড়ির ভেতর থেকে আসছে। ভয়ে পিছু হাঁটছি। হাঁটছি। হঠাৎ কিসের গর্জন শুনে দুজনে থমকে দাঁড়ালাম। অন্ধকারে ভাঁটার মতো দুটো চোখ জ্বলছে। বাঘ! সামনে আমাদের দেখে বাঘটা গর্জন করে ওঠে 'হুম্-ম্-ম্... গর্-র্-র্...' আর থাবা দিয়ে খাঁচার শিকগুলোয় ঝাপটা মারে। মনে হয়, ঐ থাবার থাপ্পড়ে পলকা শিকগুলো ভেঙে যাবে, আর অমনি বাঘটা লাফ দিয়ে এসে এবার আমাদের ঘাড়েই পড়বে।

বাতাসে ওঠে ওর হুঙ্কার আর বোটকা গন্ধ।

জ্যান্ত বাঘের চার হাতের মধ্যে কখনও আসি নি। একেবারে থাবার নাগালে এসে পড়েছি। বাঘটা দাপাচ্ছে আর হুঙ্কার ছাড়ছে। ওদিকের খাঁচার বাঘটাও এবার গর্জে ওঠে। ন্যাড়া আর আমি জড়াজড়ি করে ঠকঠক করে কাঁপছি। ওদের গর্জন ক্রমশ বাড়ে।

অন্ধকারে এবারে দৌড়োতে থাকি। যেভাবে হোক বের হতেই হবে। আর তখুনি কাণ্ডটা বেধে যায়। একটা খালি ড্রাম পড়েছিল। দুজনের ধাক্কায় খালি ড্রামটা হুড়মুড় শব্দ করে গড়াতে গড়াতে গিয়ে ওদিকের গাছের নিচে কিসে আটকাতেই কালো জমাট অন্ধকার যেন সজীব হয়ে তীক্ষ্ণ গর্জন তোলে। শাঁখের আওয়াজের মতো শব্দ ছাপিয়ে ন্যাড়ার চিৎকার ওঠে—ওরে বাবা রে, মেরে ফেললে রে!

ন্যাড়া আমগাছের ঘন ডালপাতার মাঝে হুটোপুটি খাচ্ছে আর পরিত্রাহি চিৎকার করেই চলেছে।

Table of Contents

ড্রামটা গিয়ে লেগেছিল একটা হাতির গায়ে। ও ব্যাটা তেড়েমেড়ে উঠে সামনে ন্যাড়াকে পেয়ে শুঁড় দিয়ে পেঁচিয়ে একেবারে মাথায় তোলে।

বাঘের গর্জনে, হাতির বৃংহণে, সর্বোপরি ন্যাড়ার আর্তনাদে তাঁবুর আশপাশের লোকজনরা দৌড়ে আসছে এই দিকেই। সমূহ বিপদ। আমি এবার ঐ বস্তার গাদা, তেরপলের স্তূপের আড়ালে অন্ধকারে গুঁড়ি মেরে বসে পড়ি। পালাবার আর পথ নেই।

হাতির মাহুতও এসে পড়ে। সে চিৎকার করছে—বজরঙ্গজী, উতার দো উসকো।

হাতিটার নাম বোধহয় বজরঙ্গী। ন্যাড়াকে শুঁড় দিয়ে তুলে আমগাছের ঘন ডাল-পাতার মধ্যে রগড়াচ্ছে। মাহুতের কথায় হাতিটা ওকে নামিয়ে দিয়েছে। ততক্ষণে ওকে ঘিরে ফেলেছে কয়েকজন লোক।

কে ধমকে ওঠে—হিঁয়া কিঁউ আয়া? চলো উধার।

ন্যাড়াকে ধরে ফেলেছে। এবার নিয়ে যাবে তাকে কর্তাদের কাছে। আমি তখনও চটের গাদার আড়ালে। ওরা ধরে নিয়ে যাক ন্যাড়াকে। এই ফাঁকে আমি বের হয়ে যাব।

হঠাৎ বিকট গর্জন করে হাঁড়ির মতো মুখখানা দেখে চমকে উঠি। চেনবাঁধা অ্যালসেশিয়ান কুকুরটাকে নিয়ে সেই কালো দশাসই লোকটা আসছিল এদিকে। গোল বাধিয়েছে কুকুরটা। ও ব্যাটা লাফ দিয়ে একেবারে ঐ বস্তা-তেরপলের গাদার সামনে এসে গর্জন করে ওঠে। ইয়া জিভটা লকলক করে। সেই দশাসই কালো লোকটাও এবার দেখে ফেলল আমাকে ঐ বস্তার ফাঁকে। লোকটার মাথায় একগাছি চুল নেই, কেবল টাক। আর চোখদুটো করমচার মতো লাল। গর্জন করে ওঠে লোকটা—ইউ বাগার, কাম আউট।

কুকুরটা হাঁচড়পাঁচড় করছে। ওর দাপানির চোটে বস্তার টালটা পড়েছে আমার ওপরেই। বোধহয় খালি চুনের বস্তা ওগুলো। নাক-মুখ ঢেকে গেছে চুনে, আর কাসছি, হাঁচছি বেদম। নড়াচড়ার কায়দা নেই। তাই বলি, আউট হবো কেমন করে?

—হোয়াট! ইউ ড্যাম সোয়াইন!

আরো কারা এসে পড়েছে। ওরা বস্তা সরিয়ে আমার ঐ বিচিত্র মূর্তিটিকে পেশ করল সেই লোকটার সামনে। পরনে ঐ প্যান্টুল সাদা-লালে ছুপে গেছে, লাল শার্টের চক্করবক্কর রঙ-বাহার, আই দুই পেল্লায় জুতো পরা চুনমাখা বিচিত্র মূর্তি দেখে সাহেব বলে, হু আর ইউ?

ইনিই ক্যামিংটন সাহেব। কোন্ দেশের সাহেব জানি না। সাহেবরা যে তোলা হাঁড়ির মতো মিশকালো হয় জানা ছিল না। লোকটা এক হেঁচকা টানে আমাকে বস্তার গাদা থেকে শূন্যে তুলেছে। মনে হয় জ্যান্ত বাঘের সামনে থেকে এবার যেন গরিলার খপ্পরেই পড়েছি। ওরা ন্যাড়াকেও এনে হাজির করে—আউর একঠো হ্যায় বস।

সাহেব আমাদের দুই মূর্তিকে দেখছে এবার। বিচিত্র পোশাক আর হাবভাব দেখে সে চেয়ে আছে। ন্যাড়া হাতির শুঁড়ে চেপে গাছের ডালে রগড়ানি খেয়ে ঘাবড়ে গেছে। গাছের ডালে ছিল নালসে পিঁপড়ের বাসা। সেই বাসা ভেঙে এন্তার পিঁপড়ে তার জামা-প্যান্টের মধ্যে সেঁধিয়ে গেছে। তারা এবার কামড়াচ্ছে সর্বাঙ্গে। আর ন্যাড়া কিলবিল করে চুলকোচ্ছে হেলে-দুলে।

কে বলে উঠল,—গুড জোকার বস্। জনের তো আলুর চপ আর কাটলেট খেয়ে পেট ছেড়েছে। দে আর গুড জোকারস।

Table of Contents

ঐ বিরাট তাঁবুভর্তি লোকের সামনে জোকারি করতে হবে ভেবেই ককিয়ে উঠি—মাপ কর সাহেব। ঐ ন্যাড়া পারে ঐ সব।

হেঁড়ে গলায় গর্জে ওঠে বড়সাহেব—ইউ স্টপ!

কুকুরটাও চিৎকার করে—গর্-র্-র্!

বড়সাহেব দেখছে আমাকে। বিচিত্র সাজটা ওর নজরে পড়েছে। সে গর্জে ওঠে—টেক দেম ইন!

আমি কী বলতে যেতেই লোকটা বলে,—শ্যাম, টাইগার কেজ ওপন্ করো। ই হারামজাদাকো উধার ফেক দো।

হয় বাঘের পেটে যেতে হবে, নয়তো ঐ তাঁবুর মধ্যে হাজার হাজার মানুষের সামনে দাঁড়াতে হবে। এমন চরম বিপদে পড়তে হবে স্বপ্নেও ভাবি নি। ন্যাড়ার ফাঁদে পা দিয়েই আজ বিপদে পড়েছি।

কে যেন বলে,—আরে ম্যান, জোকারি ইজ ভেরি ইজি। দ্যাট টাইগার তুম্কো খতম কর্ দেগা। চলো ইধার বস্কো কুছ বোলো মাৎ।

এবার ওরা আমাদের দুজনকে টেনে নিয়ে চলে তাঁবুর সাজঘরের দিকে। যেন বলি দিতে নিয়ে চলেছে পাঁঠাকে।

ন্যাড়া মিইয়ে গেছে। ওর সব ধাপ্পাবাজি ধরে ফেলেছি। কিন্তু আর করার কিছু নেই। ওরা আমাদের দুজনকে এবার পাক্কা জোকার বানিয়ে ছেড়েছে। মুখে চুনের সাদা দাগের উপর নাকটা লাল টুকটুকে করে চোখে গোল দাগ দিয়ে হনুমান করে তুলেছে। মাথায় চাপিয়েছে একটা লম্বা টুপি, তার ডগায় একটা ফুলমতো। মাথা নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুলটা এধার ওধার দুলছে। একজন পেটমোটা জোকার আমাদের এর মধ্যে একটু তালিম দিয়ে নেয়। সে-ই এখন এক নম্বার জোকার। অন্যজন নাকি পেট ছেড়ে তাঁবুতে ককাচ্ছে। তাই আমাদের ধরে এনে নামিয়ে দিয়েছে।

তাঁবুটা এর মধ্যে ভর্তি হয়ে গেছে। লোকজন যেন মুখিয়ে ছিল। গ্যালারি, চেয়ার, সোফা, মাটি—কোথাও তিলধারণের ঠাঁই নেই। বাজনা শুরু হয়েছে। আলোগুলো নিভছে আর জ্বলছে। ঘণ্টা বাজতেই এরিনায় পরীর দলের মতো বিচিত্র পোশাক পরা একঝাঁক মেয়ে দৌড়ে গিয়ে তাঁবুর পোল ধরে তরতরিয়ে উঠে গেল। শূন্যে তারা দোল খেতে থাকে।

সার্কাস দেখা মজার, কিন্তু যারা করে তাদের যে এমনি অবস্থা, আগে তা জানা ছিল না। ঐ জনসমুদ্র দেখে ভয়ে ঠকঠকিয়ে কাঁপছি। এক নম্বর জোকার আমাদের দুজনকে নিয়ে এসেছে এরিনায়। মনে হচ্ছে, কাঁপতে কাঁপতে পড়েই যাব। তবু আসমানে ট্রাপিজের খেলা দেখছি। হঠাৎ পেছনে সপাটে তার লাথি খেয়ে ফুটবলের মতো শূন্যে ছিটকে উঠেছি। প্রাণভয়ে সামনে দড়িটা পেয়ে সেটাকে ধরে ফেলতে সেটা যে এভাবে দোল খাবে একধার থেকে অন্য ধারে, তা ভাবিনি। দুলছি, হঠাৎ ঝাঁকানির চোটে হাতটা ফসকে যেতে ছিটকে পড়ি। মনে হয়, হাড়গোড় ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। কিন্তু তা হয় না। ট্রাপিজের খেলোয়াড়দের নিরাপত্তার জন্য নিচে জাল পাতা ছিল, সেই লম্বা জালটার ওপর পড়েছি। চারদিকে হাততালির শব্দ ওঠে, হাসির তুফান ছোটে। সেই এক নম্বর জোকার তখুনি দর্শকদের মাথা নুইয়ে অভিনন্দন জানায়।

আমাকে কোনরকমে নেমে আসতে দেখে দর্শকরা হাততালি দিতে থাকে। মোটা জোকারটা যে খুব খুশি হয় নি এতে, বোঝা যায়।

Table of Contents

এর পর সাইকেলের খেলা শুরু হয়েছে। বেঁটে, লম্বা, উঁচু, দুচাকা-একচাকার নানাধরনের সাইকেল চালাচ্ছে ওরা। আমি অবশ্য এটা ভালোই পারি। তবু ভয় হয়। ঐ একচাকা-দেড়চাকার সাইকেল কী কাজে লাগে জানি না, তারের ওপরও সাইকেল চালাচ্ছে একজন। এত রাস্তা মাঠ থাকতে তারের ওপর সাইকেল কেন চালাতে হবে বুঝতে পারি না।

ওই গোবদা জোকারটা এবার আমাকে নিয়ে পড়ে, ঐ পেল্লায় সাইকেলে আমাকে চাপাবেই, আমিও ওর হাত এড়িয়ে লুকোচুরি খেলছি। শুয়েও পড়ছি কখনো আর দর্শকরা হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে। গোবদা লোকটা এবার তেড়ে আসে। লাথি কষাবার আগেই সামনে একটা সাইকেল দেখে দুকদম সেটাকে নিয়ে এরিনার মধ্যে দৌড়ে একলাফে সেটার ওপর চড়ে বসে ফুলস্পীডে নিপুণ খেলোয়াড়ের মতো এরিনায় একটা চক্কর দিয়ে আমি বের হয়ে যেতেই সারা তাঁবু হাততালির শব্দে ফেটে পড়ে। কে যেন সিটি বাজাতে থাকে।

গোবদা লোকটা তখন ন্যাড়াকে নিয়ে পড়েছে। একটার পর একটা খেলা চলছে। গোবদা লোকটা এবার তাক পেয়ে হাতির খেলার সময় আমাকে একটা লাথি কষিয়েছে আবার। হাতিটা ফুটবল খেলছে। ঐ এক নম্বর জোকারও যেন ফুটবল মনে করে আমাকে—।

দর্শকরা খুশিতে হৈ চৈ করে ওঠে। ওরা হাসছে। লাথি খেয়ে ছিটকে পড়ে আমিও দাঁত বের করে বোকার মতো হাসছি। মনে মনে রাগটা জমে উঠছে। কিন্তু পালাবার পথ নেই। এরিনার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে বড়সাহেব। লোকটা দেখছে আমাকে।

এবার বাঘের খাঁচা দুটো আনা হয়েছে। বেশ জমাটি এদের বাঘের খেলা। বড়সাহেব গোমড়া মুখ করে বলে,—গো দেয়ার।

বাঘের মুখে যেতে হবে! —আঁতকে উঠি। বাঘ তো আর জোকার মানবে না। তাছাড়া বাঘটা আগে থেকেই আমাদের ওপর নজর রেখেছে। কিন্তু সে কথা কে শোনে!

বড়সাহেব গর্জে ওঠে—গো। শো সাম ফান দেয়ার।

অর্থাৎ বাঘের সঙ্গেও মশকরা করতে হবে। এক নম্বর জোকার আচমকা দুম করে একটা লাথি মারতে আমি এরিনাতে এসে পৌঁছে গেলাম। রাগে জ্বলছে সারা শরীর। এর শোধ এবার নিতেই হবে।

রিংমাস্টার হান্টার হাতে মেডেল-গাঁথা জামা পরে যাত্রাদলের রাজার মতো ঢুকেছে। আমি আবার বাঘ-টাঘ খুব ভয় করি। সামনে বের করবে বাঘটাকে। আমি এসে তাঁবুর পোলের কাছে পজিশন নিয়েছি। নারকেলগাছে চড়া অভ্যাস আছে। বেগতিক দেখলে চড়চড় করে উঠে যাব ওপরে।

ওদিকে খাঁচার ভেতরে বাঘটা গর্‌র্‌ শব্দ তুলে জিভটা দিয়ে ঠোঁট চাটছে। ওকে বের করবে এবার।

সেই মোটা জোকার এবার তাক বুঝে আমার দিকে এগিয়ে আসে। ওখান থেকে সরিয়ে বাঘের মুখেই নিয়ে যাবে আমায়। তৈরি ছিলাম। ও লাথি কষাবার আগেই ওর হাঁটুতে একটা ঠোক্কর লাগতে লোকটা গিয়ে ছিটকে পড়ল একেবারে খাঁচার কাছে। আর বাঘটাও হঠাৎ সামনে অমনি মাংসল একটা বস্তুকে গড়াগড়ি খেতে দেখে মনের আনন্দে গর্জন করে ওঠে—হুম্‌-ম্‌!

Table of Contents

আমি ঐ গর্জনের ধাক্কায় তরতর করে তাঁবুর খুঁটি বেয়ে উপরে উঠছি। নিচে তখন সেই গোলমতো জোকারটা প্রাণভয়ে কুমড়োর মতো গড়াচ্ছে আর চিৎকার করছে। বাঘটাও গর্জন করে লেজ নাড়ছে, যেন লাফিয়ে পড়বে ঐ লোকটার ওপর। রিংমাস্টারও ঘাবড়ে গেছে।

কলরব আর্তনাদ ওঠে। তাঁবুতে হৈ চৈ শুরু হয়। বাঘ খোলা পেয়ে লাফ দিয়েছে যেন কার ওপর। যে যেদিকে পারছে দৌড়োচ্ছে। গ্যালারি থেকে ছিটকে পড়ছে লোকজন। সারা তাঁবুতে আর্তনাদ ওঠে।

আমিও প্রাণপণে ঠেলে উঠছি তাঁবুর পোল দিয়ে। ট্রাপিজের খেলোয়াড়দের বাঁচাবার জন্য নিচের এ পোল থেকে ও মাথা অবধি লম্বা জাল টাঙানো। তারই একপ্রান্তের দড়িটা এদিকের পোলে জড়ানো। সেই দড়িটা আমার পায়ে লেগে কী করে খুলে যেতেই ঢাউস লম্বা জালখানা একেবারে এরিনার উপরেই পড়েছে। আর পড়বি তো পড় সেই খোলামেলায় দাঁড়ানো বাঘটার ওপরই। বাঘটা আচমকা বন্দী হয়ে যত দাপাচ্ছে ততই আষ্টেপৃষ্ঠে জড়াচ্ছে জালে।

ততক্ষণে জোকার বাবাজি ঝেড়ে ঝুড়ে উঠে দৌড়। আমিও লণ্ডভণ্ড কাণ্ডের মধ্যে 'জয় মা' বলে পোল থেকে ওই বিচিত্র পোশাকে লাফ দিয়ে পড়ে সোজা তাঁবুর বাইরে এসে টুপিটা খুলে ফেলে অন্ধকার মাঠের দিকেই দৌড়োলাম।

ততক্ষণে সারা মেলায় তুলকালাম কাণ্ড বেধে গেছে। বাঘ নাকি ছাড়া পেয়ে গোটা কয়েক মানুষকে খেয়ে ফেলেছে। যাত্রার আসরে জরির পোশাক পরা রাজপুত্র আর বদমাইস মন্ত্রীর মধ্যে তখন তুমুল অসিযুদ্ধ চলছিল। ওরাও এই সংবাদে অসিযুদ্ধ তখনকার মতো মুলতুবী রেখে ঐ টিনের তলোয়ার হাতে পৈত্রিক প্রাণ নিয়ে দৌড়েছে। ফ্লুট কর্নেটওয়ালারাও যন্ত্র বগলে দিয়ে পগার পার। দর্শকরা আর মেলার জনতা কেউ বাঁশ কেউ মিষ্টির দোকানের হাতা-খুন্তি হাতিয়ার করে দৌড়োচ্ছে।

আমার দেহে তখন মত্ত মাতঙ্গের বল। ভীমবেগে দৌড়চ্ছি। ন্যাড়াও এসে জুটেছে। তার পরনে জোকারের সেই ডোরাকাটা বিচিত্র পোশাক। মাঠ-পগার টপকে পালাচ্ছি, আশপাশেও দৌড়োচ্ছে অনেকে।

হঠাৎ একটা জলার ধারে এসে ন্যাড়া কী করে যেন ছিটকে পড়ে একেবারে জলে। কে যেন চিৎকার করে ওঠে—বাঘ রে! এই যে জলে।

ন্যাড়ার ডোরাকাটা পোশাকটা অন্ধকারে বাঘের গায়ের রং ধরেছে।

ধুপ ধাপ ধপাস! জলেই পড়ছে লাঠি বাঁশের বাড়ি। লোকজন ঘেরাও করে ফেলেছে জলবন্দী কাদামাখা ন্যাড়াকে। দু-এক ঘা বাঁশের বাড়ি ওর পিঠেও পড়েছে।

ন্যাড়া আর্তনাদ করে—মেরো না, আমি বাঘ নই, ন্যাড়া! বাজারপাড়ার মিত্তিরবাড়ির ন্যাড়া গো!

তখনও জলে-কাদায় বাঁশবাজি চলেছে। ন্যাড়াও ককিয়ে চলেছে। আমি এই অবকাশে ওদের ছাড়িয়ে দৌড়েছি। নির্জন অন্ধকার মাঠ। বেশ কিছুক্ষণ দৌড়োবার পর একটা অর্জুন গাছের নিচে হিম ভেজা ঘাসের ওপর বসে পড়ি। হাপরের মতো হাঁপাচ্ছি ফোঁসফোঁস করে।

একটু জিরিয়ে জলার জলে হাত-মুখ ধুয়ে সেই রং তুলে আবার গ্রামের দিকে ফিরছি।

Table of Contents

তখন সার্কাসের মাইকে ঘোষণা চলছে ঃ আমাদের বাঘের খেলা শুরু হচ্ছে। আপনারা শান্ত হয়ে যে যার স্থান গ্রহণ করুন। আমাদের খেলা শুরু করছি।

মেলায় আবার আলো জ্বলছে। যাত্রাদলের ঢোলকর্নেট বাজছে। সার্কাসের বাজনা ওঠে।

আমি আর ওদিকে নেই। পরাজিত সৈনিকের মতো ছত্রভঙ্গ অবস্থায় বাড়ির বাইরের ঘরে এসে আশ্রয় নিলাম।

পরদিন সারা গ্রামে হৈ চৈ-এর জের চলে। আমাদের রকের আড্ডার ভূষণ বলে, কাল দারুণ খেলা জমেছিল। একজন নতুন জোকার যা করছিল না, ফ্যানটাস্টিক! আরে সে-ই তো এতবড় বিপদ থেকে বাঁচালো বুদ্ধি করে। না হলে বাঘটা দু-চারজনকে খতম করে দিত।

নবনী ধর বিজ্ঞের মত বলে, সার্কাসের ভেটারান প্লেয়াররাই তো জোকার হয়। ঐ জোকারটা জালখানা কায়দা করে না ফেলে দিলে বাঘ যে কী করত কে জানে!

আমি একটু নিশ্চিন্ত হই। তাহলে আসল খবরটা ওরা জানে না। অবশ্য মুখে চোখে চুন-কালি মাখিয়ে যা ভূত সাজিয়েছিল তাতে দূর থেকে চেনারও উপায় ছিল না।

ন্যাড়ার কাছে নগদ দশটা টাকাই রয়ে গেছে। অবশ্য তার ব্যান্ড বাজিয়ে কাচা প্যান্ট-জামার যা হাল হয়েছে সেগুলো কাচতে আবার ব্যান্ড বাজাতে হবে। আর জুতোগুলো মাঠে, না মেলায় কোথায় পড়ে আছে কে জানে!

শুনলাম, ন্যাড়ার নাকি কাল দোতলা থেকে পড়ে গিয়ে হাত-পা ছড়েছে; আর একটা ঠ্যাঙ মচকে ঘায়েল হয়ে বিছানায় পড়ে আছে পট্টি বেঁধে।

আমি আর ওর খবর নিতে যাই নি।

Table of Contents

কুকুরের কামড়

হিমানীশ স্বামী

গোবিন্দ হালদারের ছেলে কৃষ্ণময় এখন বাড়ির কর্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে বলা যায়। বয়স তার সবে সাড়ে তিন পেরিয়েছে, এরই মধ্যে সে বাড়ির উপর নানা হুকুম খাটাচ্ছে। দু'মাস আগে সে রাত বারোটার সময় জেগে উঠে আমার নাম কেন কৃষ্ণময়, আমার নাম কেন কৃষ্ণময় বলে চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করেছিল। সে বলেছিল এ নামটা বিচ্ছিরি! তা ছাড়া কেউ কি তাকে কৃষ্ণময় বলেই ডাকে? তাও না—সবাই বলে কেষ্ট! এই নিয়ে সে আগেও আপত্তি জানিয়েছে, কিন্তু কেউ বিশেষ পাত্তা দেয়নি, শেষ পর্যন্ত সে এই কৌশলই বার করেছিল। রাত বারোটার সময় কেবল সে নিজে জেগে উঠেছিল তা নয়, প্রথমে বাড়ির, পরে পাড়ার লোক পর্যন্ত জেগে উঠেছিল তার ষাঁড়ের মতো চিৎকারে। গোবিন্দ হালদার তো অবাক। এতো রাত্রে উঠে কেউ নিজের নাম নিয়ে আপত্তি করে নাকি?

গোবিন্দ হালদার তাঁর বাপের জন্মে এমন কাণ্ড দেখেন নি, শোনেনও নি। তা আপত্তি করে করুক, আস্তে আস্তে কর না কেন বাপু, তা নয় এমন বিদিকিচ্ছিরি চিৎকার! উঃ পাড়ার লোকেদেরও ঘুম ভাঙিয়ে দিল, কি লজ্জার কথা।

গোবিন্দ হালদার ভাবলেন, এবারে একটু শক্ত কিছু করা দরকার। এরকম আহ্লাদ দিলে ছেলে মাথায় উঠবে! উঠবে আর না। মাথায় উঠেছে। এর একমাত্র ওষুধ হল ওর

Table of Contents

মাথার চুল এক গোছা বাঁ হাত দিয়ে ধরে ডান হাত দিয়ে গালে একটা থাপ্পড় মারা। এক থাপ্পড়ে নাহলে তিন, এইভাবে যতক্ষণ না তার এই রকম চিল্লানি বন্ধ হয়। কিন্তু পারেন না। মারতে গিয়েও পারেন না। ওদিকে দাঁড়িয়ে আছেন স্ত্রী নারায়ণী। ওর কাতর মুখের দিকে তাকিয়ে বদ সন্তানকে তিনি মারতে পারেন না। নারায়ণী মানুষটি বড় ভাল। কিন্তু কৃষ্ণময়কে মানুষ করার জন্য যা দরকার তা তিনি কিছুতেই সমর্থন করেন না। একবার কৃষ্ণময় বিস্কুটের টিন খুলে গুনে গুনে দেড় কেজি বিস্কুট কাককে খাইয়েছিল। বিলেত থেকে আনা স্পেশাল বিস্কুট, গোবিন্দ হালদারের ভাই রাধেশ্যাম নিয়ে এসেছিল লন্ডন থেকে।

তা সেবার গোবিন্দ হালদার কৃষ্ণময়কে বেশি কিছু নয় দুটি কান মলে একটু একটু লাল করে দিয়েছিলেন। চমৎকার রং ধরেছিল কানের লতিতে। কিন্তু তা হলে কি হবে, কৃষ্ণময় তাতেই আপত্তি জানিয়ে গোবিন্দ হালদারের ডান পায়ের গোছায় এমন কামড়ে দিয়েছিল যে তিনি তিন দিন অফিসেই যেতে পারেন নি। আর কেবল কি পায়ে কামড়! পায়ে কামড়ের পর সে এমন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কেঁদেছিল যে মনে হতে পারত কোথাও যেন সাইরেন বাজছে! পাড়ার দু-দশ জন লোকও ছুটে এসেছিল এবং গোবিন্দ হালদারকে বলেছিল,—আপনি কি পশু? এইটুকু দুধের ছেলেকে কেউ চোরের মতো মারে? আর একজন বলেছিল,—ছেলেরা একটু আধটু দুষ্টুমি করবে না? তাই বলে গায়ে হাত তোলা?

কিন্তু ছেলেটি যে তার সদ্য ওঠা দাঁত দিয়ে তাঁর পায়ের অবস্থা দফা-রফা করে দিয়েছে, রক্তে ভেসে যাচ্ছে সব, তা পাড়ার লোকেরা বিশ্বাসই করলেন না। এক মহিলা অন্য একজনকে বললেন,—দেখো দেখো কি আক্কেল ওঁর—কোথায় নিজেই পড়ে গিয়ে পা কেটে গেছে আর তা কিনা ছেলের নামে চালানো হচ্ছে! কি বিটকেলে লোকরে বাবা!

শুনে তাঁর সঙ্গিনী বললেন,—ঐ টুকুন ছেলের দাঁতের জোরই বা কতটুকু হবে, ওরা মাংস সেদ্ধ করে নরম করে দিলে তবে খায়, আর সে খেতে যাবে কাঁচা নরমাংস?

গোবিন্দ হালদার কথাগুলো শোনেন ঠিকই, কিন্তু রাগে ফুঁসছেন বলে উত্তর দেন না। কি বলতে গিয়ে কি বলবেন শেষে আরও নানারকম কাণ্ড হবে ভেবে তিনি চুপ করে রইলেন। আবার কে যেন বললেন,—দেবশিশু! তা কয়েকটা বিস্কুট সে কাকেদের খাইয়েছে তাতে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে। তোমরাই বল? অন্য আর একজন প্রতিবেশী আবার বললেন,—ও-সব বাজে কথা। কাককে বিস্কুট খাইয়েছে না হাতি। বোধহয় বাড়িতে খেতে টেতে দেয় না বাচ্চাটাকে তাই বোধহয় একটা দুটো বিস্কুট খেতে গিয়েছিল তাতেই এই। এমন নিষ্ঠুর বাবা এ দুনিয়ায় মেলে না।

এ-সব শুনেও আর প্রতিবাদ করেন না গোবিন্দ হালদার। প্রতিবাদ করে লাভ নেই। তিনি ঘরে ঢুকে প্রথমে তুলোয় স্পিরিট ভিজিয়ে পায়ের গোছাটায় লাগালেন, উঃ এক সেকেন্ডের মধ্যে জায়গাটা যেন দুটো গনগনে উনুনের মতো জ্বলতে লাগল। তারপর একটু মলম লাগিয়ে তারপর তুলো দিয়ে বাঁধলেন একটা ব্যান্ডেজ। কী ব্যথা, কী ব্যথা! তিনি যেন আর দাঁড়াতে পারেন না। তবু কষ্টে ছিষ্টে দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর প্রতিবেশীরা একে একে নানারকম উপদেশ এবং আদেশ দিতে দিতে প্রস্থান করার পর তাঁর মনে হল জ্বরে যেন হাত পা অবশ হয়ে আসছে। অবশ হয়ে আসছে, আবার রাগে তাঁর শরীরও জ্বলছে। এমন রাগ তাঁর এর আগে কখনও হয়নি। দেবশিশু! ওকে গলা টিপে মেরে ফেলার কথাই তাঁর প্রথমে মনে হল। কিন্তু রাগ চেপেই রাখতে হল। এ-দিকে তাঁর স্ত্রীকেও মনের কথা

Table of Contents

খুলে বলতে পারেন না। মাঝে মাঝে যে কানমলা বেশ প্রয়োজনীয়, বিশেষ করে ছোটবয়সে, সেটার অকাট্য প্রমাণ তিনি নিজে! ছেলেবেলায় তিনি কি কম পিটুনি খেয়েছেন? আর কানমলা? সে তো দিনে দু'চারবার হতই। ঐ পিটুনি আর কানমলার ফলেই না তাঁর আজ এই উন্নতি! কত বড় কোম্পানিতে কাজ করেন। অফিস থেকে গাড়ি নিতে আসে, আবার কাজের পর ফিরিয়েও দিয়ে যায়।

গোবিন্দ হালদার বিমর্ষ হয়ে পড়েন। কিন্তু ঐ ঘটনাটাই তো আর শুরু নয়, শেষও নয়। এর আগেও কৃষ্ণময় নানাভাবে অত্যাচার করেছে। এখনও করে চলেছে। পাতলা দুধ খাব না বলে একবার আব্দার ধরেছিল, তখন ঘন দুধ করে দেওয়া শুরু হল, কিছুদিন পর বললো,—না এত ঘন দুধ খাব না। যখন সবচেয়ে মনের মতো করে দুধ দেওয়া হল, তখন বলতে শুরু করল, এ দুধ বড্ড মিষ্টি। চার চামচ চিনির বদলে এক চামচ করে দেওয়া হল, তবু তার মিষ্টি বেশি লাগে, দুধ ঢেলে ফেলে দেয়। শেষে দুধে চিনি একেবারেই দেওয়া বন্ধ করা হল, তখন আবার আব্দার ধরলো এর মধ্যে গুড় দিতে হবে। মানে, এ এক মহা ঝামেলার ব্যাপার।

আর একদিকে কৃষ্ণময়ের মা নারায়ণী ছেলের কোনও দোষ দেখতে পান না। তিনি বলেন, আহা একটু গুড় চেয়েছে ছেলে তাও দিতে পার না? গোবিন্দ হালদার অবশ্য গুড় কিনতে চান না, তাঁর ইচ্ছে লগুড়ের ব্যবস্থা করেন, দু-খানা লগুড় কৃষ্ণময়ের পিঠে ভাঙেন। কিন্তু তা আর করা হয় না। গুড় গুড় করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে দোকান থেকে দশ কেজি গুড়ই কিনে আনেন রাগ করে। এনে নারায়ণীর সামনে গুড় রেখে বলেন,—খাওয়াও তোমার দেবশিশুকে।

ঐ অতখানি গুড় দেখে নারায়ণী রেগে কাঁই হলেন। বললেন,—তোমার কি রকম আক্কেল, ঐটুকুন ছেলে একটুখানি গুড় খেতে চেয়েছে তা তুমি নিয়ে এলে গুড়ের গন্ধমাদন।

গোবিন্দ হালদার ঠাণ্ডা মাথায় বেশ মিষ্টি মিষ্টি করে বললেন,—খাক না কেষ্ট গুড়, একটু বেশি খাক, ওর জ্বালায় তো পুড়ে খাক্ হয়ে গেলাম. এই খেয়ে যদি ওর স্বভাবটা মিষ্টি হয় তো ক্ষতি কি?

কিন্তু কৃষ্ণময় সত্যি সত্যি যে ঐ প্রচণ্ড গুড় তিন সপ্তাহে শেষ করে দেবে, খেয়ে সুস্থ থাকবে এবং তারপর আবার গুড়ের জন্য বায়না ধরবে সেটা কিন্তু সত্যি ভাবা যায়নি। গোবিন্দ হালদার তো অবাকই, নারায়ণী পর্যন্ত অবাক। এত গুড় খেয়ে শেষে কেলেংকারী কাণ্ড না বাধায় শেষটায়। গোবিন্দ হালদার বলেন,—কেলেংকারী—বোধহয় ভারতে যত গুড় তৈরি হয়, তা ওই খেয়ে শেষ করবে, এবং আমদানিও করতে হতে পারে আমেরিকা থেকে।

—আমেরিকা থেকে? নারায়ণী প্রশ্ন করেন, আমেরিকায় কি গুড় তৈরি হয় নাকি?

গোবিন্দ হালদার বিরক্তির সঙ্গে বলেন,—কে জানে বাবা। তবে স্পেশাল অর্ডার দিলে ওরা করতে না পারে এমন কিছু নেই। কিন্তু গুরুতর প্রশ্ন হল অত টাকা আমি পাব কোথায়? প্রতি তিন সপ্তাহে যদি দশ কেজি গুড় এইটুকু একটা ছেলে সাবাড় করতে পারে তাহলে গুড়ের কেজি সাত টাকা হলে এক বছরে তাঁর কত খরচ হতে পারে এমন একটা হিসেব মনে মনে করতে গিয়ে পারলেন না, শেষে কাগজ কলম নিয়ে বসতে হল। হিসেব কষে তার ফল দেখে চমকিত হলেন। গুড়ের অংক ফল তাঁর কাছে তেতো তেতো মনে হতে লাগল। মনের মধ্যে একটা আতঙ্ক গুড়-গুড় করতে লাগল।

Table of Contents

কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার দেখা গেল। আরও পাঁচ ছ-দিন গুড় খাওয়ার পর হঠাৎ একদিন কৃষ্ণময়ের গুড়ে আর রুচি নেই। যখনি তাকে দুধ আর গুড় দেওয়া হয় সে বলে, না—ভাল লাগে না। গুড় খাওয়া সে ছেড়ে দিল। নারায়ণী বললেন,—দেখেছ, ও নিজেই বুঝতে পেরেছে এটা ঠিক নয়। এটাই হল শিশু-মনস্তত্ত্বের একটা দিক। তাকে যদি তুমি ধমক দিয়ে রাখতে, গুড় খেতে না দিতে তাহলে ওর গুড় খাওয়া এত বেড়ে যেত যে বোধ হয় সত্যি সত্যি বিদেশ থেকে গুড় করতে আমদানি হত। এই হচ্ছে আধুনিক কায়দা। শিশু যা করতে চায় তাতে বাধা দিও না; ওরা নিজেরাই বুঝতে পারবে তাদের ভুল।

এইরকম চলছে। এইভাবে একদিন দেখা গেল কৃষ্ণময় অভিভাবক হয়ে পড়েছে। সে যা বলে বাবা-মা তাই শোনে। সে এক ব্যাপার। একদিন পুরনো খবরের কাগজ—তা প্রায় ত্রিশ কেজি হবে, ছিঁড়তে শুরু করল। এক দিনেই প্রায় পাঁচ কেজি খানেক কাগজ নষ্ট করল। গোবিন্দ হালদার রাগে ফুঁসতে লাগলেন, কিন্তু বাধা দিলেন না। কে জানে বাধা দিলে যদি জামা-কাপড় ছিঁড়বার আবদার ধরে? তার চাইতে যাক কমের উপর দিয়ে। কয়েক দিনে ত্রিশ কেজি কাগজ ছিঁড়ে সে এক কাণ্ড। জমাদারকে ডেকে সেগুলোকে ফেলে দিতে হল। রোজ বকশিসও দিতে হত কিছু কিছু।

ঐটুকু তো ছেলে, আর তার নিত্যি নতুন বায়না আর আবদারের শেষ নেই। গোবিন্দ হালদার ভাবেন, ছেলেটা পাগল হয়ে যাবে না তো। গেল ঐ অবস্থা, অর্থাৎ প্রথমেই বলেছি রাত বারোটার সময় কৃষ্ণময় চিল্লাতে শুরু করল, আমার নাম কেন কৃষ্ণময়—এ নামটা বিচ্ছিরি। তবে তোমার কোন্ নামটা ভালো লাগে সোনা? —নারায়ণী প্রশ্ন করেছিলেন।

আমার নাম হবে আদা! আমি আদা! —কৃষ্ণময় চিৎকার করতে লাগল। আমার পুরো নাম আদালত, আমার ডাক-নাম আদা! আর ডাক-নামই আসল নাম!

আদার মতই ঝাঁঝ তার কথায়।

শেষ পর্যন্ত গৃহশান্তি বজায় রাখার জন্য স্বীকার করতেই হল। কৃষ্ণময়ের নাম হল আদা!

কিন্তু সে রাত্রিতে অতঃপর তার ঘুম এল ঠিকই, কিন্তু দিন দশেক পরে হঠাৎ সে আবদার ধরলো একটা অদ্ভুত জিনিস খাবার।

—কুকুরের কামড়। সে আবদার ধরেছে কুকুরের কামড় খাবে।

কি সর্বনাশ! খাবার কত জিনিস থাকতে শেষ পর্যন্ত কুকুরের কামড়। গোবিন্দ হালদার তো মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। দু-তিনটে বাড়ির পরে তাঁর ভাই রাধেশ্যামকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, বড় বিপদে পড়েছি রে রাধে, বড় বিপদে পড়েছি। একে কুকুরের কামড় তো আর সত্যি সত্যি খাওয়ানো যাবে না। কি করা যায় বল্ দেখি?

রাধেশ্যামও কথাটা শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। তারপর বললেন,—দেখি আমি কি করতে পারি। কেস্‌টা বড়ই ঘোরালো করে ফেলেছ দাদা। প্রথম দিকেই যদি ওকে কানটান মলে, দু-পাঁচটা চাঁটি দিয়ে শুরু করা যেত তাহলে এতদিনে শায়েস্তা হয়ে যেত ঠিকই। কিন্তু এখন বেশ দেরিই হয়ে গেছে মনে হয়। মানে, এখন কানমলা আর চাঁটিতে হবে না, এখন বেত দিয়ে সপাং সপাং করে... মনে আছে দাদা, বাবা আমাদের একদিন কিরকম ধোলাই দিয়েছিলেন বেত দিয়ে?

আহা! —গোবিন্দ হালদার বললেন ঃ সে বড় সুখের সময় ছিল। চমৎকার দিন ছিল। তোর মনে পড়ে আমাদের একটা ঘরে আটকে রেখেছিলেন বাবা বারো ঘণ্টা, নির্জলা

Table of Contents

অবস্থায়? উঃ এখন ভাবতেও যেন শিহরণ লাগে! কিন্তু যুগ বদলে গেছে রে, দেখতে দেখতে যুগ বদলে গেল। আগে বাড়িতে আমরা টু শব্দটি করতে পারতাম না। এটা চাই ওটা চাই করতাম ঠিকই, কিন্তু পেতাম কি? বছরে এক জোড়া জুতো। তাও বড় হয়ে। আর ছোটবেলায় তো খালি পায়েই বেশির ভাগ থাকতে হতো আর কৃষ্ণময়ের এই সাড়ে তিন বছর হয়েছে, ভাবতে পারিস, এগারো জোড়া জুতো। আমরা রোজ দুধ-আম চিঁড়ে খেতাম গরমকালে, দিনের পর দিন, দিনের পর দিন, কিন্তু এখন—উঃ কতরকম যে খাদ্য আজকালকার ছেলেমেয়েরা খাচ্ছে!

রাধেশ্যাম বললেন,—আমি বলি কি দাদা, তোমার ঐ কেষ্টকে একদিন বেশ একটু ঠ্যাঙানি দাও, ঠ্যাঙানি দিয়ে গায়ে ব্যথা করে দাও। ব্যস্। ওর কুকুরের কামড় খাওয়ার ইচ্ছে চিরতরে চলে যাবে। কুকুরের কামড়, আর খাওয়ার জিনিসের নাম পেল না।

না, ওকে ঠ্যাঙানি খাওয়াতে পারবে না! —কখন যে নারায়ণী কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন বুঝতে পারেননি ওরা। গোবিন্দ হালদার বললেন,—না মানে আমরা এমনি কথা বলছিলাম, এই একটু কথার-কথা!

কথার-কথা! —নারায়ণী ধমকই দিয়ে উঠলেন প্রায়! কথার কথা! তা অমন কথা বলাও তো অন্যায়। ছেলে একটু আবদার ধরেছে তাতে তোমাদের আপত্তিটা কোথায়?

বৌদি! —রাধেশ্যাম বলেছেন ঃ আপনি কি বলছেন জানেন? কুকুরে কামড়ালে কি হয় জানেন?

নারায়ণী বললেন,—দেখো রাধে ঠাকুরপো, তুমি ভাবো আমি কিছু জানি না, তা যদি ভেবে থাকো তাহলে ভুল করেছ খুবই, এটা জেনে রেখো। জলাতঙ্ক রোগে ভুগছে এমন কুকুর কামড়ালে তবেই জলাতঙ্ক হয়। আদাকে যে কুকুরে কামড়াবে তাকে ভালভাবে ডাক্তারি পরীক্ষা করাতে হবে আগে, এটুকু আমরা বুঝি।

না। —রাধেশ্যাম বলেছেন ঃ না বৌদি, ও-সব রিস্ক নেওয়ার দরকার নেই। সত্যি কথা কি জানেন, আপনারা কেষ্টর মাথাটি খেয়ে রেখেছেন ওর আবদারগুলোকে প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে। এখন থেকে একটু টাইট দেওয়া দরকার, নইলে ভেবে দেখেছেন ভবিষ্যতে কি হবে। হয়ত বলবে বাড়িতে আগুন দেবে, আর আপনি বলবেন, আহা, বেচারা বাড়িতে একটু আগুন দিতে চাইছে দিন না।

তুমি ইয়ার্কি করো না রাধে ঠাকুরপো! —নারায়ণী বললেন। তোমরা ছোটবেলায় মার খেয়েছ বাবা-মায়ের কাছ থেকে তাই তোমাদের ধারণা হয়েছে ওটাই বুঝি মানুষ হবার শ্রেষ্ঠ উপায়! কিন্তু যুগ বদলে গেছে, বুঝলে রাধে, যুগ বদলে গেছে। এখন যত তাড়াতাড়ি পারো একটা ভাল দেখে ভদ্র দেখে ছোট নীরোগ কুকুর যোগাড় করতে হবে।

আজ্ঞে দাঁত থাকবে তো কুকুরের? —রাধেশ্যাম জিজ্ঞেস করল। তার মুখ দেখে অবশ্য মনে হল না সে ইয়ার্কি করছে।

অ্যাঁ, দাঁত! —নারায়ণী ভাবলেন ঃ দাঁত ছাড়া কুকুর কি পাওয়া যায় নাকি? তা ছাড়া দাঁত ছাড়া কামড়াবেই বা কেমন করে? তবে কুকুরটা যেন ভয়ঙ্কর গোছের না হয়। ছোট জাতের কুকুর আনলেই হবে।

ছোট জাতের কুকুর কামড়াবে কেষ্টকে? —গোবিন্দ হালদার প্রশ্ন করলেন ঃ ছোট জাতের কুকুর?

নারায়ণী বললেন,—আঃ কথাটা বুঝলে না, ছোট জাতের কেন হবে, আসলে বলতে

Table of Contents

চেয়েছিলাম ছোট আকারের। যেমন ধরো গিয়ে ডাশুণ্ড, কিংবা চি হুয়া হুয়া! মানে যাদের চেহারা ছোট, তার মানে দাঁতও ছোট! পিকিনিজ হলেও চলবে।

রাধেশ্যাম বললেন,—কিন্তু কেষ্টর কি পছন্দ তা তো জানতে হবে। নারায়ণীর হঠাৎ খেয়াল হল কৃষ্ণময়ের নাম পালটে গেছে। এখন তার পুরো নাম আদালত, ডাক নাম আদা। তিনি এদিক-ওদিক চেয়ে দেখলেন আদা শুনতে পেয়েছে কিনা। তিনি বললেন, ছেলেটির নাম এখন আদালত সেটা আমাদের মনে রাখা দরকার। ও যদি শুনতে পায় ওকে পুরনো নামেই ডাকা হচ্ছে তা হলে সে ভারি ঝামেলা হবে।

গোবিন্দ হালদারের দাঁত কড়মড় করে উঠল। রাধেশ্যামও বুঝতে পারল তার দাদার দুঃখটা। কিন্তু মেনে নিতেই হবে সব। যুগ বদলে গেছে যে। আহা, গোবিন্দ হালদার ভাবলেন,—তাঁরা যখন ছোট ছিলেন তখন কেবলি বড়দের কথা শুনে চলতে হয়েছে, আর এখন উলটো ব্যাপার—এখন তাঁরা বড় হয়েছেন, কোথায় ছোটদের শাসন করবেন তা নয়, শাসন মেনে চলতে হচ্ছে ছোটদের!

এমন সময় ঘরের ভেতর থেকে চিৎকার। আমার কুকুরের কামড়ের খিদে পেয়েছে। —এঁ এঁ এঁ!

নারায়ণী ভেতরে চলে গেলেন। তিনি বললেন,—তোমার কী রকম কুকুর চাই সোনা। ছোট বিলিতি কুকুরই ভাল। তা আমাদের পাড়ার তো চেনা কারুর বিলিতি কুকুর নেই। সুবীরবাবুর আছে বটে, কিন্তু সেটা ভারি বড়। তার উপর বোধহয় দাঁত টাতও মাজে না রোজ। একটা কামড় দিলে সে সাংঘাতিক কাণ্ড হবে। তা কুকুর খুঁজতে দেরি হবে কিছু। ভাল কুকুর খুঁজতে হবে তো? তোর জন্যে সবচেয়ে ভাল কুকুর আনতে হবে, আবার সবচেয়ে ছোট হতে হবে।

না। আমি এখুনি কামড় খেতে চাই। —আদা চেঁচিয়ে উঠল।

এ তো মহা মুশকিল হল। নারায়ণী বললেন,—আচ্ছা সোনা, কুকুর যদি না হয়ে আমি হই, মানে আমি যদি কামড়াই তাহলে হবে?

আদা ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলে উঠল,—না-না! অ্যাঁ অ্যাঁ আমি কুকুরের কামড় খাব। আজই খাব!

তার চাইতে চলো তোমাকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাই আজ। কত রকম জানোয়ার সেখানে, বাপ্‌রে! একটা সাদা ভালুক এসেছে নাকি, তার উপর এসেছে আফ্রিকার জিরাফ!

না। আমি কুকুরের কামড় খাব। চিড়িয়াখানায় যাব না মোটেই। —আদা বলতে শুরু করল ঃ আজই খাব, এখনই খাব!

যাও এক্ষুনি! —নারায়ণী বললেন গোবিন্দ হালদারকে ঃ খুঁজে আনো একটা ছোট্ট ভাল-মানুষ গোছের কুকুর।

গোবিন্দ হালদার বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু বেরিয়ে কোথায় যাবেন? কোথায় পাবেন মনের মতো কুকুর? একটা ঐরকম কুকুরকে কি কেউ একটা বাচ্চা ছেলেকে কামড়ানোর জন্য ভাড়া দেবে? কেউ কেউ রবিবারে ছোট ছোট চমৎকার চমৎকার কুকুর নিয়ে আসে বিক্রি করতে। তিনি ভাবলেন ঐ রকম একটা কুকুরওলাকে তাঁর বাড়িতে আনবেন। তারপর আদাকে কামড়ানোর পর তাকে গোটা দশেক কি কিছু বেশি টাকা দিয়ে দিলেই হবে। এই ভেবে তিনি হাতিবাগানে গিয়ে দেখেন ব্যাপার বেশ গুরুতর। চারদিকে পুলিশ, এদিকে দুটো পুলিশের গাড়ি। যারা বেআইনি ভাবে বুনো জানোয়ার এবং পাখি বিক্রি করে তাদের বিরুদ্ধে

Table of Contents

অভিযান চলছে। তাঁর কোথাও কুকুর নজরে পড়ল না। কী করেন বুঝতে পারলেন না। শেষে মনে পড়ল তাঁর বন্ধু প্রকাশের গোটা তিনেক কুকুর আছে, স্পিটজ্ জাতের। বেশ হাসিখুশি কুকুর। দাঁতগুলো ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার, আর রোগ-টোগ কিছু নেই।

প্রকাশের বাড়িতে গিয়ে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলার পর প্রকাশের যা মুখ হল তা বেশ দেখবার মতোই! তার মুখে বেশ কিছুটা বিস্ময়, একটু চিন্তা (দুটো ভ্রূ কুঁচকে গিয়েছিল), একটু রাগ (চোখ কট্‌মট্ করছিল!) প্রকাশ অনেকক্ষণ দম নিয়ে বলল,—কী সাংঘাতিক ব্যাপার অ্যাঁ। ছেলেকে আহ্লাদ দিচ্ছ। জানো না এর পরিণাম কি হবে!

গোবিন্দ হালদার বললেন,—বুঝতে পারছ না, আমার ইচ্ছে মোটেই নেই, কেবল গৃহ-শান্তি বজায় রাখার জন্যই আর কি। তা তোমার কুকুর নিয়মিত দাঁত মাজে তো?

না! —একটু কঠোর স্বরেই প্রকাশ বললেন ঃ কুকুরে দাঁত মাজবে কেন? গোবিন্দ হালদার বললেন,—মানে, ছেলেকে কামড়াবে তো, যদি নোংরা দাঁত ঢুকে যায় কচি চামড়ায় সেই জন্যই আর কি!

প্রকাশ বললো,—সে এতে নেই। তার কুকুর পোষার জন্য। বাড়ি পাহারা দেওয়ার জন্য, একটা শিশুকে কামড়ানোর জন্য নয় মোটেই।

ঝাড়া অস্বীকার করলেন তিনি।

শেষে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করাতে পারলেন অবশেষে। একটা ট্যাক্সি ডেকে গোবিন্দ হালদার আর প্রকাশ দুজনে কুকুরটাকে নিয়ে চললেন।

পৌঁছে দেখলেন বাড়িতে বেশ ভিড়। কী ব্যাপার, না, আদাকে কুকুর কামড়াবে সেটা দেখবার জন্য পাড়ার ছেলে বুড়ো, আত্মীয়-স্বজন জমায়েত হয়েছে বেশ। ওঁরা কুকুরকে নিয়ে যাওয়াতে চারদিকে হর্ষধ্বনি হল। সকলেই বেশ খুশি। হঠাৎ নারায়ণী বললেন,—হ্যাঁ গা—কুকুরটার কোনও অসুখ-টসুখ নেই তো?

কে জানে! —বললেন গোবিন্দবাবু। সত্যি কথাই বললেন। কুকুরের অসুখ আছে কি না তিনি জানবেন কেমন করে? বলেই বুঝলেন ব্যাপারটা জটিল হয়ে যেতে পারে। এখন আবার ডাক্তার ইত্যাদিকে ডাকতে হতে পারে। কী দরকার। গোবিন্দবাবু তাড়াতাড়ি ভ্রম-সংশোধন করে বললেন,—মানে দারুণ সুস্থ কুকুর। হার্ট-এর অবস্থা চমৎকার। চোখ খুবই ভাল, এখনও চশমার দরকার হচ্ছে না, আর সাধারণ স্বাস্থ্য অসাধারণ—যা দাও খেয়ে নেবে।

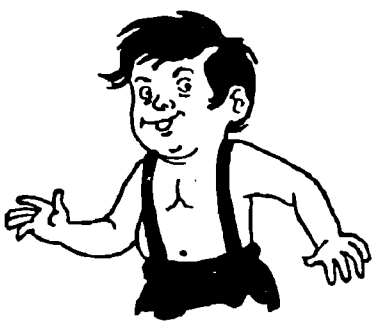

Table of Contents

শকুন্তলার হরিণ

সুশীল জানা

স্টেশনমাস্টার সমাদ্দারবাবু সপরিবারে সিনেমা দেখতে এসেছিলেন। একেবারে কোম্পানির ফ্যামিলি পাশ। অ্যাসিসটেন্ট ডিরেকটার কালু ঘোষ এবং ভোলা মিত্রি খুব আদর আপ্যায়ন করে নিমন্ত্রিত অভ্যাগতদের আসনে সকলকে বসিয়ে দিলেন। কালু ঘোষ বললে,—আপনি এই ছবি তোলায় যে সাহায্য করেছেন—বিশেষ করে আমাকে যে ভাবে বাঁচিয়েছেন, সে আমি জীবনে ভুলবো না স্যার।

কি যে বলেন মশাই! সমাদ্দারবাবু বললেন,—এমন কি করেছি?

সে আমি জানি। —কালু ঘোষ বললে, আপনি না থাকলে সেই বুনো সাঁওতালগুলোর তীর কাঁড়ের সামনে থেকে আমাকে আর রক্ষা পেতে হতো না সেদিন।

খানিক বাদে ছবি শুরু হলো।

প্রথম দিকে রাজা দুষ্মন্তের ছোটাছুটি—আগে রথে, পরে দু'পায়ে। হরিণ দেখা যাচ্ছে না—কিন্তু হরিণকে ধাওয়া করে ছুটেছেন। কোথায় হরিণ! বনের গভীরে হারিয়ে গেল। সেই বনে হারিয়ে গেলেন রাজাও। দিন শেষ হয়ে সন্ধ্যে হলো।

বনের ভেতর দিয়ে চলতে চলতে রাজা এসে পড়লেন এক নদীর ধারে। ছোট্ট নদীটি।

Table of Contents

বাবা-মার মাঝখানে বসে ছবি দেখছিল সমাদ্দারবাবুর ছেলেমেয়ে—টিল্‌টি বিল্‌টি। ছোট্ট নদীটি দেখে চেঁচিয়ে উঠল,—বাবা, হাঁড়িভাঙা... হাঁড়িভাঙা!

সমাদ্দারবাবু থামিয়ে দিয়ে বললেন,—চুপ—চেঁচাসনি। ও হাঁড়িভাঙা কেন হবে—ও হলো মালিনী নদী। দ্যাখ্ না, এবার কণ্বমুনির তপোবন দেখা যাবে।

ছেলে বিল্‌টি বললে,—ইস্, আমি যেন হাঁড়িভাঙা নদীটা জানি না।

মেয়ে টিল্‌টি বললে,—বলে কতবার কাঁচা আম কুড়োতে গেছি ওখানে। ওই তো সেই মস্ত শিমুল গাছটা।

আঃ! —সমাদ্দারবাবু ধমকে উঠলেন,—চুপ করে দেখো।

টিল্‌টি বিল্‌টি চুপ করে গেল।

হাঁড়িভাঙা ওরফে মালিনী নদীর ধারে ধারে চলেছেন রাজা দুষ্মন্ত। বালি চিকচিক করছে শীর্ণকায় নদীর দুপাশে। নানা পাখ-পাখালির জমাট আসর। তাদের নানা কূজনে পাশের বনভূমি মুখরিত। শব্দে দৃশ্যে অপরূপ।

সামনে তপোবন আশ্রম। পরিপাটি সুন্দর একটি কুঁড়ে।

চমৎকার স্থান নির্বাচন। চমৎকার দৃশ্যপট বিখ্যাত শিল্পনির্দেশক চিত্র সেনের।

চিত্র সেনের চোখ আছে। দেখেই গোটা তপোবন দৃশ্যটা মনে গেঁথে গিয়েছিল।

কাছেই ছোট্ট একটি নদী। নদীর কিনারা ঘেঁষে জাঁকালো আমবাগান। মাথার ওপরে আদিগন্ত প্রসারিত নীল আকাশ আর নিচে রাঙামাটির দিশাহারা প্রান্তর। কাছেপিঠে কোথাও লোকালয় নেই—চেঁচামেচি, হৈ হল্লা, মানুষ জনের ভিড় থেকে একেবারে মুক্ত। জায়গা হিসেবে আদর্শ বৈকি। এখানে দিব্যি তপোবন বানানো যায়। ধরো, নদীটি যদি মালিনী হয়, আমবাগানের ঠাণ্ডা ঘন ছায়ায় থাকে কণ্বমুনির তপোবন আশ্রম এবং আশপাশে স্বয়ং শকুন্তলার বিচরণ ক্ষেত্র—মন্দ কি!

স্থান নির্বাচন তখনই হয়ে গিয়েছিল। জায়গাটা খুঁজে বের করেছে আর্ট ডিরেকটার চিত্র সেন। শকুন্তলা ফিল্মের শিল্প নির্দেশক। ডিরেকটার অর্থাৎ কিনা খোদ চিত্র পরিচালক জায়গাটা দেখতে গিয়ে একেবারে বিমোহিত। চিত্র সেনের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলেছিল,—গ্রান্ড। মা... মা... মারভেলাস!

মনে কোনোভাবে একটু উত্তেজনার কারণ ঘটলেই ডিরেকটর গোবিন্দ দত্ত একটু তোৎলে যায়।

কিন্তু টাকা দেনেওয়ালা শেঠজী ছগনলাল—খোদ প্রযোজক—শকুন্তলা ছবির প্রডিউসার? কপাল কুঁচকে বলেছিল,—বহুৎ খরচা পড়ে যাবে গোবিন্‌বাবু। এতগুলান্ আদ্‌মি—ধরুন শকুন্তলা, দুষ্‌মন্ত, অন্‌সূয়া—আউর একঠো ভি কৌন হ্যায়, তারপর আছে আপনার অ্যাসিসটেন্ট, মেক-আপ ম্যান, ক্যামরাম্যান—কুলি কামিন ভি থোড়া লাগবে—সে বহুৎ লট্‌বহর দোত্তবাবু। অত আদমি লিয়ে থাকবেন কোথায়? খানা ভি খেতে হোবে।

চিত্র সেন বলেছিল,—ঘাবড়াবেন না শেঠজী। কাছাকাছি একটা দেহাতি ইসটিশান আছে। তার মাস্টারবাবুকে বলে কয়ে স্টেশনের মুসাফিরখানায় বন্দোবস্ত করে নেবো। এখানে কাজ তো হবে মাত্র একদিন।

বাইরে গিয়ে ছবি তোলা—ফিল্মের ভাষায় "আউটডোর স্যুটিং"—তার ঝামেলা অনেক, খরচ-খরচাও বেশি। ছগনলালজী গাঁইগুঁই করেছিল বটে, কিন্তু ডিরেকটার গোবিন্দ

Table of Contents

দত্ত আবার উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। বলে উঠেছিল,—আপনি ছ... ছ... ছবির ক... ক... কচু বোঝেন। এই জায়গা!... ম্যা ম্যা। ম্যাগিনিফিসেন্ট!... ওয়া... ওয়া... ওয়া

চোখ ঠেলে বেরিয়ে এল, মুখ টক্‌টকে লাল।

চিত্র সেন বললে,—ওয়ান্ডারফুল!

গোবিন্দ দত্ত হাঁফ ছেড়ে বলেছিল,—হ্যাঁ।

আর ঝামেলা না বাড়িয়ে ছগনলালজী রাজি হয়ে গিয়েছিল।

সপ্তাহ খানেক পরে পরে এসে পড়ল গোবিন্দ দত্তের দলবল সন্ধ্যের ট্রেনে। মুসাফিরখানায় মালপত্র গোছগাছ করে চিত্র সেন ছুটল স্টেশনমাস্টারের কাছে। বললে,—এসে পড়েছি স্যার—এবার আপনার সাহায্য চাই।

বিলক্ষণ! —মাস্টারমশাই লোকটি ভাল। সাহায্যের কথা আগেই দিয়েছেন। বললেন, —যথাসাধ্য করবো। বলুন,—কি করতে হবে।

চিত্র সেন বললে,—আমাদের ডিরেকটার কাল সকালের ট্রেনে এসে পড়বেন আর্টিস্টদের নিয়ে। কলকাতার গাড়ি সকালে কটায় পৌঁছুবে মশাই?

—আটটায়।

তার ভেতরে এখানে আমার সব ব্যবস্থা করে ফেলতে হবে। ভোর-ভোর লেগে যেতে হবে কাজে।

—বেশ। আমাকে কি করতে হবে বলুন।

চিত্র সেন বললে,—তপোবন বানাতে হবে, আশ্রমের কুঁড়ে বানাতে হবে। কিছু বাঁশ চাই, খড় চাই।

সব পেয়ে যাবেন সাঁওতাল পাড়ায়! —মাস্টারবাবু বললেন,—আমার বাতিওয়ালাকে সঙ্গে দিয়ে দেবো, সে-ই পাড়া দেখিয়ে দেবে। শেষে আফশোস করে বললেন,—লোভ ছিল —কেমন করে আপনারা ছবি তোলেন এইবার দেখে নেবো। কিন্তু আমার আর হবে মশাই —যখের মতো এই অফিসে জেগে বসে থাকতে হবে।

চিত্র সেন বললে,—তাতে কি। ছবি যখন দেখানো হবে তখন আপনাকে পাশ দেবো। আপনার উপকার ভুলবো না।

বাস্তবিক, ভারি উপকারী মানুষ মাস্টারবাবু। তাঁর ইস্টিশানের বাতিওয়ালাকে দিয়ে সব জোগাড় যন্ত্র করে দিলেন তিনি দূরের এক সাঁওতাল বস্তি থেকে। ভোর-ভোর চিত্র সেন বাঁশ খড় দড়াদড়ি লোকজন নিয়ে চলে গেল আশ্রম রচনায় সেই নদীর ধারে।

আটটার ট্রেনে ডিরেকটার গোবিন্দ দত্ত এসে পড়ল চিত্রাভিনেতাদের নিয়ে। নদীর ধারে সেই আমবাগানের কাছে এসে দেখলে,—তার ওস্তাদ শিল্প নির্দেশক রীতিমতো একটা তপোবন আশ্রম বানিয়ে তারই অপেক্ষায় বসে আছে।

এখান থেকে গোটা তিন-চারেক দৃশ্য মাত্র নেওয়া হবে—যাতে এই নদী, তপোবন এবং আশ্রমের একটা স্বাভাবিকতা সারা ছবির মধ্যে ছড়িয়ে থাকে। আর্ট ডিরেকটার চিত্র সেন তার কোনো ত্রুটি রাখেনি।

গোবিন্দ দত্ত এঁকে বেঁকে দেখে রায় দিলে,—বেশ হয়েছে।

এবার ছবি তোলার দ্বিতীয় দফার কাজ। মেকআপ ম্যান লেগে গেল অভিনেতা অভিনেত্রীর সাজ সজ্জায়। ক্যামেরা ম্যান লেগে গেল ক্যামেরা ঠিক করতে। ডিরেকটারের

Table of Contents

দুজন সহকারী কালু ঘোষ এবং ভোলা মিত্তির শুরু করে দিলে দৌড়ঝাঁপ—টুকিটাকি কোথায় কি দরকার। দেখতে দেখতে মঞ্চসজ্জা সুসম্পূর্ণ।

কিছুক্ষণের মধ্যে আর্টিস্টদের সাজসজ্জাও শেষ হয়ে গেল। জলের কলসী নিয়ে ঘোরাঘুরি করছে অনসূয়া-প্রিয়ংবদা, শকুন্তলার হাতে বিচিত্র ভৃঙ্গার আকার জলের ঝারি, গাছের ছায়ায় অপেক্ষা করছে জটাজুটধারী বিরাট দাড়িগোঁফওয়ালা দস্তুর মতো মহর্ষি কণ্ব। ক্যামেরার মুখ এদিক-ওদিক ঘুরে গোটা তপোবনটার যেন প্রাথমিক একটা তদন্ত করে নিচ্ছে।

যে কটি দৃশ্য এখানে তোলা হবে তার পার্ট বুঝিয়ে দিলে ডিরেকটার আর্টিস্টদের। সকলেই এবার প্রস্তুত।

আগে তোলা হবে শকুন্তলার গাছে জল দেওয়ার দৃশ্য। অনসূয়া-প্রিয়ংবদার কাঁখে কলসী, শকুন্তলার হাতে ঝারি—এগিয়ে গেল আমবাগানের আশ্রম ছায়ায়। ক্যামেরা তাদের তাক করতে লাগল।

এমন সময় হঠাৎ ডিরেকটার গোবিন্দ দত্তের গলা ফেটে পড়ল বজ্রনির্ঘোষে, স্টপ...!

সবাই হতচকিত। ক্যামেরা ম্যান স্তব্ধ।

ওদিকে শকুন্তলা জল ঢালতে শুরু করেছে।

উত্তেজিত গোবিন্দ দত্ত। ফের তোৎলে গেল, আই... আই... আই... সে-এ-এ।...

কাছে ছুটে এল দুই সহকারী কালু এবং ভোলা। শিল্প নির্দেশক চিত্র সেন হতবুদ্ধির মতো শুধোলে, কি হলো দত্তবাবু!

হ... হ... হরিণ কোথায়? —গোবিন্দ চোখ-মুখ লাল করে বললে।

ঠিক। তপোবন আছে, আশ্রম আছে, শকুন্তলা আছে,—মায় কণ্বমুনি পর্যন্ত, আর কিনা হরিণ নেই! যেখান থেকে হোক—হরিণ একটা জোগাড় করতেই হবে।

সহকারী ভোলা কান চুলকোতে লাগল। কালু তার টাকে হাত বুলোতে লাগল। চিত্র সেন বললে,—তাই তো! কথাটা আমার একেবারেই মনে হয়নি। শকুন্তলার হাত থেকে হরিণ ঘাস খাচ্ছে—এমন একটা দৃশ্য আছে না?

আছে বৈ কি। —শান্ত কণ্ঠে গোবিন্দ বললে,—ওটা চাই-ই। রবীন্দ্রনাথ কি বলেছেন? এই তপোবন আশ্রমে হরিণ ও শকুন্তলা অভিন্ন। সেই হরিণকে আমি ইমর্টেল—অমর করে যেতে চাই।

কালু ঘোষ বললে,—কিন্তু হরিণ এখানে পাবেন কোথায়?

ভোলা মিত্তির বললে,—ও অংশটা কেটে বাদ দিন।

আর যায় কোথা! গোবিন্দ আবার উত্তেজিত। চোখ-মুখ লাল করে বলে উঠল,—হোয়াট!... ইম্প... ইম্প... ইম্প...!

ইম্পসিবল্। —চিত্র সেন বললে,—ঠিক আছে, ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। ভাবনা নেই। গাছে জল দেওয়ার ছবি উঠতে থাকুক, কণ্বমুনি শকুন্তলার দৃশ্যটাও তোলা হোক। এর মধ্যে আমি হরিণের ব্যবস্থা করছি।

ভারি খুশি গোবিন্দ। হেসে বললে,—পাবে কোথায় ভায়া?

চিত্র সেন বললে,—দেখুন না। আপনার শিল্প নির্দেশকের অসাধ্য কিছু নেই।

চিত্র সেন ডাকলে মেকআপ ম্যানকে। বললে,—ছাগল এনে দিচ্ছি—হরিণ বানাতে পারবেন?

Table of Contents

ওস্তাদ মেকআপ ম্যান ছগনলাল কোম্পানির। তবু একটু মাথা চুলকে বললে,—তা... মানে, আপনি যদি একটু সাহায্য করেন—

চিত্র সেন বললে,—আরে তুলির টানে কি না আসে! দেখই না। কালুকে বললে,—এখন তুমিই ভরসা ভায়া।

কালু সুযোগ্য অ্যাসিসটেন্ট ডিরেকটার। ভবিষ্যতে ডিরেকটার হওয়ার আশা রাখে। বললে,—বলুন কি করতে হবে।

একটা ছাগল চাই।

কালু বললে,—কোথায় পাবো?

চিত্র সেন বললে,—ছুটে যাও সাঁওতাল পাড়ায়। দেখবে—খুব ধাড়ি না হয়। ওখানে একটা না একটা ছাগল পাবেই। ভাড়া করে নিয়ে এসো।

কালু বললে,—কিন্তু ছাগল ভাড়া দেবে তো?

ওদের কাছ থেকে কত জিনিস কিনলাম—আর একটা ছাগল ভাড়া দেবে না? — চিত্র সেন বললে, ওদের মাতব্বর সেই বাংরু মাঝিকে গিয়ে বলবে, সে ঠিক ব্যবস্থা করে দেবে। সে-ই তো আমাদের সব জিনিসপত্র জোগাড় করে দিলে।

মাতব্বর হলেও আদিবাসী সাঁওতাল—এভাবে ছাগল ভাড়া কখনো দেয়নি। তাই প্রথমে অবিশ্বাস—মেরে না খেয়ে নেয়। তারপর হাসি। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত অনেক ধস্তাধস্তি করে সুযোগ্য সহকারী কালু ঘোষ প্রায় দুই ঘণ্টা বাদে দিব্যি একটা কালো কুচ্‌কুচে খাসি টানতে টানতে এনে হাজির করলে। বৈশাখের রোদ্দুরে বেচারী তেতে ঘেমে একাকার। বললে,—বিশ্বাস করে কিছুতেই ছাড়তে চায় না মশাই। শেষে কুড়ি টাকা জমা দিয়ে নিয়ে এসেছি।

চিত্র সেন বললে,—বেশ করেছ।

কিন্তু ডিরেকটার এক লহমায় ছাগলের চেহারা দেখে আবার উত্তেজনায় গর্‌গর্ করে উঠলো,—হো... হো... হো... হোপলেস!... ন্... ন্... নন্...

চিত্র সেন বললে,—আবার কি হলো?

ডিরেকটার বললে,—দা... দা... দাড়ি যে!

ছাগলটার দাড়ি আছে!

শকুন্তলার হরিণ কেন—কোনো হরিণের দাড়ি নেই।

বিব্রত কালু টাক চুলকোতে লাগল।

চিত্র সেন বললে,—আর ছাগল পেলে না?

কালু বললে,—ওর গুষ্ঠিসুদ্ধ সব দাড়ি মশাই। আর ছাগল নেই। যত দেখি—সব শূয়োরের পাল।

চিত্র সেন বললে,—ঠিক আছে। ওর দাড়ি ছেঁটে দিলেই হবে। মেকআপ ম্যানকে ডেকে বলে দিলে, ওর দাড়ি ছেঁটে হরিণের মেকআপ দিন। কালো রঙয়ের ওপর লাগান কড়া করে হোয়াইটিং।

দাড়ি ছাঁটা সহজেই হয়ে গেল। মুশকিল হলো রং নিয়ে। সাদা রং আর কিছুতেই ধরে না। ঘণ্টাখানেক চেষ্টা করে হিমশিম খেয়ে মেকআপ ম্যান এসে জানালে, সাদা রং ধরবে কি—তুলি পিছলে যাচ্ছে মশাই। কোনো রকমেই সুবিধে করা যাচ্ছে না।

Table of Contents

চিত্র সেন এক পলক চোখ কুঁচকে কি ভাবলে। তারপর বললে,—আপনার কড়া আঠা তো আছে মশাই দাড়ি গোঁফ লাগাবার?

তা আছে।

আগে তাই লাগান ছাগলের সারা গায়। শুকিয়ে নিন—তারপর লাগান হোয়াইট।

বুদ্ধি বটে শিল্প নির্দেশক চিত্র সেনের! ডিরেকটার মৃদু মৃদু হাসতে লাগল খুশিতে। বাস্তবিক, কড়া আঠার পর রং ধরছে। দেখতে দেখতে ছাগলের চেহারা বদলে গেল। কোথায় গেল দাড়ি—কোথায় গেল ছাগুলে মুখ আর খুদে চোখ! রঙয়ের কারিকুরিতে চোখ দুটি দেখাচ্ছে দীর্ঘ কালো, মুখটাও আর তেমন বদখৎ নেই। সবটা মিলে দস্তুর মতো হরিণ।

সেই হরিণ চারদিকের মানুষজনের অনেক ঠ্যালাগুঁতো আর শকুন্তলার হাতের চারটি কচি কচি ঘাস খেয়ে তবে নিস্তার পেল। ছবিও উঠল। আহা, এটি সেই হরিণ—যার মা মরে যাওয়ার পর শকুন্তলা যাকে নাকি বড় যত্নে মানুষ করেছিল।

আজ শকুন্তলার পতিগৃহে যাওয়ার দিন, কণ্বমুনির তপোবন আশ্রমের সঙ্গে আজ শেষ বিদায়—আশ্রমের পশুপাখি, গাছপালা, সব কিছুর সঙ্গে শেষ বিদায়। শকুন্তলা চোখে আঁচল চাপা দিয়ে ফোঁপাতে লাগল। ভাঙা গলায় হরিণটাকে বললে,—ফিরে যা—ফিরে যা বাছা! এবার পিতা কণ্ব তোর দেখাশোনা করবেন।

চোখ-মুখে ইয়া দাড়িওয়ালা কণ্বমুনি শূন্যে দুই বাহু তুলে বললে,—হে সন্নিহিত তরুগণ, শকুন্তলা আজ পতিগৃহে চলেছে, তোমরা সকলে আশীর্বাদ করো।

গাছের আশীর্বাদ—পুষ্পপল্লব বৃষ্টি! আম গাছের উঁচু এক ডাল থেকে অ্যাসিসটেন্ট কালু ঘোষ ফুলের চুবড়ি শকুন্তলার মাথায় উপুড় করে দিলে।

দৃশ্য শেষ।

ডিরেকটার খুশি হয়ে বললে,—যাক—উত্রে গেছে।

চিত্র সেন বললে,—বলেছিলুম না ঘাবড়াবেন না।

ওদিকে সূর্য তখন পাটে বসেছে। ওরা তল্পিতল্পা গুটোলে। বাংরু মাঝির খাসি ফিরে এলো আবার কালু ঘোষের জিম্মায়।

চিত্র সেন বললে,—তুমিই ফিরিয়ে দিয়ে এসো। ভাড়া কত ঠিক করেছিলে?

পাঁচ টাকা।

ডিরেকটার বললে,—ঠিক আছে। কিছু বকশিশ দিয়ে বাকি টাকা ফেরৎ নিয়ে জলদি চলে এসো স্টেশনে। রাত আটটার গাড়ি ধরে ফিরে যাবো কলকাতায়।

দল ফিরে চললো স্টেশনের দিকে, কালু খাসিটাকে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে টেনে নিয়ে চললো দূরের সাঁওতাল পাড়ায়।

জলদি ফিরতে বলেছিল কালুকে—কিন্তু কোথায় কালু! সন্ধ্যে হয়ে গেল, সাতটা গড়িয়ে ঘড়ির কাঁটা চললো আটটার দিকে। এদিকে দল তৈরি।

এমন সময় কালু এলো ছুটতে ছুটতে। প্রাণ ভয়ে।

ডিরেকটার বললে,—কি ব্যাপার!

আর মশাই, লাইফ রিস্ক।... অর্থাৎ কিনা জীবন বিপন্ন। —কালু বললে হাঁপাতে হাঁপাতে, আজ প্রাণে বেঁচে ফিরতে পারলে এ চাকরির পায়ে নমস্কার।...

চিত্র সেন বললে,—হলোটা কি?

Table of Contents

কালু বললে,—এখুনি দেখতে পাবেন। ইয়া ইয়া তীর কাঁড় বের করে পাড়া উজাড় করে আসছে মশাই এই দিকে। ওই... ওই শুনুন—আসছে সব দল বেঁধে।

হেতু?

সেই খাসি। —কালু বললে,—মশাই খাসিকে তখন হরিণ বানালেন—এখন বুঝুন ঠেলা! এতক্ষণ সব বোঝাতে গিয়ে প্রাণটা দিয়েছিলাম প্রায়—ছুটে পালিয়ে এসেছি। ওই—বলতে বলতে কালু মুহূর্তে সরে পড়লো।

ওদিকে হল্লা করতে করতে এসে পড়েছে সাঁওতালের দল। সামনে বাংরু মাঝি। একজনের হাতে দড়িতে বাঁধা শকুন্তলার হরিণ। অন্ধকারে ওর রূপ যেন আরও খুলে গেছে।

ডিরেকটার আবার উত্তেজিত। তোৎলাতে শুরু করলে, যত্তো সব ইঃ... ইঃ... ইঃ...

বাংরু মাঝি এগিয়ে এল।

চিত্র সেন ডিরেকটারকে থামিয়ে দিয়ে বললে,—আগে শুনি ওর কথা—কি বলতে চায়।

বাংরু মাঝি ছাগলটাকে এগিয়ে দিয়ে বললে,—মোদের ঠকাতে লারবি। এই জন্তুটা মোদের লয়।

হ্যাঁ—মোদের লয়, মোদের লয়। সারা সাঁওতালের দল কলরব করে উঠল।

মোদের খাসি কালা ছিল, তার দাড়ি ছিল। বাংরু বললে,—ডাক সি বদমাস লোকটাকে—যে এন্যেছিল ওকে। কুথা গেল সে গিধ্‌ধোর?

চিত্র সেন ঠাণ্ডা মাথায়, মুখে হাসি টেনে বললে,—তোমার খাসিটাকেই আমরা রং করে হরিণ বানিয়েছি—ওটা অন্য কোন জন্তু নয়। তবে হ্যাঁ, দাড়িটা আমরা ছেঁটে দিয়েছি। তার জন্যে না হয় একটা টাকা ধরে নাও।

বাংরু মাথা নেড়ে নেড়ে বললে,—উঁহু—ই জন্তুটা মোদের লয়।

সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই সাঙ্গপাঙ্গদের কলরব ঃ লয়—লয়।

চিত্র সেন বিব্রত হয়ে তাকাল ডিরেকটারের দিকে। ডিরেকটার হাঁক পাড়লে তার দ্বিতীয় সহকারীকে—ভোলা!

ভোলা মিত্তির এগিয়ে এল।

ছাগলটাকে জল ঢেলে ধোলাই করে দাও।

ধোলাই করতে গিয়ে সে আর এক ফ্যাসাদ। আঠা আর রং একেবারে শুকিয়ে কামড়ে ধরেছে প্রত্যেকটি চুলের রোঁয়া। কষে জল ঢেলে তাকে নরম করতে গিয়ে ছাগলটা ভ্যা ভ্যা করে আর্তনাদ করতে লাগল। একে রাত, তায় বালতি বালতি জল। ভেক কা ভালা বরখা বাদর—অজকা ভালা ধুপ। বেচারী জল আর হাতের রগড়ানি খেয়ে সকম্পিত অন্তিম চিৎকার শুরু করে দিলে। ওদিকে সাঁওতালদের আস্ফালন। সবে মিলে সারা মুসাফিরখানা সরগরম।

এরই মাঝখানে আটটার ট্রেন পাস করে চলে গেল।

ডিরেকটার বললে,—এখন! উপায়?

ট্রেন পাস করিয়ে স্টেশনমাস্টার হাজির হলেন। বললেন,—কি ব্যাপার মশায়—এত গোলমাল কিসের?

চিত্র সেন ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলে।

সব শুনে স্টেশনমাস্টার চোখ তুলে তাকালেন বাংরু মাঝির দিকে।

Table of Contents

বাংরু আবার জোর গলায় বললে,—উ জন্তুটাকে মোরা ফেরৎ লিবনি। মোদের ঠকাতে পারবি নি—হ্যাঁ। মোদের আসল খাসি দে—চলে যাই, বাস।

সব সাঁওতাল বলে উঠল,—হ্যাঁ।

মাস্টারবাবু বললে,—তা সে জন্তুটা কোথায়?

চিত্র সেন বললে,—জল দিয়ে রং ধুচ্ছে।

এমন সময় ভোলা মিত্তির প্রায় হিমশিম খেয়ে, কাপড় জামা জলে ভিজিয়ে এসে হাজির হলো। বললে,—অসম্ভব মশাই। এই দেখুন—কোথাও রং ওঠে তো আঠা ওঠে না, আঠা ওঠে তো রং ওঠে না। দু-দুখানা সাবান খতম হয়ে গেছে মশাই। এই নিন।

সে এক বিচিত্র জন্তু। সে তখন বাংরু মাঝির খাসিও নয়, শকুন্তলার হরিণও নয়। জলে ভিজে কাঁপছে থরথর করে। মায় শকুন্তলা পর্যন্ত হেসে উঠলো খিলখিল করে।

কপালের ঘাম মুছতে মুছতে ভোলা মিত্তির বললে,—ওর চামড়া না ছাড়ালে ওই রং আর আঠা এ জীবনে উঠবে না মশাই।

তবে আর কি—ছাড়ান তাই। —মাস্টারবাবু বাংরুর দিকে তাকিয়ে বললে,—কি মাঝি, জন্তুটা বেচবি তো?

বাংরু তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের সঙ্গে ওদের সাঁওতালি ভাষায় অনেকক্ষণ কি আলোচনা করলে। তারপর তাদের সিদ্ধান্ত জানালে। হাঁ বেচতে পারি তবে আরও এক কুড়ি টাকা দিবি।

দেবো। —এক্ষুনি দিচ্ছি। ডিরেকটার হাঁফ ছেড়ে তক্ষুনি টাকা বের করে দিলে।

মাস্টারবাবু বললে,—রাতে আর ফেরবারও গাড়ি নেই। রাত কাটাতে হবে মুসাফিরখানায় এবং খেতেও হবে। অতএব... আমার বাতিওয়ালার সাহায্যে ব্যবস্থা করুন।

আমি সব ম্যানেজ করে দিচ্ছি। —বলতে বলতে এবার অন্ধকারের আড়াল থেকে আস্তিন গুটোতে গুটোতে এগিয়ে এল অ্যাসিস্টেন্ট ডিরেকটার কালু ঘোষ।

খানিকবাদে বাতিওয়ালা আর কালু ঘোষ শকুন্তলার হরিণকে টানতে টানতে নিয়ে গেল অন্ধকার প্লাটফর্মের এক প্রান্তে। বাতিওয়ালার হাতে বাতি আর কালু ঘোষের হাতে ছুরি।

বেচারী শকুন্তলার মৃত্যুঞ্জয়ী হরিণ! প্লাটফর্মের জমাট অন্ধকার ঠেলে শুধু ভ্যাঁ করে একবার শব্দ উঠল। তারপর সব নিঃসাড়। না একটু সাড়া, না একটু শব্দ।... তাকে রক্ষা করতে ছুটে এল না শকুন্তলা, না তাত কণ্ব। ওয়েটিং রুমে বসে বসে ওরা তখন গল্প করছে।

Table of Contents

রাবণ বধ পালা

প্রফুল্ল রায়

ছেলেবেলায় আমরা খুব শান্তশিষ্ট ছিলাম না। আমরা বলতে, আমি আর আমার ছোটমামা আনন্দ। দিদিমা বলতেন, দুই ল্যাজ ছাড়া হনুমান।

আমার ছেলেবেলাটা কেটেছে মামাবাড়িতে। আর মামাবাড়িটা ছিল পূর্ববাংলায় ঢাকা জেলার একটি গ্রামে। তার না বাজিতপুর।

সেই পঞ্চাশ বছর আগে, তখনও দেশভাগ হয়নি, পূর্ব বাংলা, যার এখনকার নাম বাংলাদেশ আর আমাদের এই পশ্চিমবাংলা মিলিয়ে ছিল অখণ্ড বাংলা। তখন সেখানে যেতে পাশপোর্ট, ভিসা—এসব কিছুই লাগতো না। শিয়ালদায় গিয়ে ঢাকা মেলে উঠলে গড়গড়িয়ে চলে যাওয়া যেত গোয়ালন্দ, সেখান থেকে স্টিমারে তারপাশা কি ভাগ্যকূলে নেমে নৌকো ভাড়া করে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাওয়া যেত বাজিতপুরে। সেসব এখন স্বপ্নের মতো মনে হয়।

যেকথা বলছিলাম,—মামাবাড়িতে ছোটমামা, দিদিমা আর আমি থাকতাম। আর ছিল কিছু কাজের লোক। বড়মামা, বড়মামি এবং তাদের একমাত্র ছেলেকে নিয়ে থাকতেন নারায়ণগঞ্জ শহরে। তিনি সেখানে জুটমিলে চাকরি করতেন। ছুটি পেলে বাজিতপুরে আসতেন। আমার দাদু অনেক আগেই মারা গিয়েছিলেন। দিদিমা যেমন আমাদের আদরযত্ন

Table of Contents

করতেন, তেমনি তাঁর দাপটও ছিল প্রচণ্ড! তাঁকে আমরা ভয় পেতাম ঠিকই, কিন্তু তাই বলে হাত-পা গুটিয়ে সুবোধ বালক হয়ে থাকার মতো অতটা ভাল কস্মিনকালেও ছিলাম না।

সর্বক্ষণ আমার আর ছোটমামার মাথায় দুষ্টুমির চাষ হত। সারাদিনে দুজনের নামে যত নালিশ আসত সেগুলো পরপর লিখলে তিনফুট লম্বা একটা ফর্দ তৈরি হয়ে যাবে। দত্তদের বাগানের ফুলচুরি, গোঁসাইদের বাড়ির ছেলেদের সঙ্গে বেদম মারপিট, গুলতি দিয়ে পালেদের বাড়ির খেঁকুরে এক বুড়োর মাথায় আলু গজিয়ে দেওয়া, এইরকম অভিযোগের আর শেষ ছিল না।

বাজিতপুরের গা ঘেঁসে ধলেশ্বরী বয়ে গেছে। ধলেশ্বরী প্রকাণ্ড নদী। স্কুলে যাওয়ার নাম করে নৌকোর বাইচ খেলা, সাঁতরে মাঝনদীতে চলে যাওয়া, রাতে বাড়ি থেকে চুপিচুপি পালিয়ে জেলেদের নৌকোয় চড়ে রাতে জেলেদের ডিঙিতে চড়ে ইলিশ মাছ ধরার অভিযান, এসবও ছিল প্রায় রোজকারের ঘটনা।

দিদিমা ছিলেন অত্যন্ত ধুরন্ধর মহিলা। সামনের দিকে যেমন তাঁর দুটো চোখ, মাথার পেছন দিকেও ছিল অদৃশ্য আরও ডজন খানেক। আমরা যদি যাই ডালে ডালে, তিনি যেতেন পাতায় পাতায়। দিনের বেলা যাই করি না কেন, রাত্তিরে বেরিয়ে বেঘোরে না মারা যাই সেজন্য তাঁর সতর্কতার অন্ত ছিল না।

মামাবাড়িতে একটা টিনের দোতলা ঘর ছিল। রাত্তিরে পড়াশুনো এবং খাওয়া-দাওয়া হয়ে যাওয়ার পর দিদিমা আমাদের দোতলায় তুলে বাইরে থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে দিতেন। পরদিন ভোরে তালা খুলে আমাদের বার করতেন। কিন্তু একটা ব্যাপার তিনি টের পাননি। জানলায় যে লোহার শিকগুলো বসানো ছিল, আমরা দুই মামাভাগ্নে ছুরি দিয়ে কেটে কেটে বহুদিনের চেষ্টায় তার একটা আলগা করে ফেলেছিলাম।

দিদিমা তালা দেবার পর চারদিক নিশুতি হয়ে গেলে সেই শিকটা খুলে যে ফোকর হত তার ভেতর দিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়তাম। ঘরটার পাশেই ছিল সুপুরি গাছের ঘন জঙ্গল। সবচেয়ে কাছের সুপুরি গাছটা বেয়ে পলকে নিচে নেমে পড়তাম। তারপর পালবাড়ি, মজুমদার বাড়ি, মৃধাবাড়ি এমনি নানা জায়গায় হানা দিয়ে বন্ধুবান্ধবদের জুটিয়ে সারারাত নানা অপকম্ম করে ভোর হওয়ার আগেই ফিরে আসতাম। সেই সুপুরি গাছটি বেয়ে জানলার ফোকর গলে ঘরে ঢুকে শিকটি জায়গামত বসিয়ে দুজনে শুয়ে পড়তাম।

পরদিন রোদ ওঠার পর দিদিমা যখন ঘরের তালা খুলতেন, দেখতে পেতেন দুই মূর্তিমান পরস্পরকে জড়াজড়ি করে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে।

যাই হোক্, এবার আসল গল্পটি শুরু করা যাক। সেবার পুজোর সময় একেবারে সাড়া পড়ে গেল। শোনা গেল বরিশাল থেকে বিখ্যাত যাত্রার দল বিনোদিনী অপেরা ইনামগঞ্জে 'রাবণ বধ' পালা গাইতে আসছে। আমরা দুই মামাভাগ্নে তো বটেই, গোঁসাইবাড়ির সুখেন আর জগা, মৃধাবাড়ির আনিস, মজুমদার বাড়ির সুবল—এমনি পাঁচ ছয় বন্ধু একেবারে চঞ্চল হয়ে উঠলাম। পালাটা দেখতেই হবে।

কিন্তু ইনামগঞ্জ হল ধলেশ্বরীর দশ মাইল উজানে। মস্ত গঞ্জ। সেখানে সপ্তাহে দু'দিন হাট বসত। অতদূর গিয়ে ভোর হওয়ার আগে বাড়ি ফিরে আসা খুবই কঠিন কাজ।

অনেক খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল বিনোদিনী অপেরা অন্য সব যাত্রাদলের মতো

Table of Contents

সারারাত পালা গায় না, মাঝরাতের মধ্যেই শেষ করে দেয়। নিজেদের মধ্যে প্রচুর পরামর্শ করে ঠিক করলাম, পালা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নৌকোয় উঠে বাদাম খাটিয়ে দেব। হাওয়ার টানে দশ মাইল পেরুতে দুঘণ্টাও লাগবে না। পরদিন দিদিমা দরজা খুলে দেখবেন তাঁর নাতি এবং কনিষ্ঠ পুত্রটি অন্যদিনের মতই ঘুমিয়ে আছে।

পালার তারিখ পড়েছিল অষ্টমীর দিন। ছক অনুযায়ী দিদিমা রাত্তিরে আমাদের ঘরে পুরে যখন একদিকে তালা লাগাচ্ছে অন্যদিকে আমরা তখন জানলার ফোকর গলে উধাও হয়ে গেলাম। বন্ধুবান্ধবদের জোগাড় করে পাড়ি দিলাম ইনামগঞ্জে। আমরা যখন পৌঁছলাম তখনও পালা শুরু হয়নি।

হাটের মাঝখানে গণ্ডা কয়েক হ্যাজাক জ্বালিয়ে আসর বসেছে। বাজনদারেরা ঝড়ের গতিতে কনসার্ট বাজিয়ে যাচ্ছিল।

আসরটাকে ঘিরে প্রচুর দর্শকের ভিড়। তাছাড়াও দেখা যাচ্ছিল অন্ধকারে হ্যারিকেন হাতে ঝুলিয়ে কাতারে কাতারে মানুষ আসছে।

একসময় এক ঝাঁক সাজগোজ করা যাত্রাদলের মেয়ে এসে কনসার্টের তালে তালে নাচ শুরু করল। একে বলা হয় সখী নৃত্য। আসল পালা শুরু হওয়ার আগে এইরকম নাচ সে আমলে দেখানো হত।

আধঘণ্টা নাচার পর সখীর দল সমস্ত আসরটাকে সরগরম করে সাজঘরে ফিরে গেল। তার কতক্ষণ পরে পালা শুরু হয়েছিল, এতকাল পরে আর মনে পড়ে না। যেটুকু মনে আছে, মাঝেমাঝেই তলোয়ার আর তীরধনুক নিয়ে রাম আর রাবণ আসরে আসছিল আর মুহুর্মুহু রণহুঙ্কার ছাড়ছিল। রাবণের ছিল বিশাল দশাসই চেহারা। চোখদুটো টকটকে লাল। মনে হয়, লোকটা গাঁজা টাজা খেয়ে পালা গাইতে নেমেছিল। গায়ে জোরও ছিল তার প্রচণ্ড। হাতের বাইসেপ কম করে চব্বিশ ইঞ্চি আর ছাতি কমসে কম আটচল্লিশ ইঞ্চি তো হবেই। তার হুঙ্কারের জোরটা ছিল অনেক বেশি। সারা আসর একেবারে গমগম করে উঠছিল।

দর্শকরা ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল,—এই না হলে রাবণ! বাপের বেটা একখানা!

রাবণের তুলনায় রাম ছিল অনেক রোগা পটকা। দেখে বোঝা যাচ্ছিল গায়ের জোরও তার কম। কিন্তু হাজার হলেও রামচন্দ্রের পার্ট তো করছে, বীরত্ব তাকে দেখাতেই হবে। সে-ও গলা ফাটিয়ে গর্জে উঠছিল,—তবে রে রাবণ, দুরাচারী পাষণ্ড, বিনাশ করিব তোরে সম্মুখ সমরে—

রাম এবং রাবণ যতবার আসরে আসছিল, তলোয়ার ঘুরিয়ে তুমুল লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল।

দেখতে দেখতে সেই অল্প বয়সে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছিল। আমাদের চারপাশের দর্শকরাও দম বন্ধ করে বসেছিল, তাদের চোখে পলক পড়ছিল না।

রামায়ণে ফাইনাল লড়াইটার আগে রাম-রাবণের যতবার যুদ্ধ হয়েছে তাতে কেউ জেতেওনি হারেওনি, ড্র-ই থেকে গেছে। কিন্তু এখানে মনে হচ্ছিল রাম যেন ঠিক পেরে উঠছে না। রাবণ দাঁত কিড়মিড় করতে করতে বাঁই বাঁই করে তলোয়ার ঘুরিয়ে রামকে একেবারে কোণঠাসা করে ফেলছিল।

Table of Contents

বিনোদিনী অপেরার মালকিন বিনোদিনী দাসী বাজনদারদের একপাশে বসে প্রম্পট্ করে যাচ্ছিল। কালো কুচকুচে গায়ের রং। দেড়মণের মতো ওজন। বড় বড় চোখ। মাথায় বেড় খোঁপায় সোনার কাঁটা গোঁজা। নাকে পেল্লায় নথ। গলায় সাতনহর হার। হাতে গোছা গোছা সোনার চুড়ি। দেখলেই টের পাওয়া যায় অত্যন্ত জবরদস্ত মহিলা। রামকে রাবণ ধাওয়া করলেই সে চাপা গলায় হুমকে উঠছিল,—এই হারামজাদা নিবারণ, বৃন্দাবনের পেছনে ওভাবে লেগেছিস কেন? যা আসরের মাঝখানে। ও না রাম!

জানা গেল, রাবণের আসল নাম নিবারণ আর রামের বৃন্দাবন।

রাবণরূপী নিবারণ দাঁত খিঁচিয়ে বলছিল,—নিকুচি করেছে রামের। ওর মাথাটা যদি থেঁতো করে না দিতে পারি আমার নামে কুকুর পুষো।

রাবণের ভাবভঙ্গি দেখে বোঝা যাচ্ছিল গাঁজার নেশাটা তার মাথায় চড়ে বসেছে। কিন্তু বিনোদিনী তাকে ছাড়বে কেন, রাবণের বদলে রাম যদি বধ হয়ে যায়, দল আর চালাতে হবে না। কাজেই গলার স্বর চড়িয়ে বলছিল,—ফের বদমাইশি করলে দল থেকে বার করে দেব।

শাসানিতে কাজ হয়। আসরের মাঝখানে গিয়ে রাম আর রাবণ এমনভাবে তলোয়ার চালাতে থাকে যাতে কারও গায়ে আঁচড়টি না লাগে। এইভাবে বেশ কয়েক রাউন্ড যুদ্ধ হয়ে গেল।

মাঝরাত কাবার করার পর শুরু হল ফাইনাল লড়াই, যাতে রাবণ মারা যাবে এবং পালাও শেষ হবে।

বোধহয় ফাইনাল ফাইটটার আগে বেশ কয়েক কল্কে গাঁজা টেনে এসেছিল নিবারণ, নেশাটাও এখন তার মাথায় জাঁকিয়ে বসেছে। নেশাখোরদের যা হয়, কিছু একটা ঘাড়ে চাপলে কিছুতেই সেটা নামাতে পারে না। রামায়ণে রাবণের শেষ গতি কী হয়েছিল তা যেন ভুলেই গেছে নিবারণ। অনবরত রামকে তাড়া করে যাচ্ছিল সে।

যুদ্ধক্ষেত্র বোঝাবার জন্য-কিছু মরা সৈনিককে আসরে শুইয়ে রাখা হয়েছিল। তারা তো সত্যি সত্যি মরে নি, ধলেশ্বরীর ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে লাগায় বেশ আরামেই ঘুমিয়ে পড়েছিল।

এদিকে রাম রাবণ লড়াই করতে করতে মাঝে মাঝে তাদের মাড়িয়ে দিচ্ছিল। কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়ায় বেজায় চটে গিয়ে লাফিয়ে উঠে পড়ছিল তারা আর গালাগাল দিচ্ছিল,—কোন হারামজাদা লাথি মারল রে?

সঙ্গে সঙ্গে বিনোদিনী গর্জে উঠছিল,—এই শয়তানেরা, তোরা না মৃত সৈনিক! মরা মানুষ উঠে বসে, না এভাবে চেল্লায়! দলটাকে তোরাই ডোবাবি।

নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে 'ও, আমরা মরা সৈনিক! তাই তো—' বলে, জিভ কেটে আবার তারা লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছিল। এদের কাণ্ড দেখে দর্শকরা হেসে খুন।

যাই হোক, রাম-রাবণের শেষ লড়াই আর থামে না। চলছে তো চলছেই। রাবণের হাতে রাম ক্রমাগত এমন মার খাচ্ছে যে তার প্রাণ বেরিয়ে যাবার যোগাড়। মুখে না বললেও, মনে মনে নিশ্চয়ই আওড়াচ্ছিল, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। কিন্তু ছাড়ছেটা কে? আত্মরক্ষার জন্য সে আসরময় ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছিল।

Table of Contents

মাঝরাতে পালা শেষ হবার কথা ছিল। কিন্তু তিন প্রহর পেরুবার পরও যুদ্ধ আর থামে না।

আনিস বললো,—এখন গিয়ে নৌকোয় না উঠলে ভোরে বাড়ি পৌঁছতে পারব না। উঠে পড়।

এমন একটা যুদ্ধের শেষ না দেখে আমাদের কারও ওঠার গরজ নেই। তবু আনিস আরেক বার মনে করিয়ে দিল,—ভোর হবার আগে না ফিরলে কপালে অনেক দুঃখ আছে।

আনিসের কথায় আমরা কেউ কান দিলাম না।

এদিকে রাত পুইয়ে আসছে দেখে বিনেদিনী চঞ্চল হয়ে উঠছিল। সে বলে,—এই মুখপোড়া নিবারণ, বধ হয়ে যা, বধ হয়ে যা।

নেশার ঘোরে নিবারণ বলে ওঠে,—কেন বধ হব! বৃন্দাবনকেই আজ নিপাত করে ছাড়ব।

—ওরে লক্ষ্মীছাড়া, রাম কখনও বধ হয়? তুই কি রামায়ণ নতুন করে লিখবি! শিগগির শুয়ে পড় বলছি। নইলে তোর একদিন কি আমার একদিন।

বিনোদিনীর শাসানিটা গ্রাহ্যই করল না নিবারণ। সে তলোয়ার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে রামের পেছনে ছুটতে লাগল।

এ যুদ্ধ এ জন্মে থামবে বলে মনে হচ্ছিল না। অগত্যা বিনোদিনী দাসী কি চিন্তা করে সাজঘরে চলে গেল। কিছুক্ষণ বাদে যখন ফিরে এল তার সঙ্গে বাবরি চুলওলা ষণ্ডামার্কা দুটো লোক। তাদের একজন এই পালার কুম্ভকর্ণ, আরেকজন হনুমান। কুম্ভকর্ণের হাতে একটা লম্বা মোটা দড়ি। দড়িটার মাথায় গেরো দিয়ে বড় ফাঁস তৈরি করা হয়েছে। বিনেদিনী ওদের শিখিয়ে পড়িয়ে এনেছিল।

ওরা আসরের একধারে দাঁড়িয়ে তক্কে তক্কে রইল। রাবণ যেই না ছুটতে ছুটতে একবার পা তুলেছে, অমনি দড়ির ফাঁসটা ছুঁড়ে তার পায়ে আটকে দিল এক হ্যাঁচকা টান। হুড়মুড় করে আসরে চিত হয়ে পড়ে যেতে যেতে রাবণবেশী নিবারণ দর্শকদের দিকে তাকিয়ে চেঁচাতে লাগল,—দেখছেন মশায়রা, ধর্মযুদ্ধে আমাকে মারতে না পেরে অধর্ম করে মারতে চাইছে। কিন্তু আমি ছাড়ব না।

বলে উঠে পড়বার চেষ্টা করল। সে সুযোগ অবশ্য পেল না, কুম্ভকর্ণ আর হনুমান ঝাঁপিয়ে পড়ে তার বুকের ওপর বসে মুখ চেপে ধরল, যাতে সে টুঁ শব্দটি না করে।

বিনোদিনী চিৎকার করে রামকে বললে,—পোড়ারমুখোটাকে এবার বধ করে ফ্যাল।

রাম খুব কায়দা করে তার তলোয়ারটা বারকয়েক শূন্যে নাচিয়ে রাবণের গলায় আস্তে করে বসিয়ে দিল।

এইভাবে সেবার রাবণ বধ হয়েছিল এবং রামায়ণের মানও বেঁচেছিল।

এদিকে পালা শেষ হল, রোদ উঠে গেছে। আমরা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে নদীর ঘাটে গিয়ে নৌকোয় উঠলাম। দশ মাইল উজান ঠেলে বাজিতপুরে ফিরতে ফিরতে দুপুর হয়ে গেল। তখন সবার বাড়িতে মড়াকান্না চলছে। বাড়ির লোকেরা ধরেই নিয়েছে বেঘোরে আমাদের প্রাণগুলো গেছে।

যাই হোক্, আমরা বেঁচে আছি দেখে কান্না তো থামল কিন্তু আমাদের অভ্যর্থনাটা কিরকম হল সে কথা ভাবলে এই বয়সেও চোখ ফেটে জল এসে যায়। অন্য বন্ধুদের কী

Table of Contents

হাল হয়েছিল, মনে নেই। তবে ছোটমামা আর আমাকে হাত-পা বেঁধে বেধড়ক পেটানো হয়েছিল।

মারটা না হয় সহ্য হত কিন্তু তার চেয়ে অনেক বড় ক্ষতি হয়ে গিয়েছিল আমাদের। বাইরে তালাবন্ধ থাকলেও কিভাবে আমরা বেরিয়ে যেতাম দিদিমা সেটা আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন।

সুতরাং টিনের দোতলায় আমাদের রাতে ঘুমনো বন্ধ হল। মামাবাড়িতে তিন চারটে মজবুত পাকা ঘর ছিল। তার একটায় থাকতেন দিদিমা। সেখানে তাঁর পাশে আমাদের শোবার ব্যবস্থা হল।

দিদিমার কান কুকুরের মতো সজাগ আর ঘুম খুব পাতলা। তাঁকে ফাঁকি দিয়ে কিছু করা অসম্ভব। রাতে বেরিয়ে যে ধলেশ্বরীতে মাছ ধরব বা কোথাও যাত্রা দেখতে যাব, তার আর উপায় রইল না।

'রাবণ বধ' আমাদের সর্বনাশ করে দিল।

Table of Contents

সেয়ানে সেয়ানে

আশা দেবী

বোধ করি বিষ্যুদ্‌বারের বারবেলায় জয়গুরুবাবু মশাগ্রামের স্টেশনে নেমেছিলেন—নইলে এমন সাড়ে সর্বনাশ চোখে দেখতে হয়?

বন্ধু মকরাক্ষবাবুর অনুরোধে তাঁর বাড়ির পাশের দশকাঠা জমি কিনে; আজ তেত্রিশ দিন পর মিস্ত্রী-কুলি নিয়ে বাড়ির সীমানায় প্রাচীর দিতে এসে একেবারে চক্ষু তাঁর চড়কগাছ!

ঃ একি! তাঁর জমির অর্ধেকটাই যে মকরাক্ষ প্রাচীর দিয়ে ভেতরে কায়েম করে নিয়ে নিয়েছেন। তাঁরই চোখের সামনে তাঁরই গাছ থেকে কাঁঠাল পেড়ে পেড়ে মকরাক্ষ জড়ো করছে নিচেয়, আর তাঁর এক ছেলে ঘুন্টি আর এক মেয়ে নন্দা সেগুলোকে কুড়িয়ে নিয়ে ঘরে তুলছে। খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে জয়গুরুবাবু বললেন ঃ একি, এ তো সব আমার কাঁঠাল! তোমরা কোথায় নিচ্ছ এগুলো?

কালীঠাকুরের মত আধহাত জিভ বের করে একটা ভেংচি কেটে ঘুন্টি একটা চিৎকার দিলো ঃ ওনার—ওনার নাম নেকা আছে? ও বাবা, দেখ না কি বলছে। গাছের ওপর থেকে

Table of Contents

মকরাক্ষ সাড়া দিলেন ঃ বলতে দে। —ঘুণ্টি জয়গুরুবাবুকে কাঁচকলা দেখিয়ে আবার কাঁঠালগুলো বয়ে বয়ে ঘরে তুলতে লাগলো।

জয়গুরুবাবু একেবারে হতবাক। খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে ডাকলেন ঃ মকরাক্ষবাবু, একবার আসবেন নিচে? আমার একটু কথা ছিল।

জয়গুরুবাবু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন মকরাক্ষ গাছ থেকে নামলেন তর তর করে হনুমানের মত। তারপর ঘরে চলে গেলেন ছুটে। একটু পরেই ফিরে এলেন, গায়ে নামাবলী আর কপালে তিলক।

ঃ এই যে জয়গুরুবাবু, আসুন—আসুন। কী সৌভাগ্য—। কেষ্টনগর থেকে আমার খুড়তুতো ভাই কটা কাঁঠাল পাঠিয়ে দিয়েছিল কিনা! তাই ছেলে মেয়ে দুটো ঘরে তুলছিল। আর আমি একটু পুজোয় বসেছিলাম। —হিঁ-হিঁ।

ঃ ওঃ! বলেই জয়গুরুবাবু খানিকটে চুপ করে রইলেন। কি যে বলবেন তিনি কিছু বুঝতে যেন পারছিলেন না।

ঃ তা একটু বসুন—একটু কাঁঠাল খেবো হোক। বাড়িতে পায়ের ধুলো দিয়েছেন এ তো আমার সৌভাগ্য। —ওরে নন্দা, ঘুণ্টি—দুকোয়া কাঁঠাল দে জয়গুরুবাবুকে।

ঃ নন্দা, ঘুণ্টি, এভারেস্ট কিছুই দরকার নেই। —জয়গুরুবাবু বললেন ঃ আমার জমি—গাছ সবই তো প্রাচীর দিয়ে ঘিরে নিয়েছেন। এটা কী ধরনের ভদ্রতা, বলুন তো?

ঃ ওমা একি বলছেন! আপনার জমি আমি নেব কেন? আপনি আমার বন্ধু। তা ছাড়া আপনি অতি সজ্জন ব্যক্তি। আপনার পাশে থাকবো বলেই তো দুই বন্ধু পাশাপাশি জমি কিনলাম। আর আপনিই শেষে আমাকে এই সব বলছেন!

একটা রেকাবী করে দুটো কাঁঠালের কোয়া এনে কাছে রাখলো ঘুণ্টি আর যাবার সময় ঘোষণা করে গেল ঃ বিচি দুটো ফেলবেন নি—মা চেয়েছে।

রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল জয়গুরুবাবুর। বললেন ঃ তুমি নিয়ে যাও খোকা, আমি খাব না।

আমি খাই? —ঘুণ্টি বললো।

খাও—বলতে না বলতে একটা ছোঁ মেরে নন্দ একটা কাঁঠালের কোয়া নিয়ে ছুট দিল, পেছনে ঘুণ্টি, তার পেছনে একটা কালো বকনা বাছুর। মুহূর্তে তিন মূর্তি অন্তর্ধান করলো।

ঃ আহা—হা কাঁঠাল খেলেন না? বড় উত্তম কাঁঠাল, খেলে আর ভুলতে পারতেন না—দুটো কোয়াই ওরা খেলো শেষকালে।

একবার মুখে এসেছিল জয়গুরুবাবুর—গাছ তো আমারই, ভাল কাঁঠাল আমি তো দেখেই কিনেছি। কিন্তু মুখে কিছু না বলে গায়ের রাগ গায়েই মেখে বললেন ঃ উঠি আজ।

ঃ আবার আসবেন। কতদিন আসেন না। —আমি ভাবি যাব একদিন। —যাওয়া আর হয় না। গাড়ি ভাড়া লাগে তো! আর এতক্ষণ যদি না বসতাম কতগুলো কাঁঠাল পেড়ে —বলেই জিভ কাটলেন। মানে—মানে পুজো-টুজো সব সেরে ফেলতাম।

ঃ তা তো বটেই। আমি যাই আপনার কাজের ক্ষতি আজ আর করবো না।

ঃ আসুন—মকরাক্ষ বললেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। বাড়ি ফিরতে ফিরতে জয়গুরুবাবুর

Table of Contents

চোখে জল এলো, তার বন্ধু কত ভালো ভালো কথা বলে তার পাশের জমিটা তাঁকে দিয়ে কিনিয়েছে শুধু ধাপ্পা দিয়ে সব জমিটা গ্রাস করবার জন্যে?

বাড়ি গিয়ে ভাবতে লাগলেন ঃ কী করা যায়? কয়েক জন জমিটা কিনতেও এলো। সাতদিন পর এক ভদ্রলোককে নিয়ে জমিটা দেখতে গিয়ে দেখেন, তাঁরই কাঁঠাল গাছ কেটে তাঁরই জমির ওপর লোক এনে কাঠ চেরাই করা হচ্ছে। জয়গুরুবাবুকে দেখে একগাল হেসে মকরাক্ষ বললেন, কাঁঠাল কাঠের রং বড় সুন্দর। তাই সাধ হয়েছে বেশ কখানা পিঁড়ি আর কটা টেবিল বানাব—তাই-হেঁ-হেঁ—ভালো মানুষ জয়গুরুবাবুর ব্রহ্মরন্ধ্র জ্বলে উঠলো ঃ আমার জমির ওপর আমার কাঁঠাল গাছ আপনি কাটলেন কার হুকুমে? একগাল হেসে সবিনয়ে নিবেদন করলেন মকরাক্ষ ঃ জানেন তো কথায় বলে দুধ খায় যে গরু তার! কাঁঠাল খায় যে গাছও তার। —সুতরাং—ভেবে দেখুন—হেঁ-হেঁ!

ঃ হেঁ—হেঁ। এ সব কথা আপনাকে কে বলেছে? —ভেবেছিলাম আপনি আমার বন্ধু—। এখন দেখছি—

ঃ ওরে ঘুন্টি, তোর মামাকে ডাকতো—সে তো বুকে নাকি হাতি রাখে। এই লোক দুটোকে ছুঁড়ে ধাপায় ফেলে দিক।

যিনি বাড়ি কিনতে এসেছিলেন তিনি ব্যাপার-স্যাপার দেখে খানিকটা হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থেকে চিৎকার করে ছুটতে লাগলেন ঃ গুণ্ডা—গুণ্ডা—! বাঁচান—বাঁচান! জমি বিক্রির ভাঁওতা দিয়ে গুণ্ডার আস্তানায় এনে ফেলেছে। —পুলিশ—পুলিশ—

জয়গুরুবাবু বাড়ি এসে একেবারে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। নাঃ, তার হাতে যে কটা টাকা ছিল তাই দিয়ে ওই জমিটুকু কিনেছেন থাকবেন বলে। একি বিপদ। সারারাত ধরে ভাবলেন কী করা যায়। কিছুই মাথায় আসে না। মামলা মোকদ্দমা অবশ্য করা যায়, কিন্তু সে তো বিস্তর ঝামেলা! মকরাক্ষবাবুর বোঁচা হিটলারি গোঁফ আর টাক মাথার কথা মনে পড়লেই নিজের মাথাও গরম হয়ে ওঠে। সারারাত ধরে ভাবলেন এমন যদি হয়—কাল মকরাক্ষ পাগল হয়ে যায় কিম্বা ওর দাওয়ায় বাঁধা নধর খাসিটা প্রতিবেশীরা চুরি করে নেয়—আর তারই শোকে লোকটা দেশত্যাগী হয় আর তার যাবতীয় সম্পত্তি জয়গুরুবাবুকে দানপত্র করে দিয়ে যায় দেশত্যাগের আগে? কিম্বা রাতে যদি মকরাক্ষ স্বপ্ন দেখে যে জয়গুরুবাবুর সমস্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে দেবার জন্য স্বয়ং ভগবান আদেশ করছেন—

নাঃ! কিছুতেই সারারাত ধরে জয়গুরুবাবুর ঘুম এলো না। মাথাটা প্রচণ্ড গরম হয়ে গেল। কানের মধ্যে দিয়ে যেন এরোপ্লেন চলার মত শব্দ হতে লাগলো। বাজে কথা ভেবে বুঝি তিনি নিজেই পাগল হয়ে যাবেন।

ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া মাথায় লেগে হঠাৎ বোধ হয় তিনি একটু ঘুমিয়ে পড়েছেন। হঠাৎ করে চিৎকারে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। মনে হলো কে যেন তাঁর নাম ধরে ডাকছে। হঠাৎ বাইরে এসে দেখেন ষষ্ঠীচরণ তাঁরই মাসতুতো ভাই। আগে লোহা টেনে বাঁকা করতো, দাঁত দিয়ে মোটর গাড়ি আটকাতো। এখন পৈত্রিক ব্যবসা গুরুগিরি করে। সে শিষ্য-বাড়ি থেকে যাচ্ছিল, পথে জয়গুরুবাবুর সঙ্গে দেখা করে যাবার বাসনায় সঙ্গে প্রায় পঞ্চাশ জন শিষ্য নিয়ে এসে হাজির।

জয়গুরুবাবুর শুক্‌নো মুখের দিকে তাকিয়ে বললে ঃ কি রে, তোর শরীর খারাপ নাকি?

Table of Contents

ঃ না, ও সব কিছু নয়। বোসো—বোসো। কতদিন পরে এলে। নিজের অবস্থা সব জানিয়ে জয়গুরু বললেন,—বড় বিপদে পড়েছি। তুমি এসেছ ভালই হয়েছে।

ঃ তুমি তো জানো আমার কেউ নেই! চাকরি থেকে রিটায়ার করবার পর ওই মকরাক্ষ পাকড়াশী আমার পেছনে লাগলো। তারপর রাতদিন আমার সঙ্গে ঘুরতে লাগলো একটা জমি কেনবার জন্যে।

গুরুদেব ষষ্ঠীচরণ ঘন ঘন তাঁর কাঁচাপাকা দাড়িতে হাত বুলাতে লাগলো ঃ তারপর?

ঃ তারপর আর কী! একটা জমির দশকাঠা আমি কিনলাম সর্বস্ব দিয়ে, আর ও কিনলো পাঁচ কাঠা! আবার কেনবার সময় আমার হাত পা ধরে আমার কাছ থেকে পাঁচশো টাকা নিলো। বললো ঃ কাল দেব, আর দেবার তো নামই নেই, চাইতে গেলে পেছনে কুকুর লেলিয়ে দেয়—নয় মেয়ে বা ছেলে পাঠিয়ে বলে ঃ বাবার জ্বর, প্রলাপ বকছে। যদি দাঁড়িয়ে দু-একটা কথা বলতে চাই তাহলে প্রলাপ বকবার নাম করে এমন গালাগালি করবে যে কী বলবো।

ঃ বটে! —ষষ্ঠীচরণের চোখ ঢুলু ঢুলু করতে লাগলো ঃ তারপর বলে যাও। —বলে হাত ঘোরাতেই কুস্তিকরা হাতের মাসল এমন ফুলে উঠলো যে ফট্ করে গেঞ্জি ফেঁসে গেল। জয়গুরুবাবু একবার ঢোক গিলে তার হাতের শক্ত পেশীর দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ তারপর জমি কেনা হলো। হাতে টাকা ছিল না। অনেক কষ্টে ধার করে টাকা যোগাড় করতে মাসখানেক সময় লেগে গেল। তারপর কুলি-মিস্ত্রী নিয়ে এসে দেখি যে সে ও অর্ধেক জমিই প্রাচীর দিয়ে নিজের জন্যে নিয়ে নিয়েছে; বলতে গেলাম তো ওর আত্মীয় বিখ্যাত কুস্তীগির ভজকেষ্টকে ডেকে বললে ঃ দে তো লোকটাকে এক রদ্দায় গ্রাম পার করে ঃ হুঁ—! —ষষ্ঠীচরণের মোটর গাড়ি আটকানোর দাঁতের পাটি মাজনের বিজ্ঞাপনের মত ঘন ঘন দেখা যেতে লাগলো মুখের থেকে। ঃ তারপর আমার জমির কাঁঠাল গাছটা কেটে নিয়েছে। আর এক ভদ্রলোক জমিটা কিনবেন বলে দেখতে গিয়েছিলেন তাঁকে মারধোরের ভয় দেখাতে তিনি প্রাণ নিয়ে কোন মতে পালিয়ে বেঁচেছেন. এখন আমি কি করি?

ষষ্ঠীচরণ খানিকটা ভাবলো তারপর হাঁকলো ঃ সুঁটে—ও সুঁটকে। ঃ আজ্ঞে স্যার—বলেই ফড়িঙের মত এক ছোকরা ষষ্ঠীচরণের পায়ের ধুলো নিয়ে দাঁড়ালো।

ঃ তোর এক আত্মীয় মশাগ্রামে থাকে, আসবার সময় বলছিলি না।—

ঃ হ্যাঁ স্যার! আপনার তো বেশ স্মরণ-শক্তি।

ঃ কি নাম তার বল তো? —ষষ্ঠীচরণের স্বর হুলো বেড়ালের মতো শোনালো।

ঃ মকরাক্ষ পাকড়াশী—! সুঁটে বললো।

জয়গুরুবাবু মাথা নাড়লেন ষষ্ঠীচরণের দিকে তাকিয়ে ঃ হ্যাঁ—এই লোক।

ঃ সে কেমন লোক রে—! হুলো বেড়াল যেন ওত পেতে বসলো ঃ স্যার, আমারই তো মামা। দুজনে এক সঙ্গে কারবার করতাম। চুরি করে আমাকে ফাঁসিয়ে দিলো। বললে জেল খাট আমার হয়ে, টাকা দেব। বেরিয়ে এলে আর আমাকে চিনতেই পারলো না। অনেক করে মনে করাতে চেষ্টা করলাম যখন অনেক কেঁদে কেঁটে—! তখন বললে ঃ ভজকেষ্টর একখানা রদ্দা খেলে তোর বাঁকা নাক সোজা হয়ে যাবে—সটকে পড়বি তো

Table of Contents

পড় নইলে—! আর কি করবো স্যার সহোদর মামারই এই ব্যাভার। আপনার শিষ্য হয়ে গেলাম মনের দুঃখে।

ঃ ওই তা হলে! এক কাজ কর—একটা খোঁজ নিয়ে আয় ও কোথাও বাইরে যাবে কিনা। —আর গেলে কত দিন থাকবে। —দেরি হলে—

ঃ না স্যার আমি এখুনি যাচ্ছি। —সুঁটে সট করে বন্দুকের গুলির মত বেরিয়ে পড়লো।

সাত দিন পর খবর এলো। মকরাক্ষ ওর স্ত্রী আর ছেলেপুলেকে পশ্চিমে তার কোন আত্মীয়বাড়ি রেখে আসতে যাচ্ছে; ফিরতে দিন পনেরো সময় লাগবে।

ঃ বহুত আচ্ছা। ঃ ষষ্ঠীচরণ বললে।

ঃ স্যার বাড়িঘর দেখবার ভার তিনি আমার ওপরেই দিয়ে গেছেন। —এবার আর কোন গোলমাল করেন নি।

ঃ আর ভালো—ষষ্ঠীচরণ বললে। তারপর কেঁদো বাঘের গলায় বললে, যা পঞ্চাশ জন কুলি-মিস্ত্রী ডেকে আন এখুনি। বলবি মন্দির—আশ্রম এসব তৈরি করতে হবে। রাতদিন খাটতে হবে। উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাবে তারা।

মকরাক্ষ পনেরো দিন পর বাড়ি ফিরলো খুব খেয়ে দেয়ে মোটা হয়ে। সমস্ত ট্রেন মনে মনে ফন্দি আঁটলো ঃ সুঁটেকে পাওয়া গেছে খুব ভালো হয়েছে। ওকে কালই লাগিয়ে দেব জয়গুরুর জমির যে কটা গাছ আছে কাটবার জন্যে, তারপর রাতারাতি একটা প্রাচীর দিয়ে ঘিরে নিতে কতক্ষণ। আর অতটুকু জমি রেখেই বা জয়গুরুবাবুর লাভ কি? এবার ফিরে গিয়ে ওঁকে একেবারে নিশ্চিন্ত করে দেব। আর সুঁটে থাকবে—আমার ছাগল গরু চরাবে—

কিন্তু একি! এই সব ভাবতে ভাবতে বাড়ির সামনে এসে মকরাক্ষ পাকড়াশীর চোখ একেবারে ছানাবড়া ঃ একি ভুল রাস্তায় এলাম! কোথায় তার বাড়ি? কিন্তু এই তো রাস্তা, এই তো অন্য সব বাড়ি। কি ব্যাপার—বাড়ির সামনে মন্দির, বিরাট আশ্রম! একটা সাইন বোর্ডে যেন কি লেখা আছে, কাছে গিয়ে পড়ে যেন সে চোখকে বিশ্বাস করতে পারলো না। "দানবীর মকরাক্ষ পাকড়াশী তার গুরু ষষ্ঠীচরণ দেবকে যথাসর্বস্ব দান করে গেছেন। এ সবই তাঁরই সেবার জন্য রইলো।"

চিৎকার করে তার কাঁদতে ইচ্ছে হলো। কি ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারে না। পাশের বাড়ির ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হতেই সে বললে ঃ পায়ের ধুলো দিন দাদা। —দেবতা আপনি, নইলে গুরুকে এমনি সব দান করে দেয়। মকরাক্ষ পাগলের মত বললে ঃ দাঁতের ওপর এমন ঘুসি লাগাবো যে বত্রিশ পাটি দাঁত একেবারে চিলে নিয়ে যাবে। ভদ্রলোক মকরাক্ষের ভাবগতিক দেখে মনে মনে ভাবলো ঃ কি রে বাবা দেবতা টেবতা ওর কাঁধে ভর করলো নাকি? ভদ্রলোক মানে মানে কেটে পড়লেন।—

মকরাক্ষ হাঁকলো ঃ ভজকেষ্ট! কোন সাড়া নেই। ও ভজা ও সুঁটে মুখপোড়া ঃ এবার বেরিয়ে এলো ষষ্ঠীচরণ স্বয়ং। মকরাক্ষের হাঁ করা মুখে একখানা বাতাসা গুঁজে দিয়ে বললো ঃ ওরা এখন কীর্তন গাইবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ও আমার ভূতপূর্ব শিষ্য—তোমাকেও আমি আশীর্বাদ করি—

বলতেই মকরাক্ষ পাগলের মত একটা ঘুসি তুলতেই ষষ্ঠীচরণ ওর হাতটা চেপে ধরে বললে—এই এক—এই দেড়—এই দুই—এই আড়াই। —প্যাঁচের পর প্যাঁচে ষষ্ঠীচরণ

Table of Contents

মকরাক্ষকে একেবারে বেড়ালের ধরা ইঁদুরের মত লোফালুফি করে বললে এই তিন—গো।

গায়ের ধুলো ঝেড়ে উঠে চিৎকার করতেই জগঝম্প, খোল আর করতাল যোগে কীর্তন শুরু হয়ে গেল। মকরাক্ষের চিৎকার চাপা পড়ে গেল। আর সেই মুহূর্তে তার চোখে পড়লো জয়গুরুবাবুর সুন্দর নতুন বাসা—ঘর—বারান্দা। আর বারান্দায় একটা কাঁঠাল কাঠের জলচৌকির ওপর বসে জয়গুরুবাবু কাঁঠাল আর মুড়ি নিয়ে পরমানন্দে হাসছেন আর খাচ্ছেন। মকরাক্ষের ইচ্ছে হলো এক ধাক্কায় জয়গুরুকে একেবারে বারান্দা থেকে নিচে ফেলে দেন। কিন্তু আপাতত চারদিক প্রাচীর ঘেরা আর তার দরজায় এক ভোজপুরী দারোয়ান। কাজেই রাগে নিজের মাথার চুলই ছিঁড়তে লাগলেন মকরাক্ষ।

আর সামনে গুরুদেব মোটর-টানা দাঁত একেবারে খিঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মকরাক্ষের মুখ শুকিয়ে যায়। মকরাক্ষ দেখলে তার চারদিকে কেউ নেই—আর তারই পোষা ভেড়াটা কি মনে করে তার দিকে প্রচণ্ড বেগে ছুটে আসছে রকেটের মত। সুতরাং বোধ হয় আর এখানে থাকা নিরাপদ নয়। —মনে করে পালাতে গিয়ে দেখেন, তাঁর মালপত্র সবই শিষ্যরা আশ্রমে নিয়ে যাচ্ছে।

ঃ চোর—ডাকু। —পুলিশ। বলতে বলতে মকরাক্ষবাবু থানার দিকে ছুটলেন।

Table of Contents

রাখে কেষ্ট (া) মারে কে?

ধীরেন বল

হাফ ইয়ার্লি পরীক্ষার আর মাত্র কুড়িদিন বাকি। সবে ইতিহাসের বইটা খুলে বাইরের পড়বার ঘরে বসেছি, এমন সময় কাঁধে একটা মুখবাঁধা বস্তা নিয়ে গলদঘর্ম কলেবরে কেষ্টাকাকা এসে প্রবেশ করলেন। খুব সন্তর্পণে বস্তাটা কাঁধ থেকে নামিয়ে টেবিলের পায়ার কাছে রেখে পাশের চেয়ারটায় বসে পড়ে বেশ বিরক্তির সঙ্গে বলে উঠলেন,—নাঃ, কিছুতেই আর ঠেকাতে পারলাম না রে হেবো, বিদেয় ওকে করতেই হলো। কী নাছোড়বান্দা মানুষ রে বাবা! পনের দিন ধরে—বিদেয় করো, বিদেয় করো—বলে আমার মাথা খেয়ে ফেললে। না হলে, সেই নাকি বাড়ি থেকে বিদেয় হবে!

আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করি,—কে কেষ্টাকাকা? কে বিদেয় করছে, কাকে?

—কে আর বিদেয় করবে? যে কথায় কথায় সব সময় আমাকেই বিদেয় করে।

—ওঃ! কাকিমার কথা বলছ? তা, কাকে বিদেয় করছেন কাকিমা? তোমাকে তো এখনো বিদেয় করতে পারেন নি তিনি!

—আরে ছ্যাঃ! আমাকে বিদেয় করলে তো বেঁচেই যেতাম। সে দিক দিয়েই নয়। আজ বিদেয় করছে এমন একজনকে, যার বাপ নেই, মা নেই—ত্রিভুবনে আপনার বলতে কেউ নেই। একেবারে অনাথ! তাছাড়া, আমাদের বাড়ি ছাড়লে তাকে দুনিয়াই ছাড়তে হবে। কোথায় থাকবে, কোথায় খাবে, কার কাছে আশ্রয় পায়ে? দোষের মধ্যে এই যে,—দুধ আর মাছ সে একটু বেশি ভালবাসে। তা, দুধ-মাছ কে-না ভালবাসে? আমিই কি বাসি না, তুমিও কি বাস না? যত দোষ, নন্দ ঘোষ! বেচারার ও দুধ মাছই কাল হলো। এবার থেকে কোথায়

Table of Contents

পাবি সেই দুধ আর মাছ? কোথায় পাবি এই আদর-যত্ন? কোথায় পাবি এমন আশ্রয়? চুরি না করলে আর চলত না,—না মর! এবার রাস্তায় ঘুরে ঘুরে মরগে যা!

আমি কান পেতে এতক্ষণ ধরে কেষ্টাকাকার দুঃখের নালিশ শুনছিলাম। উৎসুক হয়ে আবার প্রশ্ন করি,—রাস্তায় ঘুরে ঘুরে কে মরবে কেষ্টাকাকা? তোমাদের সেই নতুন চাকর-ছোঁড়াটা বুঝি? কিন্তু সে তো অনাথ নয়, দেশে তার বাবা-মা সবাই আছে শুনেছি।

—না-না, আমাদের নতুন চাকর সুরেশের কথা বলছি না। সে তো আমাদের বিশেষ প্রয়োজনীয়—ভি.আই.পি! এক দণ্ড ওকে না হলে আমাদের সংসার একেবারে অচল। বিদেয় চাইলেই বা কে ওকে বিদেয় দিচ্ছে? বরং ভুলিয়ে-ভালিয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ওকে আরো ধরে রাখবার চেষ্টা চলছে। ও যাবে দুধ মাছ চুরি করতে? বরং দুধ মাছ খাইয়ে ওকে আরো বাগাবার চেষ্টাই হচ্ছে! লোভ দেখানো হচ্ছে যাতে ও নিজে থেকে বিদেয় চাইতে না পারে। জানিস তো, কূটনীতিতে তোর কাকিমা আমার চাইতেও সেয়ানা! কাঁচা কাজ কক্ষনো করে না সে।

—না কেষ্টাকাকা, তোমার এ ধাঁধার মধ্যে মাথা গলাতে পারলাম না আমি। হেঁয়ালিটা এবার পরিষ্কার করে দেবে কি?

—হেঁয়ালি তো কিছু নেই রে হেবো! বেচারা অবলা জীব, আজ না হয় সে তোমার গলগ্রহ, তোমার আশ্রয়েই আছে সে! প্রতিদানে সে-ও তো তোমার উপকার করে থাকে।

কেষ্টাকাকার হেঁয়ালি তবু আমার কাছে হেঁয়ালিই থেকে যায়। আমি নতুন করে কোনো প্রশ্ন করি না।

হঠাৎ পায়ের কাছে রাখা মুখ-বাঁধা বস্তাটা একটু নড়ে ওঠে। আঁতকে উঠে পা দুটো টেনে নিই আমি।

—বস্তায় করে কী বস্তু এনেছ কেষ্টাকাকা? নড়ছে যে!

—নড়বে না? আরে ও-তো আর গাছপাথর নয় যে, নট-নড়ন-চড়ন। একটা জীব তো, ওরও খিদে-তেষ্টা আছে, সুখ-দুঃখু আছে। খিদে পেলে আমাদেরই মতো ঘুর ঘুর করবে —এতে অবাক হবার কি আছে? ওটা ওর অপরাধ নয়, প্রয়োজন।

—তুমি কার কথা বলছ কেষ্টাকাকা? এই বস্তায় করে কী এনেছ তুমি?

—কী আর আনব? আরে, ওই বেচারাই তো আজ সবার গলগ্রহ। সবার গাত্রদাহ। ওকেই তো আজ বিদেয় করতে হবে, নাহলে কারো মুখ দিয়ে অন্ন জল রুচবে না।

বলতে বলতে কেষ্টাকাকার গলা ভারী হয়ে আসে। কিন্তু এ-ও বুঝলাম—এর বেশি আর কেষ্টাকাকার কাছ থেকে আদায় করাও সম্ভব নয়। বাধ্য হয়ে সন্তর্পণে বস্তাটার গায়ে হাত বুলিয়ে নিজে থেকেই বোঝবার চেষ্টা করি! আমার হাতের ছোঁয়া পেয়ে ভেতর থেকে আওয়াজ বেরোয়—'মী'।

—আরে, এ যে ইংরাজিতে জবাব দিচ্ছে—মী! হ্যাঁ—হ্যাঁ। ইউ—ইউ। তোমাকেই জানতে চাই আমি। হু আর ইউ? কে তুমি?

—মী আও।

—আরে, এ যে চীনা ভাষায় কথা বলছে! মী-আও কী তবে নতুন কোনো চীনা নেতা?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, চেনা বই কি? তুই ওকে বেশ চিনিস—আমাদের চিনু যে!

—চিনু? তোমার সেই পোষা বেড়াল ছানাটা?

Table of Contents

—তবে আর বলছি কি? ওকে নিয়েই তো যতো গণ্ডগোল! ওই তো আজ বাড়ির চক্ষুশূল!

—কেন কেষ্টাকাকা, কী করেছে চিনু যে, আজ তাকে বিদেয় করতে যাচ্ছ?

—যাচ্ছি না, যেতে বাধ্য হচ্ছি। বাড়ির সব মাছ-দুধ ও নাকি চুরি করে খায়।

—শুনেছি-ও নাকি ইঁদুর মেরে মেরে তোমাদের বাড়িটা সাফ করে দিয়েছে। ইঁদুরের জ্বালায় তোমরা তো তিষ্টোতে পারছিলে না।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, খোকার তোষক-বালিশ সব কেটে একেবারে ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল। বাড়ি থেকে সব ইঁদুর নির্মূল করেছে ওই চিনু। ইঁদুর তো আর একটাও নেই, তাই লোভ দুধ-মাছের ওপর।

—আর সেই উপকারী চিনুকেই তুমি আজ বিদেয় দিতে চলেছ?

—কী করবো বল? পনেরো দিন ধরে এ নিয়ে সমানে লড়াই করে চলেছি তোর কাকিমার সঙ্গে। অবশেষে হার আমাকে মানতেই হলো। আর ও হতভাগার কথাও বলি—তোকে নিয়ে যখন এতো বিতণ্ডা, তখন কটা দিন তুই চুরিটা সামলাতে পারলি না? আজো খোকার দুধের ঢাকনা ফেলে সবটা দুধ চেটেপুটে খেয়েচে। তোর কাকিমাই বা কত সইবে? বেকুব আর কাকে বলে। মর্ এবার বনবাসে গিয়ে, না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মর্।

—তুমি ওকে বনবাসে নিয়ে চলেছ,—কোথায়?

—কোথায় আর? ওই খেয়াপারেই রেখে আসি।

—খেয়াপারে রেখে এলে আর তো ও এপারে আসতে পারবে না কেষ্টাকাকা! চোদ্দ বছর পরেও না।

—পারবেই না তো। আর সেই শোকেই চোদ্দ দিন আমার দুচোখে নিদ্রেটি নেই।

—বনবাসেই যদি পাঠাতে চাও, তার চেয়ে এক কাজ কর না কেন? ওতে ভাল ফল পেতেও পার।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, নিশ্চয় করবো! বল কী সে কাজ? ওর জন্যে সব কিছু করতে আমি প্রস্তুত আছি। বল হেবো, কী সে কাজ?

—দাঁড়াও বলছি।

তারপর মাথা চুলকে ভেবে ভেবে একটা ফন্দী বার করতে চেষ্টা করি। কেষ্টাকাকাকে প্রশ্ন করি—কাকিমার রাগ তো শুধু এই চিনুর ওপরেই, না কেষ্টাকাকা?

—তা তো বটেই, তা তো বটেই!

—অন্য বেড়াল দেখলেও কি কাকিমা রেগে যাবেন?

—তা যাবে না হয়ত। ব্যাপার কি জানিস হেবো, বেড়াল যে ও পছন্দ করে না, তা নয়। বেড়াল ও খুব ভালবাসে। তবে, চোর বেড়ালকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না—বিশেষ করে মাছ-দুধ যে চুরি করে, তাকে। মাছ তোর কাকিমার প্রিয় খাদ্য, আর দুধ তার খোকার। এ দুটোয় হাত পড়লে আর জ্ঞান থাকে না তোর কাকিমার। চিনু তা গ্রাহ্য করেনি। আর, তার ফলেই এই নির্বাসন। রেহাই এবার কিছুতেই নেই চিনুর।

কিছুক্ষণ মাথাটা চুলকে নিলাম, তারপর পেন্সিলের ডগাটা চুষলাম কিছুক্ষণ। কিছুটা ভেবে, কিছুটা মৌন থেকে, তারপর প্রশ্ন করি—চিনুর বদলে আমি অন্য একটা বেড়াল তোমাদের ওখানে পাঠাতে চাই, অথচ চিনুকেও বনবাসে পাঠাতে হবে না,—তাহলে কেমন হয় কেষ্টাকাকা?

Table of Contents

—বেশ হয় রে হেবো, বেশ হয়! যে করেই হোক চিনুর বনবাসটা তুই রদ করে দে তো!

—বেশ, আমি ওকে আর চিনু রাখছি না, অন্য বেড়াল বানিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু...

—সে কি? তুই ম্যাজিক শিখেছিস নাকি? অন্য বেড়াল বানাবি কি করে রে হেবো?

—বাঃ বাঃ! তাহলে বেশ হয় কিন্তু।

—কিন্তু, তোমাকে কথা দিতে হবে বাড়ি ফিরে আর যেন ও মাছ-দুধ চুরি করে না খায়। সে দায়িত্ব তোমার।

—নিশ্চয় নিশ্চয়। আমিই নিচ্ছি সে দায়িত্ব। এক্ষুনি তুই ওকে অন্য বেড়াল বানিয়ে দেরে হেবো!

—আচ্ছা কেষ্টাকাকা, তোমার ওই বেড়াল ছানাটার গায়ের রং একেবারে সাদা, নয় কি?

—হাঁ রে! একেবারে ধবধবে সাদা। তোরা যাকে মিল্ক হোয়াইট বলিস, ও একেবারে তাই। আর সেই জন্যেই হয়ত মিল্কের ওপর ওর এত বেশি লোভ।

—হতেও পারে। তবে মাছের ওপর লোভটা হতে গেল কেন? একটু ভেবে নিয়ে কেষ্টাকাকা তার অনুমানটা বোঝাতে চেষ্টা করেন।

—আচ্ছা, মাছ মানে তো ফিশ? আমি যে রোজ ওকে ফিশ্ ফিশ্ করে দুধ চুরি করতে বারণ করি, তাই হয়তো ফিশের ওপর ওর লোভ বেড়ে যায়। বাড়িতে ফিশ এলেই ওর দাঁতগুলো নিশপিশ্ করে।

—আচ্ছা কেষ্টাকাকা, তুমি একটু বসো, আমি এক্ষুনি আসছি। বলেই তাড়াতাড়ি বাড়ির ভেতরে আলমারি থেকে কালার বক্সের কৌটোটা, তুলি আর জল নিয়ে ফিরে আসি।

—রং তুলি দিয়ে কী করবি রে হেবো? ওর স্মৃতিটা ধরে রাখতে ছবি এঁকে নিবি বুঝি? আহা, আমিও একটা ছবি ঘরে রেখে দিতে পারতাম, কিন্তু আজ ছ'মাস ক্যামেরাটা বিগড়ে পড়ে রয়েছে।

—না—না, ছবি-টবি কিছু নয়! এবার তুমি বার করে নিয়ে এসো বস্তা থেকে বেড়ালটাকে। দেখো, এক্ষুনি আমি ওকে অন্য বেড়াল বানিয়ে দিচ্ছি। চিনুকে আর চিনতেই পারবে না কাকিমা! কিন্তু খবরদার! আর নট্ চুরি-ফুরি, নট্ কিচ্ছু। একেবারে সুবোধ বালক —ভাজা মাছটিও উল্টে খেতে পারে না যেমন!

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয় নিশ্চয়, তুই দেখিস! চুরি আর ও কখনো করবে না, এ আমি বলে দিচ্ছি!

এরপর চিনুর গায়ের সেই ধব্ধবে লোমের ওপর পুরো এক ঘণ্টা ধরে চলে আমার আর্ট-ওয়ার্ক! ইয়েলো আর ডীপ অরেঞ্জ মিশিয়ে একটা চমৎকার মিষ্টি রং তৈরি করে নিলাম। আর তাই দিয়ে নিপুণ হাতে ছোপ ছোপ দাগ কাটলাম সেই মিল্ক হোয়াইটের ওপর।

—বাঃ! বেশ দেখাচ্ছে তো এবার। দিশি বেড়াল বলে আর চেনাই যায় না। মনে হয়, ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে এসেছে। আদর করে না খাওয়ালে যেন কেক-পুডিং কিচ্ছু খাবে না। এ যেন, আর লোভী বাঙালি নয়, জোচ্চোর ব্যাবসাদারও নয়। যেন পশ্চিমের পররাষ্ট্র সচিব।

হতভাগা বেড়ালটার চেহারার আশ্চর্য এই পরিবর্তন দেখে আনন্দে কেষ্টাকাকা ধেই ধেই করে নাচে আর কি! একবার জড়িয়ে ধরে আমাকে, আবার কালার বাক্সটা মাথায়

Table of Contents

তুলে বারবার প্রণাম জানায়। পরিশেষে পররাষ্ট্র সচিবকে বগলদাবা করে সটান বাড়ির দিকে হাওয়া। ভুলেও একবার আমার দিকে ফিরে চাইল না জেনে নিতে যে, পশ্চিমি পররাষ্ট্র সচিবদের কাজই শুধু পরের ব্যাপারে নাক গলানো। আর তাই করতে গেলে সাগর পারে না হোক, খেয়াপারে পাঠানো থেকে কেউ আর ওকে রক্ষা করতে পারবে না। কিন্তু কে শোনে আমার পেছু-ডাক? ততক্ষণে কেষ্টাকাকা দৃষ্টির বাইরে!

এরপর প্রায় এক সপ্তাহ কেটে গেছে, কেষ্টাকাকার টিকিরও সাক্ষাৎ নেই। প্রায় নিশ্চিন্ত হলাম এই ভেবে যে, এ যাত্রায় তাহলে দণ্ডকারণ্যে নির্বাসন-দণ্ড ওর মকুব! নিশ্চয় তাহলে কাকিমার মনস্তুষ্টি করতে পেরেছে ও! আহা, অনাথ অবলা জীব ওই কেষ্টাকাকা! কাকিমার রোষ দৃষ্টি থেকে রেহাই পেয়েছেন নিশ্চয়।

কিন্তু, হা হতোস্মি! আমার সব আশাই শেষকালে আশঙ্কায় পরিণত হলো! কাকিমার কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় ফেল করেছে চিনু! চিনুকে চিনতে পেরেছেন কাকিমা! সেই সঙ্গে কেষ্টাকাকাও ফেল! কাজে কাজেই আমিও ফেল! একেবারে ফেলের মড়ক লেগে গেছে যেন!

প্রথম দু'চার দিন নতুন বেড়াল দেখে বেশ প্রশ্রয় দিয়েছিলেন কাকিমা। একটুও মনে সন্দেহ জাগে নি তাঁর। কিন্তু হতভাগা চিনুই বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে পারেনি। আবার চুরি করে খেয়েছে মাছ আর দুধ। লাঠি নিয়ে তাড়া করতে গেলে ছুটে পালাতে গিয়ে হাবুডুবু খেয়েছে চৌবাচ্চার জলে।

কাছাকাছিই ছিলেন কেষ্টাকাকা, ছুটে তুলতে গেলেন চৌবাচ্চার জল থেকে। কিন্তু জলে ধুয়ে কোথায় সেই পররাষ্ট্র সচিব? জল থেকে উঠে এলো কেষ্টাকাকার হাতে সেই অকৃতজ্ঞ নিমকহারাম চিনু। বেড়াল-বাচ্চাকে আর বাঁচাতে পারলেন না কেষ্টাকাকা, চৌবাচ্চাই ওর কাল হলো!

এই বিরাট ষড়যন্ত্র এক মুহূর্তে ফাঁস হয়ে গেল কাকিমার কাছে। ফলে, আবার সেই বস্তা, আবার সেটা কাঁধে করে খেয়াপারের উদ্দেশে গৃহত্যাগ!

এবার কেষ্টাকাকার মাথায় একটি মাত্র সমস্যা—পাকা রং! চিনুকে বাঁচাবার একটিমাত্র উপায় আছে, পাকা রং। যে রং চৌবাচ্চার জলে ধুয়ে যায় না—সেই রং!

কিন্তু পাকা রং খুঁজতে গিয়ে কেষ্টাকাকা আর আমার দ্বারস্থ হলেন না, হলেন দোকানদারের দ্বারস্থ। আর তাইতে বিরাট একটা কাঁচা কাজই করে ফেললেন কেষ্টাকাকা!

হোলির পাকা রং চাই—আছে? দিন তো এক প্যাকেট! নগদ দেড়টি টাকা গুনে দিয়ে এক প্যাকেট পাকা রং কিনে নিলেন কেষ্টাকাকা। জলে উঠবে না, সাবানে ছুটবে না এই পাকা রং। খুশির আনন্দে বেড়ালটার পিঠেই তবলা বাজাতে বাজাতে উঠলেন গিয়ে এই হেবোর বাড়ি নয়, উঠলেন ওপাড়ার গবুদের বাড়ি। সেখানেই খুশিমতো হোলি খেললেন বেড়ালটার সঙ্গে। তারপর সেই হোলির রং তোলবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালালেন দুদিন ধরে। গ্র্যান্ড সাকসেস! বাজি মাৎ!! আনন্দে অধীর হয়ে সেই নতুন রং-করা বেড়ালটাকে নিয়ে নাচতে নাচতে ফিরলেন বাড়ি। সামনে কাকিমাকে দেখে হঠাৎ হকচকিয়ে গেলেন। তারপর আমতা-আমতা করে বললেন,—এই দেখো—এবার তোমার জন্যে কেমন এক নতুন বেড়াল এনেছি। এমন লক্ষ্মী এই বেড়াল যে, দুধ না, মাছ না, কিচ্ছু না। আমাদের দুটিকে পেলেই খুশি!

Table of Contents

আস্তে করে বেড়ালটাকে কাকিমার পায়ের কাছে নামিয়ে দিয়ে হাঁ করে চেয়ে রইলেন প্রত্যুত্তরের অপেক্ষায়।

কাকিমার চক্ষু তো ছানাবড়া! বেশ কিছুক্ষণ তাঁর মুখে 'রা' শব্দটি নেই। তারপর হাতের চেলাকাঠটি নিয়ে তাড়া করলেন বেড়ালকে আর কেষ্টাকাকাকে। চেলা অবিশ্যি কেষ্টাকাকার গায়ে লাগেনি, বেড়ালটার লেগেছিল নিশ্চয় কেন না, কেষ্টাকাকা ওকে খোঁড়াতে দেখেছেন অনেকক্ষণ।

বেশ কৌতূহলী হয়ে আমি প্রশ্ন করি কেষ্টাকাকাকে—তাই অবশেষে আমার শরণাপন্ন হলেন এবার?

—আরে না—না! শরণাপন্ন নয়। একটা হেঁয়ালির জবাব চাইতে এসেই তোর কাছে।

—হেঁয়ালি? কী হেঁয়ালি বলতো!

—দেখ্, সেবার তিনদিনেও তোর কাকিমা বুঝতে পারেনি ওর গায়ে রং লাগানো হয়েছে। কিন্তু, এবার...

—কী এবার?

—এবার সেই চৌবাচ্চা থেকে অনেক দূরে—রান্নাঘরের উনুনের ধারে, তিনদিন তো দূরের কথা—তিন ঘণ্টাও নয়, মাত্র তিন সেকেন্ড দেখেই কী করে বুঝতে পারলো, এটা লাগানো রং?

বলেই কাপড়ের খুঁট খুলে চট্‌পট্ বেড়ালটাকে বার করে আবার টেবিলের ওপরে রেখে দেন কেষ্টাকাকা। মুহূর্তে আমিও চিৎকার করে উঠি,—ও কেষ্টাকাকা, এ তুমি করেছ কি? সবুজ রঙয়ে চুবিয়ে এনেছ বেড়ালটাকে? বেড়াল কখন সবুজ হয়?

ফ্যাকাশে হয়ে গেল কেষ্টকাকার হাসিখুশি মুখ! একেবারে ভেঙে পড়েছেন কেষ্টাকাকা,—হেবো রে! দোকানদার আমাকে মোটেই ঠকায় নি! সত্যিই থাকা রং দিয়েছিল আমাকে! আরও ওঠানো যাবে না এ রং!

আশ্বাস দিয়ে আমি বলি কেষ্টাকাকাকে,—তুমি কিছু ভেবো না কেষ্টাকাকা! পাকা রংকে কাঁচিয়ে দেবো আমি। এই চললাম দোকানে। এক্ষুনি নিয়ে আসছি পাকা রংকে কাঁচা করবার মশলা। তারপর ভাবা যাবে, কি করে ওর নির্বাসন মকুব করে নেওয়া যায়।

Table of Contents

সাড়ে ছ'ইঞ্চির গপ্পো

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

ভুষুণ্ডির মাঠের নাম নিশ্চয়ই তোমরা শুনেছ, কিন্তু এটা সেই ভুষুণ্ডির মাঠ নয়, এটা হচ্ছে ভুষুণ্ডিয়া রোড। রোডটা যেখানে তেকোণা পার্কের সাথে মিশেছে, তার ঠিক এক স্টপ আগে সেই বিখ্যাত ঘটনাটা ঘটে গেল। বিখ্যাত না বলে কুখ্যাত বলাই ভালো।

না, একটুও বাড়িয়ে বলছি না। অমন একটা কেলেঙ্কারি ঘটনা যদি নিজের চোখে না দেখতাম, তাহলে আমিও বিশ্বাস করতাম না। কলকাতা শহরে এমন ঘটনা যে ঘটতে পারে ভাবাই যায় না। কলকাতা হচ্ছে পৃথিবীর দ্বিতীয় না তৃতীয় বৃহত্তম শহর। এই শহরের মধ্যেই সেই ভুষুণ্ডিয়া রোড। যেমন তার নাম তেমনি তার চেহারা। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছ, হয়তো দেখলে একটা ঘুঁটে সাটানো দেয়াল, আবার পাশেই একটা ম্যানহোল খোলা গর্ত। একটু এগোতে না এগোতেই হয়তো চোখে পড়বে মশা বিনবিন একটা ডোবা। ডোবার পরে বস্তি, ছাগল, গরু আর মানুষ একাকার। তারপরই হয়তো দেখলে বেওয়ারিশ বেশ খানিকটা খালি জায়গা, বুনো জঙ্গল। কোথাও আবার রাস্তার ওপরই ভাঙা ঠেলাগাড়ি পড়ে রয়েছে, কোথাও বা পুলিশের মতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা গরু দাঁড়িয়ে আছে রাস্তায়।

তা, এই হচ্ছে ভুষুণ্ডিয়া রোড। রাস্তার একপাশ দিয়ে বেহালার তারের মতো টানটান করে বাঁধা ইলেকট্রিকের লাইন। যার গায়ে লকেটের মতো খান কয়েক ঘুড়ি বারোমাসই ঝোলে। তা ছাড়া কাক চড়ুই তো আছেই, বসে বসে দোল খায়। সন্ধ্যায় লোডশেডিং না

Table of Contents

থাকলে ছোট ছোট ডুম বাতি জ্বলে ওঠে। একটা বালব খারাপ হয়েছে কি, ন'মাস ছ'মাসের আগে আর পালটাবার কারো গরজ থাকে না।

এ হেন ভুষুণ্ডিয়া রোডের অধিবাসীদের চোখে হঠাৎ একদিন একটা মজার ঘটনা ধরা পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সবাই চমকে উঠল, আই বাপ! মন্টিদের বাড়ির কাছেই লম্বা টিংটিংয়ে বাজে খাওয়া একটা শুকনো তাল গাছ ঝুঁকে পড়েছে। ইলেকট্রিক তার থেকে মাত্র ছ'সাত ইঞ্চি ওপরে দাঁড়িয়ে হেলে রয়েছে। সর্বনাশ! গাছটা তো যে কোন মুহূর্তে ধপাস্ করে তার-ফার ছিঁড়ে রাস্তায় পড়ে একটা বিপদ ঘটিয়ে বসতে পারে। তাই তো, কী করা যায়! গাছটাকে সরিয়ে না ফেললে তো কেলেঙ্কারি। কখন কার ঘাড়ে পড়বে কে বলতে পারে!

অনেকেই মজা দেখতে এগিয়ে এল। গাছটা একটা ডোবার ধার থেকে গজিয়ে উঠেছে, কার গাছ কেউ জানে না। এ অবস্থায় না জেনে শুনে গাছে হাত দেওয়া কি ঠিক হবে! যা সব দিনকাল!

বুড়ো মতো এক ভদ্রলোক বললেন,—না বাবা, গাছে হাত দিও না। আগে কাউন্সিলার দেবুবাবুকে জানাও। উনিই যা হোক একটা ব্যবস্থা করবেন।

হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক। দেবুবাবুকে খবর দেওয়াই ভাল। —সবাই সায় দেয় কথায়।

খবর যথাবিহিত দেওয়া হল। কিন্তু পাক্কা দিন পাঁচেক পরে হদ্দিশ মিলল দেবুবাবুর। সাত ভেজালের লোক। 'আসুন বসুন' বললেই তো এসে পড়তে পারেন না। তুমি আমি যদি কাউন্সিলার হতাম তাহলে পাগল হয়ে যেতাম।

যাই হোক, শেষতক দেবুবাবু এলেন গাড়ি করে। গাছটার চারপাশে একবার ঘুরলেন। টিপে-টুপে দেখলেন, বোধহয় গন্ধও শুঁকলেন। (অবশ্য গন্ধ শুঁকতে ওকে আমি চোখে দেখিনি, কারণ দেবুবাবুকে ঘিরে তখন এত ভিড়, যে কি হচ্ছে দেখারই উপায় ছিল না) একটুক্ষণ পরে দেবুবাবু আবার গাড়ি করেই চলে গেলেন। যাবার সময় অবশ্য একটা চিঠি লিখে দিয়ে গেলেন, চিঠিটা নিয়ে দেখা করতে হবে ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের অফিসে।

বেশ। সবাই ভাবল, এবার একটা হিল্লে হবে। সবার মুখেই হাসি ফুটল।

তারপর এক দিন গেল, দু'দিন গেল, তিন দিন যায়, কইরে বাবা, কোথায় ইলেকট্রিকঅলারা। কারোরই যে দেখা নেই। চিঠিটা দিয়েছিস্ তো?

—দেই নি মানে! সবাই গিয়ে হৈ হৈ করে দিয়ে এলাম।

—তবে আসছে না যে?

—আসবে, আসবে। এত বড় কলকাতা শহরটা ওরা সামাল দেয়, সময় হলেই আসবে।

সময় কি তাদের দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর হবে? —কে একজন দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলে উঠলেন।

—তাহলে যান না মশাই, আর একবার গিয়ে বলে আসুন।

তো বলে আসার আগেই সপ্তম দিনের মাথায় বাবুরা এলেন। জনা দুয়েক অফিসার, জনা চারেক সাকরেদ। তারা মই লাগিয়ে উপরে উঠে মাপজোক করে জানালেন, এখনো তার থেকে সাড়ে ছ'ইঞ্চি উপরে রয়েছে গাছটা। তার মানে এখনো যদি গাছটাকে সরিয়ে ফেলা যায়, তাহলে বিপদ থেকে বাঁচা যাবে।

—তাহলে গাছটা সরিয়ে ফেলুন।

অফিসার ভদ্রলোক অমায়িক হাসলেন,—গাছে আমরা হাত দেই কি করে! ওটা তো

Table of Contents

আমাদের গাছ নয়, কাজও নয়; আমাদের কাজ হচ্ছে ইলেকট্রিক তার ঠিক আছে কিনা, সাপ্লাই ঠিক আছে কিনা দেখা। ব্যস্।

—তাহলে কি গাছটা এভাবেই থাকবে?

—তা আমরা কি করব! আপনারা বরং দমকলকে ডাকুন, ওরা এসে চ্যাংদোলা করে গাছটাকে তুলে নিয়ে যাবে। আচ্ছা নমস্কার, আমরা চলি।

বিদায় নিলেন ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের লোকেরা।

—আচ্ছা ঝামেলা হল দেখছি।

—কেন, ঝামেলা কেন? দমকলকেই একবার ডেকে দেখা যাক না।

—বেশ, তাই হোক। ওহে দমকলকে একটা ফোন কর না, ওরা তো ন'মাস ছ'মাস পর আসবে না। ফোন পেলেই চলে আসবে। ডাকো না।

দমকলে ফোন গেল। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে সত্যিই ঢং ঢং ঢং ঢং দমকলের ঘণ্টা শোনা গেল। বিরাট বিরাট চারটে গাড়ি, কোনোটা আট চাকার, কোনোটা দশ চাকার, আকাশ ছোঁয়া ক্রেন, কুড়ি পঁচিশ জন পোশাক পরা লোক গাড়ি থামতে না থামতেই মোটা একটা পাইপ নিয়ে নেমে পড়ল লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে। তারপর এদিক ওদিক গেরিলা ফাইটারদের মতো ডাকতে লাগল, কৈ, আগুন কোথায়? গন্ধ শুঁকতে লাগল, না, ধোঁয়ার গন্ধ তো পাওয়া যাচ্ছে না।

দমকলঅলাদের আগুন লাগে নি কথাটা বোঝাতেই হিমসিম খেতে হল সবাইকে।

আগুন লাগে নি শুনেই আবার তারা ফিরে যাবার জন্য ঝপাঝপ গাড়িতে উঠে পড়ল। এমন সময় অনেক কষ্ট কসরত করে তাদের গাছটার দিকে নজর ফেরানো গেল, —ও দাদা আমাদের বাঁচান, দেখছেন না গাছটা পড়ে গেলে আমরা মরব যে।

তাল গাছটাকে ওরা ভালো করে দেখল। তারপর বলল,—দেখুন মশাই গাছটাকে আমরা কেটে সরিয়ে দিতে পারি, কিন্তু এ গাছ কাটব কি করে বলুন?

—কেন, দা কাটারি আনেন নি বুঝি?

—না না, সে কথা নয়। দা কাটারি ছাড়া এ শর্মারা চলে না। সে কথা নয়, কথা হচ্ছে গাছটার গোড়ার দিকে দেখুন।

—দেখলাম।

—কি দেখছেন? গাছটা একটা জমির ওপর দাঁড়িয়ে আছে না?

—যাব্-বাবা, বলে কি এরা, গাছ মাটির ওপর গজাবে না তো হাওয়ার ওপর গজাবে নাকি! কি বলতে চায়।

—বুঝতে পারলেন না! আচ্ছা এই জমির মালিক কে? তাকে ধরে আনুন। তিনি যদি বলেন, এখনি আমরা গাছটা কেটে ফেলে দিই।

কে যে মালিক, তা কি ছাই জানা আছে! তাহলে তো এত দিনে আমরাই উড়িয়ে দিতে পারতাম গাছটাকে, তাহলে আর তোমাদের ডাকব কেন! যত্ত সব...

তাই বলি,—ওরা আবার বোঝাল ঃ এক কাজ করুন, কর্পোরেশনকে জানান। ওরাই এর বিহিত করে দেবে। উপদেশ দিতে দিতে ওরা ঢং ঢং ঢং ঢং করে গাড়ি চালিয়ে চোখের বাইরে মিলিয়ে গেল।

—এবার কি হবে মশাই?

—কি আর হবে, ডাকুন কর্পোরেশনকে। ওরা যদি কিছু করে দেয়, দেখা যাক।

Table of Contents

—বেশ। ডাকা হোক।

লোক ছুটল কর্পোরেশন অফিসে। পরদিন দুটো লাল পাগড়ি এসে হাজির।

হ্যাঁ বাপধনরা, তোমরা কোত্থেকে উদয় হলে? —এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক আলাপ জমিয়ে বসল পুলিশ দুটোর সঙ্গে। আলাপে সালাপে ভদ্রলোক বুঝলেন, তা হল এই ঃ থানার দারোগা পাঠিয়েছেন ওদের গাছটাকে পাহারা দেবার জন্য।

—কেন? গাছটা পড়ে যাওয়ার সময় কি ক্যাচ লুফবে নাকি?

—না হে না, সে সব নয়, গাছটাকে পাহারা দেবে। পাছে এই গাছ নিয়ে কোনো গণ্ডগোল হয়, অশান্তি হয়। তাই শান্তি বজায় রাখার জন্য ওরা এসেছে। থানার বড়বাবু আগে ভাগে ওদের পাঠিয়ে দিয়েছেন।

—অ। থানার বড়বাবু বলে কথা।

—তা তো বুঝলাম, কিন্তু কর্পোরেশনঅলারা গেল কোথায়, ওদের কোন সাড়া নেই যে। নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছে নাকি সব!

—আরে, ওরাই তো গণ্ডগোল এড়াবার জন্য থানায় যোগাযোগ করে পুলিশ পাঠিয়েছে। গাছটাকে নিয়ে নিশ্চয়ই কিছু ভাবছে ওরা, ওদের আর দায়িত্ব নেই নাকি?

—তা থাকবে না কেন, কিন্তু...

দেখতে দেখতে আরো বেশ কয়েক দিন পার হয়ে গেল। কর্পোরেশনের টিকিও দেখা গেল না। গাছটা ইলেকট্রিক তার থেকে এখনো সাড়ে ছ'ইঞ্চি তফাতে রয়েছে, না আরো নিচে নেমে এসেছে বোঝার উপায় নেই। বিপদ যে কোন মুহূর্তেই হতে পারে তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু কি আর করা যাবে, কপালে এখন যা আছে তাই হবে। দিন গুনতে থাকে সবাই। সকালে বিকালে পথচারীরা ঘাড় উঁচু করে নজর রাখে। সাড়ে ছ'ইঞ্চি থেকে কতটা আরো নেমে এল বোঝার চেষ্টা করে।

আরো দিন সাতেক ওই ভাবেই কেটে গেল। শেষটায় ঠিক একুশ দিনের মাথায় সেই কুখ্যাত ঘটনাটা ঘটে গেল। গাছটা তার-ফার জড়িয়ে মড় মড় মড়াৎ করে ভুষুণ্ডিয়া রোডের ওপর ভেঙে পড়ল। কপাল ভালো, সেই সময় গাছটার ধারে কাছে কোন গাড়ি ঘোড়া বা মানুষ জন ছিল না। কেবল একটা কুকুর ঠিক সেই সময়ই রাস্তা পার হতে যাচ্ছিল, পড়বি তো পড়, গাছটা ওর গায়ের ওপরই পড়ল। কুকুর বেচারা চিড়ে চ্যাপটা হয়ে গেল।

পাহারাদার পুলিশ দুটো খইনি টিপতে টিপতে হাঁ করে দৃশ্যটা দেখল।

খবরটা ছড়িয়ে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে। ভিড় জমে গেল রাস্তায়। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই আবার ছুটে এলো দমকল, এলো ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের লোকেরা, কাউন্সিলার দেবুবাবু, কর্পোরেশনের লোকেরা।

তারপর চলল নানারকম লেখালিখি।

দেবুবাবুর নির্দেশে ধাঙড়রা এসে থেতলানো কুকুরটাকে তুলে নিয়ে চলে গেল। দমকলের লোকেরা গাছটাকে কেটে কুটে রাস্তা সাফ করে দিয়ে গেল। ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের লোকেরা ছেঁড়া তার আবার জোড়া লাগাতে নেমে পড়ল।

দিন দুয়েকের মধ্যেই আবার সব স্বাভাবিক। ভুষুণ্ডিয়া রোডের মানুষও হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

Table of Contents

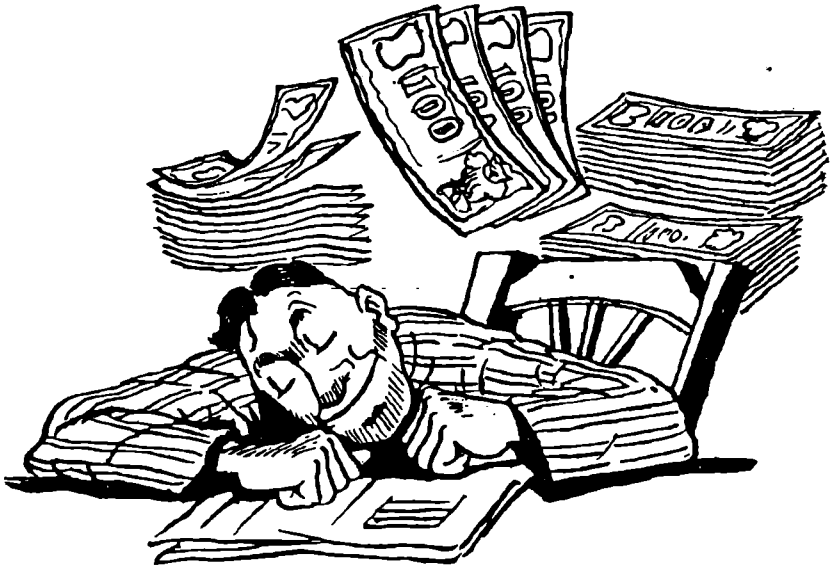

ভাগ্যে যদি সয়!

রবিদাস সাহারায়

কার ভাগ্য কখন সুপ্রসন্ন হবে কে জানে! পথের ফকির—সে-ও রাজা হয়। গরীব লোকও রাতারাতি বড়লোক হয়ে যায়। বেশি দূর যাবার দরকার নেই। ঘুঘুডাঙার ফটিক গড়াইয়ের কথাই ধরা যাক না। পচা চিংড়ি কেনারও পয়সা জুটতো না তার। সে কিনা মামার সম্পত্তি পেয়ে হঠাৎ বড়লোক হয়ে গেল। এখন সবার নাকের ডগার ওপর দিয়ে রুই মাছ, ইলিশ মাছ কিনে নিয়ে যায়।

তা দেখে হিংসায় কি কম জ্বলে গদাই নস্কর আর মানিক পাকড়াশী! কিন্তু তাদের তিনকুলেও কোন মালদার মামা নেই, বে-ওয়ারিশ সম্পত্তি পাওয়ারও কোন সম্ভাবনা নেই। কাজেই অন্য পথ দেখতে হয় তাদের। প্রতি মাসেই নিয়মিতভাবে তারা লটারির টিকিট কেনে।

একবার একটা টিকিট লাগলে হয়। তখন ফটিক গড়াইকে তারা একহাত দেখিয়ে দেবে।

কিন্তু গদাই নস্কর আর মানিক পাকড়াশীর যাকে বলে পাথরচাপা কপাল। মাসের পর মাস চলে যায়, চলে যায় বছরের পর বছর, বেড়ালের ভাগ্যে শিকে আর ছেঁড়ে না—লটারিতে প্রাইজ আর ওঠে না।

একদিন এক জ্যোতিষীর কাছে হাত দেখালো গদাই। জ্যোতিষী ঘুরিয়ে ফিরিয়ে হাতটা দেখে, আঙুলের ডগাগুলো বারংবার ঘষে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি লটারির টিকিট কেনেন?

Table of Contents

গদাই জবাব দিল,—হ্যাঁ কিনি।

হ্যাঁ, কিনে যাবেন। —জ্যোতিষী আশ্বাস দিলেন ঃ আপনার অর্থপ্রাপ্তি যোগ আছে।

—অনেক দিন ধরেই তো কিনছি। আর কতদিন কিনব?

—আর বেশি দিন নয়। শিগগিরই টাকা পেয়ে যাবেন।

অ্যাঁ! —লাফিয়ে ওঠে গদাই। তার ইচ্ছা হয় সেই দণ্ডে বাড়ি গিয়ে খবরটা ঢাকঢোল পিটিয়ে বাড়ির সবাইকে বলে।

আর কি আশ্চর্য যোগাযোগ!

মানিক পাকড়াশী তারিণী কবিরাজের দোকানে গিয়েছিল হজমের বড়ি কিনতে। সেখানে পঞ্জিকাটা খুলে রাশিফলের পাতাটা দেখতে দেখতে তার চক্ষুস্থির। এ কি সে সত্যি দেখছে? নিজের চোখকেই যে বিশ্বাস করা যায় না! দু চোখ রগড়ে নিল মানিক পাকড়াশী। আবার পড়ল। না, এই তো পরিষ্কার লেখা রয়েছে যে, বৃশ্চিকরাশির লটারিতে সুনিশ্চিত অর্থপ্রাপ্তি।

আনন্দে লাফিয়ে উঠল মানিক, আর সেই লাফেই পঞ্জিকাসুদ্ধ রাস্তায়।

বৃদ্ধ কবিরাজ ভাঙা চশমার ফাঁক দিয়ে ব্যাপারটা দেখে প্রথমটা একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর জোরে হেঁকে উঠলেন, অ মশয়! পাঁজি লইয়া যান কই?

ওঃ, পাঁজি! —মানিক ফিরে এসে পঞ্জিকা ফেলে আবার দে ছুট।

আরে পয়সা দিবেন না? —তারিণী কবিরাজ তারস্বরে বলে ওঠেন। আচ্ছা গেরো তো! মনে মনে তারিণীর মস্তক চর্বণ করতে করতে মানিক পাকড়াশী দোকানে উঠে পকেট থেকে 'এই নিন, গিলুন!' বলে পয়সা ছুড়ে ফেলেই মারলো দৌড়।

কাছাকাছি বাড়ি গদাই নস্কর আর মানিক পাকড়শীর। এ পাড়া ও পাড়া। দুজনেই প্রায় প্রৌঢ় হতে চলেছে। তবু কচিকাঁচা চৌকস বুদ্ধিতে এখনো টইটম্বর।

লটারির টিকিট আগে তারা কিনে নোটবইয়ের ভিতর লুকিয়ে রাখতো, এখন আর তা রাখে না। রাস্তায় ট্রাকে বাসে নোটবই পকেটমার হতে কতক্ষণ! তাই বাড়িতে নির্দিষ্ট একটি জায়গায় রেখে দেয়। হয় আলমারির কাগজের তলায় আর না হয় টেবিলের ড্রয়ারে।

খবরের কাগজে লটারির ফল বের হলেই টিকিট বের করে মিলিয়ে দেখে। ছেলেমেয়ের দলও ঝুঁকে পড়ে বাবার সাথে।

প্রথমে উৎসাহে দীপ্ত দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হয় প্রথম পুরস্কারের লাইনে। সেই সঙ্গে তির্যক দৃষ্টিপাত দ্বিতীয়-তৃতীয় পুরস্কারের লাইনেও। সেখানে উৎসাহজনক কিছু না পাওয়ার পর উদ্যমটা যেন দমে যায়। তারপর অন্যান্য ক্ষুদে প্রাইজগুলোর দিকে একটু দায়সারাগোছের চোখ বুলিয়ে একটা সুনিশ্চিত দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে আসে বুক থেকে। প্রাইজ না পাওয়ার চেয়েও একটা টাকা নষ্ট হওয়ার শোকটা যেন বেশি করে তখন বুকে বাজে। যে টিকিটটা এক মাস ধরে সযত্নে রক্ষা পেয়ে আসছিল, তা এক মুহূর্তেই দলিতমথিত হয়ে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়।

কখনও বা ছোট ছেলে বা মেয়ে সেটা নিয়ে কিছুক্ষণ খেলা করে, তারপর কোথায় হারিয়ে যায়।

দুই বাড়িতেই এক দৃশ্য।

দু বাড়িতেই লটারির টিকিট নিয়ে স্বপ্ন-পুরী রচনার অন্ত নেই।

মেজো মেয়ে বলে,—লটারিতে টাকা পেলে একটা বাড়ি করবে, বাবা।

Table of Contents

ছোট ছেলে বলে,—একটা গাড়ি কিনবে।

ফোড়ন কেটে ওঠে বড় মেয়ে,—ইস্, রাম না হতেই রামায়ণ! রথ নেই তো রথের দড়ি!

পুঁচকে মেয়েটা বলে,—পুজোর ছময় আমাকে একতাও বেলুন কিনে দাওনি। এবার একশোতা বেলুন কিনবো।

হো হো করে হেসে ওঠে সকলে।

আবার কিছুদিন পরে নতুন করে শুরু হয় জল্পনা-কল্পনা। এবং দু বাড়িতেই।

মন্দ লাগে না। তবু তো একটা আনন্দ নিয়ে থাকা যায়। কি বলো নস্কর? দুঃখ তো রোজই লেগে আছে.—বলতে বলতে একটু হাসার চেষ্টা করে মানিক পাকড়াশী।

গেল মাসে নাকি বৈঠকখানা বাজারের এক আলুওলা পেয়েছে তিন লাখ টাকা। —গদাই নস্কর স্থানীয় সংবাদটি জানান।

তাই নাকি? —মানিক পাকড়াশী নড়েচড়ে বসেন।

—হ্যাঁ। কোথাকার এক ঠেলাওলাও নাকি পেয়েছিল এক লাখ টাকা। কিন্তু ঠেলা সামলাতে পারল না বেচারা। খবরটা শুনেই হার্টফেল!

—ইস্, দুনিয়াটা যে কী! ওরকম উইক হার্টের লোককে প্রাইজ দেওয়া কেন বাপু!

এমনি করে দিন যায়, মাস যায়।

লটারির খেলার তারিখটা কিন্তু মনে থাকে ঠিক। সেই দিনটায় বুক চিপ চিপ করে—যেন ছটফট করে। প্রত্যেকেই রাত্রিবেলায় ভাবে, পরদিন সকালেই তার লাখপতি হওয়ার খবরটা কাগজে বেরুবে।

কিন্তু বেরোয় না। ফসকে যায়।

আর ফটিক গড়াইয়ের ওপর হিংসেটা দিন দিন বাড়তে থাকে। ওর মত মালদার মামা যদি থাকতো!

জামতাড়াতে যদু সোমের
এক যে ছিল মামা,
টাকা ছিল ধামা ধামা
গায় ছিল না জামা।

ছোটবেলায় পড়া ছড়াগুলো এখন মাথায় চাড়া দিয়ে ওঠে। ইস্, ঐ ধরনের মামাগুলো কেন যে আমাদের ভাগ্যে জোটে না!

আপসোস করে গদাই নস্কর আর মানিক পাকড়াশী।

তারপর সেদিন হঠাৎ অঘটন ঘটলো।

খবরের কাগজে বেরিয়েছে লটারির ফলাফল।

টিকিটটা তাড়াতাড়ি বের করে এনে মেলাতে বসে মানিক পাকড়াশী। ছেলেমেয়েরা কেউ আর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে না। প্রতি মাসে হুমড়ি খেয়ে খেয়ে এখন তাদের উৎসাহ দমে গেছে।

প্রথম পুরস্কারের তালিকায় আলগোছে চোখ বুলিয়ে অতঃপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলল মানিক পাকড়াশী ঃ না ওখানে নেই। এরপর দ্বিতীয় পুরস্কার। দ্বিতীয় পুরস্কারের টিকিটটার

Table of Contents

নম্বর দেখেই চমকে ওঠে সে। মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠলো। পরক্ষণেই সে চিৎকার করে ওঠে আনন্দে—পেয়েছি! পেয়েছি লাখ টাকা!

ছেলেমেয়েদের দল ছুটে আসে আশপাশ থেকে। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে পাকড়াশী গিন্নি।

মানিক পাকড়াশীর গা তখন কাঁপছে। হাতে তার লটারির টিকিটটা।

বড় ছেলে বললো,—দেখি, দেখি!

বাবার হাত থেকে টিকিটটা নিয়ে মেলাতে লাগলো খবরের কাগজের ফলাফলের সঙ্গে। চোখের দৃষ্টিটা দিশেহারার মত ঘুরছে। মানিক বললো,—ঐ তো, সেকেন্ড প্রাইজ! দ্যাখ্, মিলে গেছে!

হ্যাঁ, তাই তো! তাই তো! —বড় মেয়ে দাদার পেছন থেকে আনন্দে চিৎকার করে উঠলো।

এবার কিস্তি মাৎ!

মানিক পাকড়শী এবার বড়লোক। এক লাখ টাকার মালিক। সত্যি সত্যি সে এবার লাখপতি!

কিন্তু পাকড়াশী যেন মুষড়ে পড়ছে। কি হলো তার? সেই ঠেলাওয়ালার কথা কি মনে পড়েছে? সে-ও হার্টফেল করবে নাকি?

মেজো মেয়ে পুঁটু ছুটে গেল গদাই নস্করের বাড়িতে। বিপদে-আপদে সে-ই তো বাবার বন্ধু। বাড়ির সবাই সে কথা জানে।

—কাকাবাবু আসুন! বাবা যেন কেমন করছে।

গদাই নস্কর তখন খবরের কাগজে নিজের লটারির টিকিট মেলাচ্ছিল। মেলানো অবশ্য একবার হয়ে গেছে, তবু আরেকবার চোখ বোলাচ্ছিল কাগজের ওপর। নাঃ তার ভাগ্যে কোন প্রাইজ ওঠেনি। পুঁটুর ডাক শুনে বললো,—কেন, কি হয়েছে তোর বাবার?

বাবা লটারিতে টাকা পেয়েছে, তাই—

অ্যাঁ, পেয়েছে নাকি? —পুঁটুর মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে লাফিয়ে ওঠে গদাই নস্কর ঃ কোন্ প্রাইজ?

—সেকেন্ড প্রাইজ!

—অ্যাঁ, একলাখ টাকা!

—হ্যাঁ, তারপর থেকেই বাবা যেন কেমন করছে।

গদাই নস্কর ছুটে এল মানিক পাকড়াশীর বাড়ি। ঘরে ঢুকেই বললো,—কি হে পাকড়াশী, এবার সত্যিই লাখ টাকা পাকড়াও করলে?

ততক্ষণে মানিক পাকড়াশী বিছানায় শুয়ে পড়েছে, অবশ্য সামলে নিয়েছে কিছুটা। ক্ষীণ হেসে বললো,—হ্যাঁ। তুমি নিজে একবার মেলাও তো, ভাই।

অতি যত্নে টিকিটটা রেখে দেওয়া হয়েছিল, বের করে দেওয়া হলো। গদাই নস্কর মিলিয়ে দেখলো, সত্যিই একলাখ টাকা উঠেছে মানিকের ভাগ্যে। ভাগ্যবান বটে! লাকি ম্যান।

বাড়িতে ফিরে গিয়ে নিজের টিকিটটাকে কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলে গদাই নস্কর। তার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে যেন ঐ টিকিটটার ওপর।

সেদিন বিকেলে মানিক পাকড়াশীর বাড়িতে কি হৈ-হল্লোড়! ছেলেমেয়ে মা সবাই মিলে কত কি জল্পনা-কল্পনা! মানিক পাকড়াশীও আছে তাদের সঙ্গে।

Table of Contents

কোথায় বাড়ি করবে, তাই নিয়ে গোলমাল। জায়গা কিনে বাড়ি করবে, না তৈরি বাড়ি কিনবে, তাই নিয়ে দু'বার মতের মিল হয় তো চারবার অমিল হয়।

ছেলেমেয়েরা কে কি কিনবে, তাই নিয়েও ঘণ্টার পর ঘণ্টা তর্ক। শুধু তর্ক নয়,—ঝগড়া, তারপর মারামারি। তাদের মা অবশ্য এক'কথার মানুষ। নিজের গয়নার দিকে নজরটাই তার আগাগোড়া।

পরদিন সকালবেলা খবরের কাগজ পড়ছে মানিক পাকড়াশীর বড় ছেলে। হঠাৎ একটা খবর দেখে সে চমকে উঠলো। বললো, বাবা, দেখো দেখো, লটারির টিকিট সম্বন্ধে কি লিখেছে। কাল নাকি দ্বিতীয় পুরস্কারের টিকিটের নম্বরটা ভুল ছাপা হয়েছিল!

অ্যাঁ! —বুকে যেন শেল বেঁধে মানিক পাকড়াশীর। তাড়াতাড়ি খবরের কাগজটা টেনে নেয় সে। নিশ্বাস পড়ছে না, চোখের পলক পড়ছে না—মানিক পাকড়াশী দেখলো, তারই টিকিটের নম্বরের ভুল সংশোধন। গতকাল যে নম্বরটা ছাপা হয়েছে সেটা ভুল।

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে মানিক পাকড়াশী।

এদিকে গদাই নস্করেরও চোখে পড়েছে টিকিটের খবরটায়। দেখে সে চমকে উঠেছে। আরে! এ যে তারই টিকিটের নম্বর! নির্ঘাত তারই টিকিট! হুবহু যেন নম্বরটা মিলে যাচ্ছে।

কিন্তু কোথায় সে টিকিট? কাল তো নিজের হাতেই কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলেছে! সে ধমকাতে শুরু করলো ছেলেমেয়েদের, ওরে টিকিটের টুকরোগুলো দেখেছিস?

না, দেখিনি তো! —সবারই মুখে এক উত্তর।

গলার স্বর আরও সপ্তমে উঠলো গদাই নস্করের, দেখিস নি? খেয়েছিস তো পেট পুরে? ঘরে কোথায় কি খাবার জিনিস আছে, তার খোঁজ তো রাখিস খুব। আর ঐ জিনিসটা দেখলি না?

মেজো মেয়ে বললো,—দিদি হয়তো ঝাড়ু দিয়ে ফেলে দিয়েছে।

বড় মেয়ে অমনি ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো,—আমি কাগজের কোন টুকরোই ঘরে দেখিনি।

তবে কোথায় গেল টিকিটের টুকরোগুলো? —গদাই লাফায় আর চেঁচায় ঃ ভাতের সঙ্গে কি ওগুলোও হজম করে ফেললি? ওগুলো পেলেও তো জোড়া লাগিয়ে নেওয়া যেত। এমনি করে কি লাখ টাকা যাবে আমার?

স্ত্রী বললো,—ওদের দোষ কি? তা ছাড়া নম্বর মিলেছে কিনা তাই বা কি করে বলছো? লিখে রেখেছো নম্বর?

না লিখে রাখি নি, মনে রেখেছি। হয়েছে তো? —গদাই গর্জে ওঠে।

শুরু হয় খোঁজাখুঁজি—ঘর তোলপাড়!

ওদিকে তখন মানিক পাকড়াশীর মাথায় আইস ব্যাগ চাপানো হচ্ছে। আর এদিকে গদাই নস্কর তার ঘরের বাইরে বসে আছে লটবহরের ওপর। ঘরের সমস্ত মালপত্র তখন বাইরে আনা হচ্ছে আর গরু-খোঁজার মত খোঁজা হচ্ছে সেই ছেঁড়া টিকিটটা।

Table of Contents

গরু একটি উপকারী জন্তু

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

কত লোকের কত বিচিত্র রকম হবি থাকে। যেমন, ডেয়ো পিঁপড়ে পোষা, নানা ধরনের প্রাণীর লেজ সংগ্রহ করা, বাড়ির মধ্যে গঙ্গা ফড়িঙের চাষ করা ইত্যাদি।

ত্রিলোচন বকসির হবি হচ্ছে মানুষের উপকার করা। এই হবিটি ত্রিলোচন উত্তরাধিকার সূত্রে তার বাবা পঞ্চানন বকসির কাছ থেকে পেয়েছে।

ছোটবেলার রচনা বইতে সে পড়েছিল গরু একটি উপকারী জন্তু। সেই থেকে গরুকেই আদর্শ করে রেখেছে ত্রিলোচন।

ত্রিলোচন বকসির বাবা পঞ্চানন বলেছিলেন,—বাবা লোচন, উপকারের পথ খুব ঘোরালো এটা সর্বদা মনে রাখবে। যার একবার উপকার করবে সঙ্গে সঙ্গেই সে তোমার মক্কেল হয়ে যাবে। প্রত্যাশা তাদের এমন বেড়ে যাবে যে একবার দু'বার উপকার করলে হবে না, চিরকাল উপকার করে যেতে হবে। এ বড় কঠোর ব্রত বাবাজীবন। বিদ্যাসাগরও শেষ রক্ষা করতে পারেন নি। 'ধুত্তোর' বলে কলকাতা থেকে পালিয়ে কারমাটার-এ চলে গিয়েছিলেন।

মানুষের উপকার করা আবার যার তার ভাগ্যে হয় না। উপকার করতে গিয়ে নানা বিপত্তি আসে। এই বিপত্তিগুলোকে আমল দিলে চলবে না। অনেক সময় যাকে উপকার করতে যাচ্ছি, সে তোমার ওপর ক্ষেপে যাবে। হয়তো তোমাকে কামড়াতেও যাবে। কিন্তু তাও উপকার করে যেতে হবে।

ত্রিলোচন চিরকাল পিতৃভক্ত, পিতৃ আজ্ঞা শিরোধার্য। তবু সে জিজ্ঞাসা করেছিল, —মানুষের উপকার করে কি হবে বাবা?

Table of Contents

পঞ্চানন জবাব দিয়েছিলেন,—এ একটা হবি। তাস খেলে কি উপকার হয়?

আনন্দ, চরম-আনন্দ।

এই যে দেখছ ও পাড়ার খেঁদুবাবু ওই কুকুরটাকে বকলসে বেঁধে কেমন মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, ওই কুকুরটা ছোট বেলায় সর্দিজ্বর হয়ে মরে যাচ্ছিল। আমিই ভেটেরিনারি ডাক্তার পশুপতিবাবুকে ডেকে এনে চিকিৎসা না করালে কুকুরটা তখনই অক্কা পেয়ে যেত।

আর পশুপতিবাবু কখনই সেই ট্যাংরা থেকে গর্চায় ছুটে আসতেন না যদি না তাঁর মেয়ের গানের মাস্টার ঠিক করে দিতাম।

আবার মেয়ের গানের মাস্টারও কিছুতেই নতুন টিউশনি নিতে রাজি হতেন না, যদি তাঁকে ওস্তাদ আবোলতাবোল খাঁর বিখ্যাত হারমোনিয়মটা জলের দামে কিনে না দিতাম।

আসলে পরোপকার ব্যাপারটি হল একটি চক্র। ধাপে ধাপে এগুতে হয়। একদিন আসবে যেদিন তুমি দেখবে তোমার সামনে যারা ঘুরে বেড়াচ্ছে, সবাই তোমার দ্বারা উপকৃত।

সেই থেকে ত্রিলোচন পরোপকারকেই জীবনের হবি করে নিয়েছে।

কিন্তু দু'বছর ধরে চেষ্টা করেও সে এমন একজনকে খুঁজে পাচ্ছে না, যার উপকার দরকার।

ত্রিলোচন এখনও চাকরি বাকরি কিছু পায়নি। যাকে বলে শিক্ষিত বেকার।

কিন্তু চাকরি পাওয়ার চেয়েও সে যে কারো উপকার করতে পারছে না, এই দুঃখটাই তার লাগছে বেশি করে।

কিভাবে লোকের উপকার করাটা শুরু করা যায়, সেটাই ভেবে পাচ্ছে না ত্রিলোচন।

সে স্কুলের বইতে পড়েছিল চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম। অর্থাৎ উপকার যদি শুরু করতে হয় তাহলে বাড়ি থেকেই শুরু করা দরকার।

এমন সময় একটা সুযোগ এসে গেল।

ত্রিলোচনের মামাতো বোনের বিয়ে। মামা এসে নেমন্তন্ন করে গেলেন। ত্রিলোচন বললো,—মামাবাবু, আপনার যদি কোনো উপকারে লাগতে পারি তাহলে বলবেন।

মামা বললেন,—এখন তো বিয়ে থা দেওয়া মোটেই ঝামেলার ব্যাপার নয়। টেলিফোনেই সব হয়ে যাচ্ছে। এই দ্যাখো না, বিয়ের ঠিক হতেই টেলিফোন করলুম, বাড়িতে ক্যাটারার এসে অর্ডার নিয়ে গেল। এক একটা মাছের দাগা দেবে চড়ুই পাখির সাইজের। আইসক্রিমে পেস্তার গন্ধ ভুর ভুর করবে।

তাহলে আমার কোনও উপকার করার নেই? —ত্রিলোচন কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল।

—তুমি শুধু খেয়ে উপকার করবে। তবে ঠিক সময়ে আসবে কিন্তু। কাজের বাড়ি স্ট্যান্ডবাই থাকা ভাল।

ত্রিলোচনের মন খারাপ হয়ে গেল। বিয়েতে উপকার করার কিছুই নেই?

বিয়ের দিন ত্রিলোচন শুধু তক্কে তক্কে আছে।

একটু বেশি রাতে বিয়ে। বর আসবে বেলঘরিয়া থেকে। বিয়ে বাড়ি সল্টলেকে। মামাবাবু বরপক্ষকে বলে দিয়েছিলেন, আটটার মধ্যে চলে আসবেন। বর এলে আমরা নিশ্চিন্তি। বরযাত্রীরা খেয়ে-দেয়ে সামনের পার্কের ফুরফুরে হাওয়ায় ঘুরে বেড়াবেন। বর বাবাজীও বিয়ের আগে একটু গড়িয়ে নিতে পারেন।

কিন্তু কন্যাযাত্রীরা সব এসে গেল। দু'ব্যাচের খাওয়া-দাওয়াও সারা। বরযাত্রী বা বর কারোরই দেখা নেই।

Table of Contents

খোঁজ নিয়ে মামাবাবু জানলেন, ডানলপ ব্রিজে সাংঘাতিক ট্রাফিক জ্যাম। ছেলের বাড়ি যতবার ফোন করেছেন পোঁ-পোঁ করে এনগেজড আওয়াজ বেরিয়েছে।

মামাবাবুর ব্লাডপ্রেসারের ধাত। ন'টা বাজল, তবু বর এল না দেখে বললেন,—আমি একটু শুয়ে পড়ছি। যদি একটু বরফ থাকে তো মাথায় চাপাও।

ত্রিলোচন গিয়ে বললো,—মামা, আমি একবার দেখে আসব?

—তুই কোথায় যাবি?

—ওই জ্যামে!... ডানলপ ব্রিজে চলে যাই। যদি দেখি বর আটকা পড়ে আছে, তো আমি এই স্কুটারের পিছনে চাপিয়ে বরকে তুলে নিয়ে আসব।

—তুই কোন্ গাড়ি চিনতে পারবি?

—বরকে তো আমি দেখেছি। নাম সঞ্জয় চক্রবর্তী—তাই তো? গোঁফ আছে। বড় বড় চুল।... ও আমি ঠিক খুঁজে বার করবো।

ত্রিলোচন তো ভীষণ খুশি। সে আজ উপকার করার মত মোক্ষম বস্তু পেয়েছে। খোদ বরকেই তুলে আনছে।

ত্রিলোচন তার স্কুটার হাঁকিয়ে সোজা শ্যামবাজার হয়ে বি. টি. রোডে পড়ল। কিন্তু এই পথে কোন বরের গাড়ি চোখে পড়ল না। তবে চিড়িয়ার মোড়ে গিয়ে দেখল একটি বরের গাড়ি রাস্তার পাশে পার্ক করা। গাড়ির চাকা ফেঁসে গেছে।

ত্রিলোচন এগিয়ে এসে বললো,—আপনি কোথায় বিয়ে করতে যাচ্ছেন?

বর কটমট করে তাকিয়ে বললো,—যেখানেই যাই, তাতে আপনার কি মশাই?

ত্রিলোচনের রাগলে চলবে না। কারণ সে মানুষের উপকার করতে চলেছে।

ত্রিলোচন কাঁচু-মাচু হয়ে বললো,—কিছু মনে করবেন না স্যার। আমাদের বর আটকে আছে কিনা, আমি খুঁজতে বেরিয়েছি।

বর বললো,—আপনি কোথা থেকে আসছেন?

—সল্টলেক। বিসি ব্লক।

সঙ্গে সঙ্গে বরের বন্ধু বললো,—আরে, ভগবান আপনাকে মিলিয়ে দিয়েছেন। ইনিই তো আপনাদের বর।

বর বেচারা কি বলতে যাচ্ছিল। তাকে আড়ালে ডেকে বরের বন্ধু কানে কানে কি যেন বলল। তারপর ত্রিলোচনের দিকে তাকিয়ে বললো,—হ্যাঁ ভাই। নিজের মুখে কোন লজ্জায় আর পরিচয় দিই। আমাদের বরযাত্রীর গাড়ি জ্যামে আটকে আছে। আমরা একটু হেঁটে সিঁথির মোড় থেকে এই ট্যাকসিটা ধরলাম, এটার চাকাও ফেঁসে গেল। একটা ট্যাকসিও পাচ্ছি না। ভাগ্যিস আপনি এসেছেন।

ত্রিলোচন বললো,—আপনি কিচ্ছু ভাববেন না। এরকম হয়েই থাকে।

তা আমি আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি। আপনি আমার স্কুটারের পিছনে উঠে পড়ুন।

বরের সঙ্গে বরের বন্ধুর কানে কানে আবার কি কথা হল। তারপর বর বললো,—চলুন।

স্কুটারের পিছনে বর বসে। ত্রিলোচন বললো,—আজ এক দারুণ অভিজ্ঞতা হল স্যার। স্যার, আপনি তো আমার মামাতো বোনের স্বামী হতে চলেছেন। আপনাকে—

পিছন থেকে বর বললো,—আমাকে তুমি বলেই ডাকবেন। আমার নাম পান্না আপনি আমাকে পানু বলে ডাকবেন।

Table of Contents

—সে কি, বিয়ের চিঠিতে ছাপা হয়েছে অন্য নাম—দাঁড়াও সেখানে ছাপা হয়েছে... হ্যাঁ, সঞ্জয়।

পিছন থেকে বর বলল,—হ্যাঁ, আমার দুটো নাম। ভাল নাম সঞ্জয়। তবে আপনি আমার ডাক নাম, পান্না বলেই ডাকবেন—আপনার নামটি?

ত্রিলোচন।

আহা, ভারি সুন্দর নাম। বিষ্ণুর নাম।

—বিষ্ণুর নয়—মহাদেবের।

—ওই একই হল। আমরা আবার সব দেবতাকে এক দেখি কিনা। তা ত্রিলোচনদা, কিছু যদি মনে না করেন, আপনি কি সোজা যাবেন, না একটু দীনেন্দ্র স্ট্রীট দিয়ে ঘুরে যাবেন?

—আপনি যা বলবেন।

—তাহলে বলব দীনেন্দ্র স্ট্রীট দিয়ে ঘুরে অরবিন্দ সেতুতে পড়বেন। ওই মোড়টাতে—

—মোড়টাতে কি?

—না তেমন কিছু নয়, মোড়টা একটু বিপজ্জনক কিনা। একটু থেমে ট্রাফিক সিগন্যাল দেখে তারপর চালাবেন।

—না-না, ও জায়গা দিয়ে কত গিয়েছি।... আমি ভাবছি কি জানো পানু, মানুষের উপকার করা কত সহজ।

—কেন অমন ভাবছেন?

—আমার বাবা বলতে মানুষের উপকার করা সহজ নয়। কিন্তু আমি তো আজ প্রথম উপকার করতে বেরুলাম। আর বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গেই ক্যাচ। তোমার মুখ দেখেই মনে হল, তুমিই আমার হবু মামাতো শালা সঞ্জয়। যে নাকি ট্রাফিক জ্যামে পড়ে—

—সত্যি, আমি তো ভেবেছিলাম, আর বুঝি বিয়ে হল না। সারারাত রাস্তায় আটকে থাকতে হবে।

—না, না। বালাই ষাট, তা কখনও হয়। বিয়ে বলে কথা।

শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড় আসতেই বর বলল,—এখানে একটু দাঁড় করাবেন?

ত্রিলোচন বলল,—সবুজ আলো আছে। দাঁড় করালে তো মুশকিল হবে। কেন তোমার কি খুব? মানে একটু চেপে চুপে রাখতে পারবে না?

না, না, সে সব কিছু নয়। আপনি বরং ওপারে গিয়ে বাঁয়ে ঘোরাবার মুখে একটু আসতে আস্তে চালাবেন, তাহলেই হবে।

—এই দেখো তুমি মিথ্যে ভয় পাচ্ছ।

—এই সময় একটু ভয় ভয় করে।

ও হো! —বলে ত্রিলোচন একটু হেসে নিল।

মোড়ের মুখে সত্যি সত্যি একটু স্লো করল ত্রিলোচন। তারপর দীনেন্দ্র স্ট্রীটে পড়ে স্পিড দিল। জোরে ছুটল স্কুটার।

পিছনে বরের গলা শোনা যাচ্ছে না। হয় তো খুব ভয় পেয়েছে।

—কি, জোরে চালাচ্ছি বলে ভয় পাচ্ছো নাকি?

কোনও জবাব নেই। ত্রিলোচন ভাবলো, হয়তো স্কুটারের আওয়াজে শুনতে পায়নি।

কিন্তু মামার বাড়ির সামনে এসে দূর থেকে যে দৃশ্য দেখল, তাতে অবাক হয়ে গেল ত্রিলোচন।

Table of Contents

সারি সারি গাড়ি। সবার আগে বরের গাড়ি। বরের গাড়ি থেকে বর নামল। সবাই উলু দিয়ে শাঁখ বাজিয়ে তাকে অভ্যর্থনা করছে।

কিন্তু এ তো অন্য বর। তাহলে তার পিছনে বসে বরটি কে?

তাড়াতাড়ি স্কুটার থামিয়ে ত্রিলোচন দেখল তার পিছনের সিটে কেউ নেই।

এখন বুঝতে পারল দীনেন্দ্র স্ট্রীটের মোড়ে কেন স্লো করতে বলেছিল স্কুটার। এ বর অন্য বাড়ির বর। সুযোগ বুঝে নেমে পড়েছে।

মামাকে উপকার করা আর ভাগ্যে নেই ত্রিলোচনের। গলদঘর্ম হয়ে ফিরতে দেখে মামা বললেন,—তুই বললি বর নিয়ে আসতে যাচ্ছিস—তোর ভরসায় থাকলেই তো হয়েছিল। ওঁরা এখনই এসে পৌঁছলেন। চার ঘণ্টা আটকে ছিলেন।... তুই এতক্ষণ কি করছিলি বলতো?

ত্রিলোচন জবাব দিল—আমিও যে জ্যামে আটকে গিয়েছিলাম।

মামা বললেন,—তোকে দিয়ে যদি একটা উপকারও হয়।

ত্রিলোচন গুম হয়ে থাকে।

এরপর একদিন ত্রিলোচন শ্যামবাজারের একটি কাপড়ের দোকানে কাপড় কিনতে গেছে, এমন সময় দেখা হল এক সদ্য বিবাহিত তরুণ-তরুণীর সঙ্গে। দুজনেই এসেছে কাপড় কিনতে। তরুণটিকে দেখে তার চেনাচেনা মনে হল। কিন্তু কোথায় দেখেছে ঠিক মনে করতে পারল না।

তরুণটিই তাকে দেখে এগিয়ে এসে বললো,—আমায় চিনতে পারছেন?

ত্রিলোচন চিনতে পারল না,—কোথায় দেখেছি বলুন তো?

ছেলেটি তার স্ত্রীকে দেখিয়ে বললো,—এই দাদা সেদিন স্কুটারে করে আমাকে পৌঁছে না দিলে বিয়েই করতে পারতাম না। ওফ্, আপনি যে আমার কি উপকার করেছেন দাদা। কিছু মনে করবেন না, আপনাকে আপনার ভাগ্নী জামাই বলে পরিচয় দিয়েছিলাম বলে। পান্নাই আমার আসল নাম, আর আমার বউয়ের নাম চুমকি।

চুমকি হেসে বললো,—ওর কাছে সেদিন আপনার উপকারের কথা শুনেছি। আমার বাবা তো টেনশনে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন।

পান্না বললো,—আর একটা যদি উপকার করেন দাদা। আপনি যা পরোপকারী, আপনিই একমাত্র পারবেন। আমাদের যদি একটা সরকারি ফ্ল্যাট খুঁজে দেন। বিয়েই যখন দিলেন, তখন এ দায়িত্বটাও আপনার।

ত্রিলোচন মুখের ওপর একটা কড়া জবাব দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু বাবার কথা মনে পড়তেই কিরকম নরম হয়ে গেল। বললো,—বেশ, যোগাযোগ রাখবেন। চেষ্টা করবো।

Table of Contents

ব্যাপারটা কি হলো?

নির্মলেন্দু গৌতম

মিনিট পনেরোর মধ্যেই ফিরে আসছি।—বলেই গাড়ি থেকে নেমে আমার হাতে একটা চকোলেট ধরিয়ে দিয়ে দ্রুত পায়ে মস্ত ফ্ল্যাট বাড়িটার গেট দিয়ে ঢুকে পড়লো দেবেশ্বর। তারপর মিলিয়ে গেলো ভিতরে।

প্রভঞ্জনবাবুর সঙ্গে কি যেন জরুরি একটা দরকার আছে দেবেশ্বরের। এই ফ্ল্যাট-বাড়িতেই থাকেন প্রভঞ্জনবাবু। দেবেশ্বরের পিসেমশাইয়ের বন্ধু। খানিক আগে টেলিফোনে তাঁকে ধরতে চেষ্টা করেছে বারকয়েক। ধরতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে আমায় নিয়ে চলে আসতে হয়েছে দেবেশ্বরকে।

না, আমি আর গাড়ি থেকে নামলাম না। দেবেশ্বরকে দেওয়া চকোলেটটা মোড়ক খুলে মুখে পুরে বাড়িটাকে দেখতে থাকলাম।

না, দু'মিনিটও কাটলো না। হঠাৎ প্রায় ছুটতে ছুটতেই গাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো চারজন। হাঁপাতে হাঁপাতেই গাড়িটাকে একবার দেখে নিলো ভালো করে।

Table of Contents

তারপরেই একজন আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বললো,—আপনাকে একটু কষ্ট করতে হবে যে।

বেশ ঘাবড়ে গিয়ে বললাম,—কষ্ট করতে হবে মানে?

মানে, এই তিন বন্ধুকে একটু পৌঁছে দিতে হবে। —সে বললো আবার।

পেছনে যে দাঁড়িয়েছিলো, সে বললো,—আসলে এতক্ষণ ধরে চেষ্টা করেও একটা ট্যাকসি পেলাম না। অথচ আর মিনিট পনেরোর মধ্যে না পৌঁছতে পারলে সব গোলমাল হয়ে যাবে।

মিনিট পনেরোর মধ্যে কোথায় পৌঁছুতে হবে, কোথায় পৌঁছুতে না পারলে কেন সব গোলমাল হয়ে যাবে, এসব প্রশ্ন গুছিয়ে করবার আগেই প্রথম জন বললো,—তোরা উঠে পড় গাড়িতে।

মুহূর্তে তিনজন প্রায় লাফিয়েই উঠে পড়লো গাড়িতে।

ভাগ্য ভালো বলতে হবে। নাহলে এরকম একটা গাড়ি পাওয়া যায়! —তিনজনের একজন গুছিয়ে বসতে বসতে বললো।

আরেকজন বললো,—ওঃ ঠিক যেন আমাদের জন্যেই দাঁড়িয়েছিলো গাড়িটা।

তৃতীয়জন বললো,—নিন, আর দেরি করবেন না। স্টার্ট দিন।

এই মুহূর্তে ঠিক কি করা উচিত আমি বুঝতে পারলাম না। জীবনে কখনও গাড়িতে স্টার্ট দিইনি, চালাইওনি গাড়ি। হ্যাঁ ঠেলে অবশ্যই চালাতে পারি। কিন্তু কথাটা ওরা কখনোই বিশ্বাস করবে না। নাহ্ এরকম অসহায় অবস্থায় কখনো পড়িনি আমি। কেন যে দেবেশ্বরের সঙ্গে চলে গেলাম না প্রভঞ্জনবাবুর ফ্ল্যাটে।

কি হলো? গাড়িতে স্টার্ট দিন! —প্রথমজন এবার অধৈর্য গলায় বললো।

বিশ্বাস করুন, আমি গাড়ি চালাতে জানি না। —বাধ্য হয়েই কথাটা বলে ফেললাম।

তাহলে এখানে গাড়ি নিয়ে এলেন কি করে? —পেছনের সীট থেকে একজন বললো সঙ্গে সঙ্গে।

তার দিকে ফিরে বললাম,—গাড়ি নিয়ে আমার বন্ধু এসেছে। সেই গাড়ি চালায়। মানে, এ গাড়িটা তারই।

আপনার সেই বন্ধু কোথায়? —সে-ই বললো ফের।

মিনিট পনেরোর জন্য ওই ফ্ল্যাট বাড়িতে গেছে। ওর জন্যেই আমি গাড়িতে বসে অপেক্ষা করছি। —আমি ফ্ল্যাট বাড়িটা দেখিয়ে দিয়ে বললাম।

ঠিক আছে। আপনি গাড়ি চালাতে না জানলেও চলবে। শিবুদা, তুমি উঠে পড়ো গাড়িতে। পৌঁছে দিয়ে তুমি ফিরে আসবে এখানে। একজন বললো সেই প্রথমজনের দিকে তাকিয়ে।

প্রথমজনের নাম শিবুদা।

শিবুদা সত্যি সত্যি উঠে পড়লো গাড়িতে। আমাকে সরিয়ে বসলো ড্রাইভিং সীটে। স্টিয়ারিঙে হাত রেখে গীয়ারটাকে নাড়িয়ে চাড়িয়ে দেখলো একবার। বললো,—ঠিক আছে।

শিবুদার দিকে তাকিয়ে দারুণ-রকম অসহায় গলায় আমি বললাম,—একটা কথা বলবো?

তাড়াতাড়ি বলুন, আমাদের হাতে সময় নেই। —গাড়িতে স্যুইচের সঙ্গে চাবিটা ঝুলছিলো। সেটা ঘুরিয়ে স্টার্ট দিয়ে বললো শিবুদা।

Table of Contents

বললাম। —আমি একবার দেবেশ্বর মানে আমার বন্ধু, মানে, গাড়িটা যার, তাকে একবার খবর দিয়ে আসবো। মানে, তাকে একবার বলাটা দরকার।

তাতে অনেকটা সময় লাগবে। সে সময় দেয়া সম্ভব নয়।

বলেই গাড়ি চালাতে শুরু করলো শিবুদা।

মানে, আমি বলছিলাম কি—, আরো একবার বোঝাতে চাইলাম আমি।

আমার দিকে একবার গাড়ি চালাতে চালাতেই শিবুদা বললো,—কিছু ভাববেন না, ওদের জায়গামতো নামিয়ে দিয়েই ফিরে আসবো। আধ ঘণ্টাও সময় লাগবে না।

পেছন থেকে একজন বললো,—আপনার বন্ধু যদি কিছু বলে, তাহলে পুরো ব্যাপারটাই বুঝিয়ে দেবে শিবুদা।

কিন্তু দেবেশ্বর যখন এসে দেখবে গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে আমিও উধাও, তখন কি ভাববে? গাড়ি চালাবার ব্যাপারটা আমার যে আসে না, দেবেশ্বর তা জানে। তারপর—তারপর যে কি, আর ভাবা হলো না।

কারণ হঠাৎ ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেলো গাড়িটা।

আমার দিকে তাকিয়ে অধৈর্য গলায় শিবুদা বললো,—কি হলো?

গাড়িটার স্টার্ট বন্ধ হলো। —আমি বললাম।

অসম্ভব বিরক্ত হয়ে বার কয়েক স্টার্ট দেবার চেষ্টা করলো শিবুদা। না, স্টার্ট হলো না কিছুতেই?

পেছন থেকে একজন অধৈর্য গলায় বললো,—কি হলো শিবুদা, স্টার্ট হচ্ছে না?

সব গোলমাল হয়ে গেলো। —পেছন থেকে আরেকজন বললো।

দেবেশ্বরের দেওয়া চকোলেটটার খানিকটা মুখের ভেতরে ছিলো। সেটুকু চিবুতে চিবুতে আমি এবার সহজ গলায় বললাম—চেষ্টা করলেও চাবি ঘুরিয়ে হবে না।

শুনেই প্রায় লাফিয়ে উঠলো শিবুদা,—চাবি ঘুরিয়ে স্টার্ট হবে না কেন?

আমি বললাম,—এ গাড়িটার নিয়ম-টিয়মগুলোই ঐ রকম।

তাহলে?

ঠেলতে হবে।

ঠেলতে হবে? —বিস্মিত শিবুদা।

হ্যাঁ। এ গাড়িটার নিয়ম-টিয়মগুলো খানিকটা অন্যরকম।

আর চাবি ঘুরিয়ে স্টার্ট দেবার চেষ্টা করলো না শিবুদা। পেছনে ফিরে বললো,—নে, না ঠেললে যখন স্টার্ট হবে না, তখন নেমে ঠেলতে শুরু কর।

বেশ খানিকটা ঠেলার পর স্টার্ট হলো। সঙ্গে সঙ্গে তিনজন লাফিয়ে উঠলো গাড়িতে।

ইস্, আরো বার কয়েক যদি এরকম স্টার্ট বন্ধ হতো।

আমার ভাবনাটা বোধহয় শুনে ফেললো গাড়িটা।

মিনিট তিনেক ঠিকঠাক চলবার পরই ডানদিকের একটা রাস্তায় ঘুরতেই একটা রিক্সর জন্য আচমকা ব্রেক কষতে হলো গাড়িটাকে।

সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেলো স্টার্ট।

তিনজন লাফিয়ে নেবে পড়লো গাড়ি থেকে। গাড়ি ঠেলতে শুরু করলো।

বেশ খানিকটা ঠেলবার পর আবার স্টার্ট হলো।

শিবুদা বললো,—আর দু'একবার এভাবে ঠেলতে হলে কিন্তু সব গোলমাল হয়ে যাবে।

Table of Contents

এরকম একটা বুড়ো গাড়িতে উঠেই বোধহয় আমরা ভুল করে ফেলেছি। —পেছন থেকে বললো একজন।

এইসময় আমি শিবুদার দিকে তাকিয়ে বললাম,—ওরা ঠিক কোথায় যাচ্ছে বলুন তো?

—ওদের এক বন্ধুর বাড়িতে।

তাহলে একটু আধটু দেরি হলে কিচ্ছু এসে যাবে না।

পেছন থেকে একজন বললো,—কি জানেন, ঠিক সময় মতো যে কোন জায়গায় আমাদের পৌঁছুনো উচিত। সেটা আমরা করি না বলেই আমাদের কিছু হচ্ছে না।

বেশ খানিকটা দিব্যি ছুটলো গাড়িটা।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত হঠাৎ-ই ফের বন্ধ হলো স্টার্ট।

সামনে হঠাৎ কটা কুকুর ছুটে রাস্তা পার হতে যাচ্ছিলো। তাকে বাঁচাতে গিয়ে ব্রেক কষেছে শিবুদা। আর ব্রেক কষবার সঙ্গে সঙ্গেই স্টার্ট বন্ধ।

সত্যিই, বিচ্ছিরি আপনাদের গাড়িটা। ভুল করে ফেলেছি আপনাদের গাড়িটায় চেপে,—শিবুদা আমার দিকে বিচ্ছিরিভাবে তাকালো।

পেছনের তিনজন ততক্ষণে নেমে পড়েছে গাড়ি থেকে। না, আর গাড়ি ঠেলবার জন্য নয়। শিবুদার পাশে এসে দাঁড়িয়ে বললো,—শিবুদা, তুমি গাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাও। এখান থেকে মিনিট দু'য়েক হাঁটলেই তো রাকেশের বাড়ি।

বলেই ওরা তিনজন প্রায় ছুটতে শুরু করলো।

শিবুদা চেঁচিয়ে উঠলো,—একি রে, গাড়িটা ঠেলে দিয়ে যা।

এখন আর ঠেলার সময় নেই শিবুদা। —ছুটতে ছুটতে ওদের মধ্যে একজন চেঁচিয়ে বলে উঠলো।

শিবুদা এবার আমার দিকে ফিরলো। বললো,—এরকম বিচ্ছিরি বুড়ো একটা গাড়িতে আপনারা কি করে চেপে বেড়ান বলুন তো?

বলেই শিবুদা নেবে পড়লো গাড়ি থেকে। দরজাটা শব্দ করে ঠেলে দিয়ে বললে,—শুনুন, ওদের তিনজনের জন্যেই এতক্ষণ আপনাদের গাড়িটা চালাচ্ছিলাম। আর চালাতে পারবো না।

তাহলে এখান থেকে ফিরবো কি করে?

শিবুদা হাসলো,—একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে যান—আপনার বন্ধুকে নিয়ে চলে আসুন এখানে—তারপর দুজনে মিলে গাড়িটাকে ঠেলে স্টার্ট করিয়ে ফিরবেন। কেমন?

হঠাৎ আমার চোখে পড়লো খানিকটা এগিয়ে রাস্তার ধারে একটা ক্লাবের সাইনবোর্ড। জগৎ কল্যাণ ব্যায়াম সমিতি। ক্লাবের ভেতর দশাসই চেহারার ছেলেরা ঘোরাঘুরি করছে।

মুহূর্তে বুদ্ধিটা খেলে গেলো মাথায়।

ছুটে শিবুদার পাশে গিয়ে থামালাম শিবুদাকে। বললাম,—একটা কথা আপনাকে বলবো। ঐ যে, সাইনবোর্ডটা একবার পড়ুন।

কিসের সাইনবোর্ড? —বলেই ফিরে সাইনবোর্ডটার দিকে তাকালো শিবুদা ঃ পড়লাম। হ্যাঁ, তাতে কি হলো?

—ধরুন, জগৎ কল্যাণ ব্যায়াম সমিতির প্রেসিডেন্ট যদি আমার বন্ধু, মানে যার

Table of Contents

গাড়ি, সে হয়? আর প্রেসিডেন্টের গাড়িটা যদি ঐ সমিতির ছেলেরা এখানে এভাবে পড়ে থাকতে দেখতে পায়?

শিবুদা বেশ দুর্বল গলায় বললো,—ইয়ে, মানে দেখতে পেলে সবাই চলে আসবে গাড়ির কাছে।

—হ্যাঁ। ওরা যদি গাড়ির কাছে আসে, গাড়িটা এখানে এভাবে পড়ে আছে কেন জিজ্ঞেস করে, ওদের আমি কি বলবো?

কোন উত্তর না দিয়ে ফের সাইনবোর্ডের দিকে তাকালো শিবুদা। তারপরই হঠাৎ বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে চলে এলো গাড়িটার কাছে। আমার দিকে তাকিয়ে বললো,—আপনি উঠে স্টিয়ারিং ধরে বসুন। গাড়িটা ঠেলে স্টার্ট করিয়ে আমি উঠবো।

বুদ্ধিটা যে সত্যি সত্যি কাজে লেগে যাবে, ভাবতেই পারিনি।

চোখের পলকে আমি উঠে পড়লাম গাড়িতে। সঙ্গে সঙ্গে শিবুদা ঠেলতে শুরু করলো গাড়িটাকে।

শিবুদার ভাগ্য ভালই বলতে হবে। খানিকটা ঠেলতেই শব্দ করে উঠলো ইঞ্জিন।

আশ্চর্য, এবার একবারের জন্যেও গাড়িটার স্টার্ট বন্ধ হলো না।

সেই ফ্ল্যাট বাড়িটার সামনে গাড়িটা দাঁড়াতেই ছুটে এলো দেবেশ্বর। দেবেশ্বরের মুখের দিকে তাকিয়ে স্পষ্টই বুঝতে পারলাম, দেবেশ্বর কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না।

একবার দেবেশ্বরকে দেখে নিয়ে শিবুদা প্রায় লাফিয়েই নেমে পড়লো গাড়ি থেকে।

সঙ্গে সঙ্গে আমি বললাম,—দাঁড়ান শিবুবাবু, আপনার সঙ্গে আমার জরুরি একটা কথা আছে।

শিবুদা ঘুরে তাকালো।

আমি শিবুদার অসহায় মুখের দিকে তাকিয়ে কোন রকমে হাসি চেপে গম্ভীর গলায় বললাম,—আপনাকে আমি কী বলেছিলাম তখন, মনে আছে?

শিবুদা তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

আমি বললাম,—বলেছিলাম যদি আমার বন্ধু জগৎ কল্যাণ সমিতির প্রেসিডেন্ট হয়? কী, বলেছিলাম তো?

—হ্যাঁ, বলেছিলেন।

সত্যি সত্যি প্রেসিডেন্ট; একথা কি বলেছিলাম?

—মানে?

—মানে, জীবনে প্রথম আজই আপনাদের সঙ্গে গিয়ে জগৎ কল্যাণ সমিতির দেখেছি আমি। আমার এই বন্ধু, মানে, দেবেশ্বর এখনও দেখেনি। এই প্রথম—

কথাটা শেষ হতে দিলো না শিবুদা। ঘুরে প্রায় ছুটতে ছুটতে মিলিয়ে গেলো। জগৎ কল্যাণ সমিতির ভয়ে গাড়ি ঠেলে যে হেরে গেছে আমার কাছে, সেটা কি করে মানবে পাড়ার শিবুদা।

ব্যাপারটা কি হলো? —দেবেশ্বর অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো আমার দিকে ফিরে। আমি বললাম,—দাঁড়াও আগে হেসে নি খানিকটা।

সত্যি, এরপর না হেসে পারা যায়!

Table of Contents

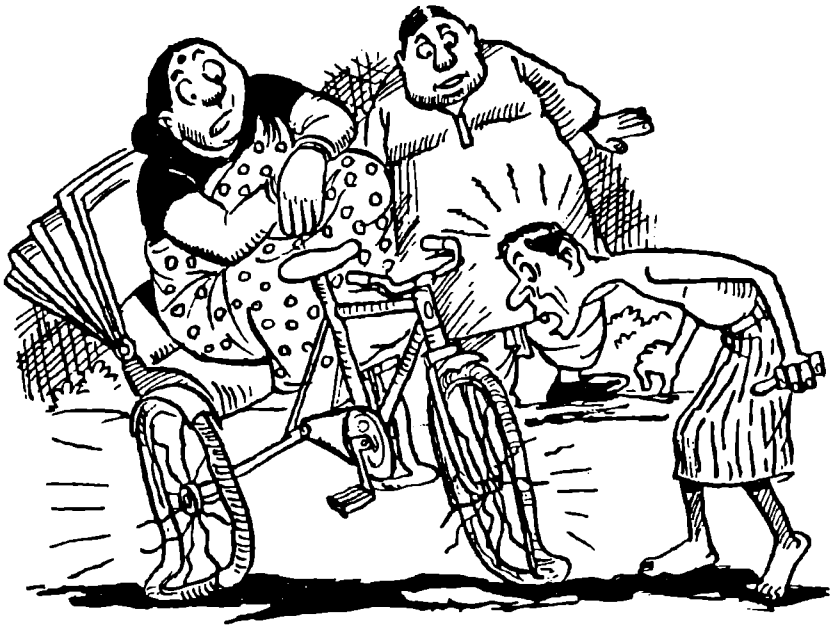

মোটা-মুটি গল্প

প্রবুদ্ধ

এক ছিল মোটা—বেজায় মোটা লোক। তার বৌ-ও ছিল মোটা। সবাই বলতো 'মোটা-মুটি'। ধনীর ছেলে কিনা, তাই আলসেমির মধ্যে দিন কাটিয়েছে সারাজীবন। ফলে মেদ বৃদ্ধি পেয়েছে দিনের পর দিন।

আসলে কর্তার নাম হরিধন, গিন্নির নাম ক্ষেমঙ্করী। কিন্তু 'মোটা-মুটি' নামের আড়ালে তাদের আসল নাম কবে হারিয়ে গেছে।

টাকার দিক থেকে হরিধন ছিল এক্কেবারে 'সলিড্',—মোটা টাকার মালিক। শরীরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মাথাটাও তৈরি, যাকে বলে মোটা-মাথার মালিক।

বুড়ো-বুড়ি ইয়া লাস নিয়ে যখন অঘোরে নাক ডাকাতো, মনে হতো যেন ডাকাত পড়েছে বাড়িতে, কিংবা ভূমিকম্প হচ্ছে।

এত টাকার মালিক হওয়া সত্ত্বেও তাদের মনে সুখ ছিল না,—ছেলেপুলে নেই। সম্পত্তি ভোগ করবে কে? তাই তারা ঠিক করলে, যা কিছু আছে, খেয়ে-দেয়ে বেবাক ফাঁক করে যাবে—যা থাকে কপালে!

ঘি-দুধ-রাবড়ি থেকে শুরু করে পোলাও-কালিয়া খেয়ে-খেয়ে তারা দিনের পর দিন আরো মোটা, মোটাতর মোটাতম হয়ে উঠলো। শেষে এমন অবস্থা হলো যে কারুর সাহায্য

Table of Contents

ছাড়া তারা চলা-ফেরা তো দূরের কথা, নড়াচড়াও করতে পারতো না। এর জন্য কর্তার চারজন চাকর, গিন্নির পাঁচজন চাকরানী সব সময় হিমসিম খেয়ে যেতো।

ঘরের বাইরে বেড়াতে ইচ্ছে হলেও যাবার উপায় ছিল না। কেননা তাদের দেহের পরিধির চেয়ে দরজাখানা ছিল কিছু ছোট। তারই ভেতর স্নান, খাওয়া-দাওয়া, ঘুমানো সব কিছুরই ব্যবস্থা।

সকাল আটটায় ঘুম-ভাঙার পর এক রাশ ঘি-চুবচুবে পরটা চিবিয়ে খাঁটি দুধের ক্ষীর এক গ্লাস খেয়ে কর্তা আটটা বালিশ হেলান দিয়ে বসতেন। দু পায়ের নিচে দুটো বালিশ, দুহাতে দুটো, আর পিঠের কাছে চারটে—মোট আটটা বালিশ। গিন্নিরও তাই।

এভাবে একঘেয়ে জীবন কাটাতে-কাটাতে জীবনে তাদের ঘেন্না ধরে গেছলো। কত ডাক্তার-কবরেজ এলো-গেলো, কোনো ওষুধে কিছু হয় না। রোগা তো দূরের কথা, দিনের পর দিন যেন আরও মেদ বৃদ্ধি ঘটতে লাগলো।

শেষে এলেন একজন ব্যায়ামবিদ্। তিনি বুড়ো-বুড়িকে যোগাসন করাতে লাগলেন। কিন্তু মুশকিল বাধলো প্রথম দিনই। যেই না বুড়োর হাতের একধারে বালিশ সরিয়ে নিয়েছেন, অমনি বুড়ো কাৎ হয়ে সেই ব্যায়ামবিদের ওপরেই হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। অত বড় একটা পেল্লায় লাসের ভারে ব্যায়ামবিদের প্রাণ যায় আর কি!

বুড়িকে স্কিপিং করাতে গিয়েও বিপদ। উঠতেই পারে না, দড়ি ধরে লাফাবে কি! হতাশ হয়ে ব্যায়ামবিদ কেটে পড়লেন।

বুড়োর গায়ে ছিল একটা ফতুয়া। তাতে চার ইঞ্চি অন্তর এক-দুই-তিন-চার করে নম্বর দেয়া থাকতো। গরমের দিনে গা চুলকালে বুড়ো ইঙ্গিত করতো, আর সেই-সেই নম্বর চুলকে দিতো চাকরেরা। এছাড়া উপায় ছিল না।

একদিন বিকেলে বুড়ো বললে বুড়িকে—কিসের যেন পচা গন্ধ পাচ্ছি।

চাকর-চাকরানী বিছানা আতিপাঁতি খুঁজলো। কিন্তু না, কোথাও কিছু নেই—মরা জন্তুজানোয়ার তো দূরের কথা!

পরদিন অবস্থা আরো খারাপ। আরো পচা গন্ধে ঘর ভরে গেছে। টেঁকা দুঃসাধ্য।

শেষে বুড়োর ফতুয়া খুলে দেখা গেল ইয়া বড় একটা বিছে মরেছে ভুঁড়ির ভাঁজে—সেটাই পচে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে।

এমনি ভাবে দিন যায়। ওদের বড় কষ্ট গরমের দিন এলো। রাতদিন পাখা চালিয়েও ঘাম বন্ধ হয় না।

শেষে ওরা ভেবেচিন্তে ঠিক করলে—কোনো উঁচু পাহাড়ে জায়গায় চলে যাবে।

টাকার তো অভাব নেই। যেই ভাবা, সেই কাজ। ওদের জন্যে পাহাড়ের এক জায়গায় ঘর নেয়া হোল।

কিন্তু ফ্যাসাদ বাধলো যাবার দিন। প্রথমে দরজা ভাঙা হোল গাঁইতি দিয়ে, ধরাধরি করে বের করার পর বুড়োকে আনা হলো এক রিক্সার ওপরে। কিন্তু দেখা গেল, রিক্সাতে উনি আঁটছেন না। যদিও বা চেপেচুপে রিক্সায় ধরানো হলো বুড়োকে, কিন্তু ততক্ষণে রিক্সাওয়ালা বে-পাত্তা। রিক্সার মায়া ছেড়ে প্রাণের মায়ায় কোথায় অন্তর্ধান করেছে!

আবার ধরাধরি করে নামানোর পর ঠিক হলো, পাল্কী করে স্টেশনে যাওয়া হবে। কিন্তু পাল্কী কোথায়? কোনো বেহারার দলই ওদের নিয়ে যেতে রাজি নয়। ঘোড়ার গাড়ির কোচোয়ানও নয়, এমন কি ট্যাক্সিওয়ালাও নয়।

Table of Contents

এ তো ভারি ফ্যাচাং !

এই সব ব্যাপার-স্যাপার যখন চলেছে, তখন এক চাকর কিন্তু বসে বসে ভাবছে গালে হাত দিয়ে। ওদের সবচেয়ে পুরনো চাকর। ভাবতে ভাবতে তার মাথায় এক বুদ্ধি খেলে গেল। সে অন্য চাকর আর চাকরানীদের ডেকে নিয়ে গেল বাড়ির সামনের গাছতলায়। ফিস্-ফিস্ করে কি সব পরামর্শ হলো।

তাহলে তোমরা সবাই রাজি তো? —চাকরটি জিজ্ঞেস করে।

হ্যাঁ, রাজি। তবে দেখো, আমরা যেন শেষে চাকরিটা না হারাই।

সে ভার আমার ওপর ছেড়ে দাও।

গাছতলা থেকে ফিরে ওরা দাঁড়ালো সবাই বুড়ো-বুড়িকে ঘিরে।

এতবড় একটা হুজ্জুত গেছে দেহের ওপর দিয়ে, তাই বুড়ো-বুড়ির ক্ষিদে পেয়েছে। বললে,—ওরে তোরা খেতে দিচ্ছিসনে কেন?

সঙ্গে সঙ্গে সেই চাকরটা বললে,—তোরা আবার খাবি কি? কচুপোড়া খা!

কি! —বুড়ো-বুড়ি যেন আকাশ থেকে পড়লো, আমাদের চাকর হয়ে আমাদেরই এতবড় কথা বললি? বিষম রেগে বুড়ো-বুড়ি উঠতে যায়, কিন্তু পারে না, পড়ে যায় কাৎ হয়ে। কাৎ হয়ে কাতরাতে থাকে।

কেউই যায় না তাদের তুলে সোজা করতে।

ক্রমে বেলা বাড়ে, বুড়ো-বুড়ির ক্ষিদেয় পেট চোঁ-চোঁ করছে। তবু শত অনুরোধেও কেউ তাদের খেতে দিলে না। অধিক কি, বুড়ো-বুড়িকে দেখিয়ে-দেখিয়ে তাদের দুজনের খাবার ওরা আয়েস করে সবাই খেয়ে চললো।

বুড়ো যত শাসায় 'তোদের চাকরি খতম'—ওরা ততই দুজনকে বক দেখায়, বলে, 'উঠতেই পার না, তার আবার খতম! কচু করবে আমাদের।'

এইভাবে দুদিন কেটে গেল। ক্ষিদের চোটে ওরা জাগে, ক্ষিদে নিয়েই ওরা ঘুমোয়।

ইতিমধ্যে চাকর-চাকরানীরা একটা ছড়া তৈরি করেছে, মাঝে-মাঝে শোনাচ্ছে বুড়ো-বুড়িকে—

'ওরে মোটা, ওরে মুটি—
কবে হবি কলাইশুঁটি?
চালকুমড়োর খোলস ছেড়ে,
আয় না তেড়ে, আয় না তেড়ে!

অসহ্য! অসহ্য! বুড়ো-বুড়ি গড়িয়ে গড়িয়ে ওদের তেড়ে যায়—ওরাই দূরে সরে যায় একটু একটু করে।

দিন চারেক পরের ঘটনা।

চাকর-চাকরানীরা তখন একটু দূরে মজা করে খাচ্ছে, বুড়ো চি-চি করে উঠলো, —ওরে আমাদের কিছু খেতে দে।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব এল,—কচু-পোড়া খাও!

গিন্নি! —দুরন্ত রাগে ও দুঃখে বুড়ো এবার চ্যাঁ চ্যাঁ করে উঠলো, আর যে সহ্য

Table of Contents

হয় না! এরা আমাদেরই খেয়ে-পরে মানুষ, আর আমাদেরই কিনা অপমান করছে! এর চেয়ে মৃত্যু ভালো।

না গো, মরার আগে শেষ চেষ্টা করে দেখি। ঐ ভাঙা চৌকাঠখানা হাত বাড়িয়ে দাও দেখি।

বুড়ো বহু কষ্টে ভাঙা চৌকাঠের একখণ্ড এগিয়ে দেয় বুড়িকে।

আর তুমি নাও এই বালিশটা, ব্যাটাদের মোক্ষম শিক্ষা দিয়ে যেতে হবে। বুড়ি বললে বুড়োকে।

বুড়ো-বুড়িকে ঐ চৌকাঠ-ভাঙা আর বালিশ হাতে উঠতে দেখে তারা আরো জোরে-জোরে ছড়া কাটতে থাকে ঃ

'চাল কুমড়োর খোলস ছেড়ে,
আয় না তেড়ে, আয় না তেড়ে!!'

তবে রে!!— রাগে বুড়ো-বুড়ি যেন বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেললে, ধাওয়া করে গেল চাকর-চাকরানীদের। সঙ্গে সঙ্গে ওরাও সরে গেল দল বেঁধে।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ বুড়ো-বুড়ির হুঁশ হয়। তারা অবাক নিজেদের সেই ফাঁকা মাঠে দেখে ঃ এ কি, আমরা তাহলে চলতে-ফিরতে পারছি!

গিন্নি বলে,—তাই তো! এতক্ষণ ছুটে ফেললাম কি করে?

এমন সময় দূরের ঝোপ থেকে বেরিয়ে এলো সেই পুরনো চাকর। তাকে দেখেই বুড়ো-বুড়ি গাল পাড়তে শুরু করলো।

তারা থামলে দূর থেকে চাকরটা বললে,—মা, আপনারা রাগ করবেন না। আপনাদের অবস্থা দেখে আমরা খুব দুঃখ পেতাম। সবাই তাই যুক্তি করে এই সব করেছি। দেখলেন তো, এখন আপনারা আমাদের মতোই চলতে-ফিরতে পারছেন।

অ্যাঁ! তাই তো!! বুড়ি হেসে ফেললে।

বুড়ো বললে,—ব্যাটা পাক্কা বদমাস। ঘটে ওর বুদ্ধি ঠাসা। যাক্, তোদের সব্বাইকে বকশিশ দেব আজ।

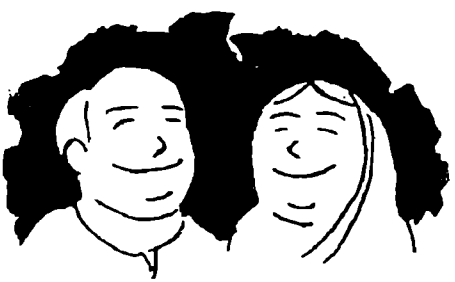

Table of Contents

বিষমভরার বাঘ

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

মাঠের মাঝখানে মস্ত এক মজা দিঘি। নাম বিষমভরা। এককালে এই দিঘি বিষমভাবে ভরা ছিল বলেই হয়তো এইরকম নাম হয়েছিল। কালে দিঘি শুকিয়ে গেল। দিঘি শুকিয়ে গিয়ে ভরে গেল শর বনে। তার সঙ্গে আরো নানারকম গাছপালা গজিয়ে দিঘিটা পরিণত হোল এক গভীর জঙ্গলে। সেই জঙ্গলে একদিন হঠাৎ কোথা থেকে যেন এক বাঘ এসে বাসা বাঁধল।

বাঘটাকে প্রথম দেখল কুশো বাগদী।

তখন বৈশাখ মাস। মাসের শুরুতেই কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় ভিজে মাটি লাঙল দেবার উপযোগী হয়ে উঠেছে। তাই খুব ভোরে হাল বলদ নিয়ে কুশো চলল মাঠের দিকে।

ভোরের দিকে ফাঁকা মাঠে মনের আনন্দে লাঙল দিচ্ছে কুশো। এমন সময় তার মনে হোল বিষমভরার জঙ্গলের দিকে পিছন ফিরবার সময় কে যেন তার পিঠের উপর আলতো করে হাত রাখছে। একবার দুবার করে পর পর তিনবার এইরকম হবার পর কুশোর মনে সন্দেহ হলো। সেই দিগন্ত বিস্তৃত ফাঁকা মাঠে কুশো তখন ভয় পেয়ে গেল খুব। মনে মনে ভাবল, ভূতুড়ে ব্যাপার নয়তো? এবার সে খুব হুঁশিয়ার হয়ে পিছন দিকে নজর রেখে বিষমভরার কাছে এলো। বিষমভরার কাছে এসে সেই না সে পেছন হয়েছে অমনি আড়চোখে তাকাতেই দেখতে পেল জঙ্গলের ভিতর থেকে একটা ইয়া কেঁদো বাঘ বেরিয়ে এসে তার পিঠের উপর থাবা দিয়ে তাকে আলতো করে ছুঁচ্ছে।

Table of Contents

যেই না দেখা অমনি কুশোর চক্ষুস্থির। তবে আর পাঁচজনের চেয়ে কুশোর বুদ্ধিটা একটু সরেস বলে সে তক্ষুণি দৌড় ঝাপ না করে আগের মতোই লাঙল দিতে দিতে মাঠের একেবারে ওপ্রান্তে গিয়ে চোঁ চোঁ দৌড়। তারপর ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে একেবারে গ্রামের ভিতরে গিয়ে চিৎকার করে উঠল—ওরে, কে কোথায় আছিস রে, শিগগির আয়। বিষমভরায় বাঘ বেরিয়েছে।

কুশোর চিৎকার শুনে গাঁ সুদ্ধু লোক সকলেই ছুটে এলো প্রায়। দুলেদের লক্ষ্মী চোখ দুটো বড় বড় করে বললো,—সত্যি বলছ বাঘ? নাকি বাঘের মতো দেখতে অন্য কোন প্রাণী?

কুশোর গা দিয়ে তখন কালঘাম ছুটছে। বললো,—কি যে বলো সব। বাঘ-বাঘই। বাঘের মতো দেখতে আবার অন্য কোন প্রাণী হয় নাকি? তাছাড়া আমি নিজের চোখে দেখেছি। ইয়া মোটা কেঁদো বাঘ। থাবা বার করে আমার পিঠের ওপর রাখছিল। নেহাৎ বরাৎ জোর, তাই বেঁচে গেছি এ যাত্রা।

গাঁয়ের প্রবীণ হরি ডাক্তার বললেন,—তা তোমার হাল বলদের কি হোল।

—সে সব মাঠেই পড়ে রয়েছে ডাক্তারবাবু। কোন রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে এসেছি আমি। একেবারে বুনো বাঘ। বন থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে। এখনো রক্তের স্বাদ পায়নি বোধহয়। পেলে আমাকে সহজে ছাড়ত না।

ডাক্তারবাবু এবার কপাল কুঁচকে বললেন—তবে তো মহা সমস্যার বিষয়। তুমি যখন নিজের চোখে দেখেছ বাঘকে তখন আর তোমার কথায় অবিশ্বাস করি কি করে বলো? এখন বাঘটাকে না মারতে পারলে তো বিপদের শেষ থাকবে না। মানুষ গরু সব খেয়ে শেষ করে দেবে একধার থেকে।

গ্রামের আরো পাঁচজন যারা জড় হয়েছিল তারাও সকলে একজোট হলো এবার। বললো,—তবে আর দেরি কেন? বাঘটাকে কোন রকমেই এখান থেকে পালাতে দেয়া হবে না। লাঠি সোঁটা নিয়ে সব এক্ষুনি তৈরি হয়ে পড়ো।

কুশো বললো,—সেই ভালো। দিনের আলোয় কোন অসুবিধেও হবে না। চলো সব দল বেঁধে যাই।

এ খবর শুধু যে এই গ্রামেই চাপা রইল তা নয়। আশপাশের গ্রামগুলোতেও ছড়িয়ে পড়ল খবরটা। বিষমভরায় বাঘ ঢুকেছে। বাঁচতে চাও তো সবাই এসো।

আশপাশের গ্রামের লোকরাও তখন সঙ্গে সঙ্গে নানারকম ধারালো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। তারপর সবাই মিলে জোট বেঁধে চলল বিষমভরার দিকে।

বিষমভরায় গিয়ে সর্বাগ্রে সকলে মিলে বিষমভরার চারপাশ ঘিরে ফেলল। কিন্তু ঘিরলেই বা হবে কি? বিষমভরা কি একটুখানি জায়গা? গোটা বিষমভরা ঘিরতে গিয়ে সমস্ত দলটাই হাল্কা হয়ে গেল প্রায়। কাজেই সকলে সাহস হারিয়ে অস্ত্রশস্ত্র লাঠি সোটা হাতে নিয়ে বিষমভরার বনের বাইরেই দাঁড়িয়ে রইল হাঁ করে। ভেতরে ঢুকতে সাহস হলো না কারো। বাইরে থেকেই সবাই বলতে লাগল—কই কুশো! কোথায় তোমার বাঘ?

বাঘ তখন কোথায়? একেবারে গভীর বনের ভিতরে। অনেক চেষ্টা করেও তাকে দেখা গেল না।

কুশো এদিক সেদিক ঘুরে বললো,– এই এইখানেই ব্যাটা আমাকে থাবাচ্ছিল।

লক্ষ্মী দুলে বললো,—তা তো হলো। কিন্তু বাঘকে এখন পাই কোথা?

Table of Contents

যেই না বলা অমনি একটা ঝোপের একটু অংশ নড়ে উঠল। আর কুশোও অমনি লাফিয়ে উঠে সেই দিকে আঙুল দেখিয়ে বললো,—ঐ, ঐ যে। ঐ দেখো বাঘ। ঐ ব্যাটা বসে আছে।

কুশো তো 'বাবারে মারে' বলে চিৎকার করে উঠল তখন।

অন্যান্য লোকরাও তখন ছুটে এলো। তারপর সবাই মিলে এলোপাতাড়ি বাঘটাকে বেশটি করে ঘা কতক দিতেই কুশোকে ছেড়ে দিয়ে বাঘটা এক লাফে বলের ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

সেই যে ঢুকলো আর বেরুলো না।

বাঘের চেহারাটা সবাই তখন চাক্ষুষ দেখে আর তাকে ঘাঁটাতে সাহস করল না কেউ। সবাই মিলে যুক্তি করে চলল তখন থানায়।

এখানকার থানা হোল রায়না থানা। গ্রামের নাম নাড়ুগ্রাম। নাড়ুগ্রাম থেকে রায়না অনেক দূর। তবুও সবাই মিলে দল বেঁধে থানায় গিয়ে বাঘের কথা বললো। বাঘটাকে যাতে সরকারি কায়দায় ধরা হয় বা গুলি করে মারা হয় তার জন্য চেষ্টা করতে বলল।

থানার দারোগাবাবু সকলের কথা বেশ মন দিয়ে শুনলেন। তারপর বললেন—ঠিক আছে। তোমরা নিজেরাই আরো দু'একবার চেষ্টা করে দেখো বাঘটাকে মারতে পারো কিনা। তারপর যদি একান্ত না পারো তখন যা হোক একটা ব্যবস্থা করা যাবে। আর যদি কেউ মারতে পারো তবে তাকে নগদ পঞ্চাশটা টাকা আর একটা দোনলা বন্দুক আমর পুরস্কার দেবো। একথা গ্রামের সবাইকে গিয়ে জানিয়ে দাও।

সবাই তখন ফিরে চারিদেকে ঘোষণা করে দিল কথাটা। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। ঘোষণা করাই সার হোল। শুধু হাতে বা সামান্য একটা ধারালো অস্ত্র নিয়ে যে বাঘ মারবে এমন সাহসই বা কার আছে? তাই ঘোষণা শুনে বাঘ মারবার জন্য সাহস করে এগিয়ে এলো না কেউই।

এদিকে পুরস্কারের কথা শুনে কুশোর মন তো অস্থির হয়ে উঠল। সে ভাবল, বাঃ রে। আমি দেখলুম বাঘ, আর বাঘ মেরে টাকা লুটবে আর একজন? এ কখনই হতে দেওয়া যায় না। টাকাটা যে আর একজন নেবে বা বাঘ মারার সম্মানটা যে আর একজন পাবে কুশো তা কোন মতেই সহ্য করতে পারবে না। কেননা যে লোকটা বাঘ মারবে লোকের মুখে মুখে তখন তার নামই ছড়িয়ে পড়বে। কুশো যে বাঘটাকে প্রথম দেখেছিল সে কথা কেউ ভুলেও বলবে না বা সে নিয়ে কেউ মাথাও ঘামাবে না। তাই না ভেবে কুশোর মেজাজ গেল বিগড়ে। সে তখন নিজেই হঠাৎ পণ করে বসল যে, বাঘটাকে যখন সে-ই দেখেছে তখন বাঘ মারার সম্মানটাও সে-ই লাভ করবে। অর্থাৎ সে নিজেই মারবে বাঘটাকে।

কুশোর কথা শুনে কুশোর বউ তো অবাক। বললো,—সে কি! তুমি গিয়ে বাঘ মারবে কি? এই তালপাতার সেপাইয়ের মতো চেহারা নিয়ে? বাঘ মারা কি যা তা লোকের কাজ? বাঘ মারতে গেলে হিম্মতের দরকার হয় কত।

কুশো বললো,—সে হিম্মৎ আমারও আছে। কেন, আমি কি পুরুষ মানুষ নই?

কুশোর বউ এবার কপাল চাপড়াতে লাগল—হায় হায়। তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? কি থেকে পাও তুমি যে গিয়ে বাঘের সঙ্গে লড়বে?

কুশো বললো,—কোন রকমে বাঘটাকে মারতে পারলেই পঞ্চাশটা টাকা নগদ পেয়ে যাবো বুঝলি? সেই সঙ্গে পাবো একটা দোনলা বন্দুক।

Table of Contents

—পাকাটা না হয় কাজে লাগল। কিন্তু বন্দুক নিয়ে তুমি কি করবেটা শুনি? কেমন করে বন্দুক ছুঁড়তে হয় তা তুমি জানো? সামান্য একটা গুলতি দিয়ে কাক মারতে পারো না, আর তুমি ছুঁড়বে বন্দুক?

কুশো বললো,—খবরদার বলছি। আমাকে অমন তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিস না। যেমন করেই হোক বাঘ আমি মারবোই।

কুশোর বউ বললো,—বেশ। তাহলে বাঘ মারবার সময় আমাকেও তোমার সঙ্গে নিতে হবে। মরি তো দুজনেই মরব।

কুশোর বউয়ের কথা কুশোর বেশ মনঃপূত হোল। বললো,—তা মন্দ বলিসনি বউ। তোতে আমাকে দুজনে মিলেই বাঘ মারতে যাবো। কি বল্?

এই বলে একদিন ভর সন্ধ্যেবেলা কুশো আর কুশোর বউ চললো বিষমভরায় বাঘ মারতে। সন্ধ্যেবেলা গেল তার কারণ বাঘটা লোকজনের ভয়ে দিনের বেলা বেরুতো না। বেরুতো রাত্রি বেলা।

সেদিন ছিল পূর্ণিমা।

সন্ধ্যের পর সারা মাঠ চাঁদের আলোয় ঝলমল করছে। গ্রামের কাউকে কিছু না জানিয়ে কুশো আর কুশোর বউ বেশ মোটা দেখে একখানা লাঠি আর এক গোছা শক্ত দড়ি নিয়ে সাহসে ভর করে চলল বাঘ মারতে।

তারপর মাঠে নেমে যেই না ওরা বিষমভরার কাছে এসেছে অমনি বাঘটা করল কি বিকট একটা গর্জন করে তেড়ে এলো দুজনকে। বাঘের সে কি গর্জন! গর্জনের চোটে বাঘ মারা তো দূরের কথা ভয়ে কুশোর হাত থেকে লাঠি দড়ি দুটোই ছিটকে পড়ল মাটিতে।

কুশোর বউ চেঁচিয়ে উঠল,—ওগো কত্তা গো। তুমি কেন বাঘ মারতে এসেছিলে গো?

বাঘ তখন কুশোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। একেবারে দু'হাতের থাবা দিয়ে জাপটে ধরেছে কুশোকে।

কুশোও প্রাণপণে জড়িয়ে ধরেছে বাঘের গলাটা।

সে এক দেখবার মতো দৃশ্য। যেন বাঘে আর কুশোতে বিজয়া দশমীর কোলাকুলি হচ্ছে। দুজনেই দুজনকে জড়িয়ে ধরে সে কি দারুণ ধস্তাধস্তি!

কুশোর বউও এদিকে তারস্বরে চেঁচিয়ে চলেছে—ওগো কত্তা গো! তুমি কেন ঝকমারি করে বাঘ মারতে এসেছিলে গো?

কুশো প্রাণপণে বাঘের গলাটাকে জড়িয়ে থাকতে থাকতেই বললো,—তুই খামোকা চেল্লাস না বউ। যা বলি তা কর দিকিনি। আমি কোন রকমে ঠেলেঠুলে বাঘটাকে একটা গাছের কাছে নিয়ে যাই আর তুই দড়িটা কুড়িয়ে নিয়ে বেশটি করে গাছের সঙ্গে বেঁধে দে ব্যাটাকে। তারপর দেখ ধোলাই কাকে বলে। এমন মারা মারবো যে তখন বুঝতে পারবে কার পাল্লায় পড়েছে বাছাধন।

এই বলে কুশো যথাশক্তিতে বাঘটাকে জড়িয়ে ধরে কোনরকমে ঠেলেঠুলে নিয়ে চলল।

ভাগ্যক্রমে কাছেই একটা খেজুর গাছ ছিল। সেই খেজুরগাছের গায়ে বাঘটাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গেল কুশো। তারপর যেই না কুশো বাঘটাকে গাছের সঙ্গে ঠেকিয়েছে কুশোর বউ অমনি তাড়াতাড়ি দড়ি দিয়ে বেশটি করে গাছের সঙ্গে বেঁধে ফেলল বাঘটাকে।

Table of Contents

কুশোকে তখন পায় কে! আনন্দে কুশোর বুকের ছাতি তখন এত্তোখানি হয়ে উঠল। বাঘের গলা ছেড়ে দিয়ে পড়ে থাকা লাঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে সে তখন বেদম প্রহার শুরু করে দিল বাঘটাকে।

বাঘ তো ওরকম মার বাপের কালে খায়নি কখনো। তাই মারের চোটে দারুণ হাঁকডাক শুরু করে দিল। বাঘের হাঁকডাকে আশপাশের গ্রামের লোকেদেরও পিলে চমকে উঠল তখন। তারা ভাবল বাঘটা বোধহয় ক্ষেপেছে। তাই যে যার ঘরে খিল কপাট লাগিয়ে ভয়ে কাঁপতে লাগল সব।

এদিকে মারের পর মার তার ওপর মার খেয়ে যখন দেখা গেল বাঘটা আর একটুও নড়াচড়া করছে না—একেবারে মরে গেছে। তখন কুশো আর কুশোর বউ মরা বাঘটাকে টানতে টানতে নিয়ে চলল তাদের ঘরের দিকে।

পরদিন সকালে গ্রামের লোক কুশোর ঘরে রক্তাক্ত কলেবরে মরা বাঘটাকে দেখে তো খুবই অবাক হয়ে গেল। তারপর কুশোর মুখে বাঘ মারার বৃত্তান্ত যখন শুনল তখন বিস্ময়ের আর অন্ত রইল না তাদের। একবাক্যে সকলেই কুশোর প্রশংসা করতে লাগল।

লক্ষ্মী দুলে তাড়াতাড়ি খবর দিয়ে এলো থানায়।

খবর পেয়ে দারোগাবাবু নিজে এলেন বাঘ দেখতে।

বাঘ দেখে সকলেই সামনেই কুশোর হাতে গুনে গুনে পঞ্চাশটা টাকা পুরস্কার দিলেন। সেই সঙ্গে দিলেন একটা দোনলা বন্দুক।

বন্দুকটা অবশ্য কুশো নিল না। দারোগাবাবুর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললো,—আমরা গরীব মানুষ হুজুর। চাষবাস করে খাই। বন্দুক নিয়ে কি করব? তার চেয়ে আপনি একটা 'সারটিফিকেট' লিখে দিন। বাঁধিয়ে রেখে দেবো।

দারোগাবাবু তাই করলেন। কুশোর পিঠ চাপড়ে তাকে একটা সার্টিফিকেট লিখে দেবেন বলে চলে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন মরা বাঘটা গরুর গাড়িতে করে থানায় পৌঁছে দিতে।

গ্রামের সর্বত্র কুশোকে নিয়ে তখন ধন্য ধন্য রব উঠেছে।

Table of Contents

ঐতিহাসিক ছড়িটা

রাম চট্টখুণ্ডী

সাবোনা-শ! বলেই একেবারে ইঞ্জিনের বয়লার বার্স্ট করার মতো লাফিয়ে উঠলেন দ্রৌপদী দাদু।

হঠাৎ এই বিকট চিৎকার শুনে আমরাও ইঞ্জিনের ভাঙা টুকরোর মতো ছিট্‌কে পড়ি চারদিকে। দেখি, দাদু তখন ফতুয়ার ভেতর ও বাইরের সমস্ত পকেটগুলোতে হাত ভরিয়ে পাতি পাতি করে কী খুঁজে চলেছেন।

আমরাও হাঁ-হাঁ করে ঝুঁকে পড়ে বললুম ঃ কী হারালো দাদু? টাকার গেঁজে নাকি?

হাফ্ কান্নার টোনে দাদু বললেন ঃ টাকা তো হাতের ময়লা, গেলে আবার আসবে। কিন্তু এ-বস্তু গেলে আর কোথাও পাবো না রে।

সমানে পকেট হাতড়াতে হাতড়াতে ঘরের এদিকে-সেদিকে দেখে নিয়ে বললেন ঃ এইমাত্র রাখলুম ছড়িটা, এর মধ্যেই পাখ্‌না গজিয়ে উড়ে গেলো নাকি?

ছড়ি খুঁজতে পকেট হাতড়াতে দেখে, বলক ওঠা দুধের মতো হাসিতে মুখ উপ্‌চে পড়ে আমাদের!

এই চরম মুহূর্তে বেমক্কা মতো আমাদের হাসতে দেখে বেধড়ক চটে উঠলেন দাদু। ফ্যাঁটানো ব্যাসমের মতো মুখ ছিরকুটে বললেন ঃ উল্লাশ আর ধরে না! মুখে সব আতপচালের বস্তা ফাঁসিয়ে দিলে! যত্তোসব গজদন্তের দল! বেগতিক বুঝে দাদুকে একটু সন্তুষ্ট করবার আশায় বললুম ঃ তা দাদু, হারিয়েছে আপনার ছড়ি। আপনি ছড়ি খুঁজতে পকেট হাতড়াচ্ছেন কেন তবে?

Table of Contents

বিধেতাপুরুষ তোদের মগজে ঘিলুর বদলে স্রেফ বনস্পতি ভেজাল দিয়েছে! আরও তিরিক্ষি মেজাজে বললেন দাদু ঃ ওরে ঘোঁগ্‌ড়াপচা,—নস্যির কৌটোটা ফেলে এয়েচি কোথা, তাই পকেটে হাতড়াচ্ছি!

আমাদের আমোদ চুপসে যায় দাদুর কথায়। নস্যির কৌটোর খোঁজে ছড়ি নিয়ে দাদু তাহলে এখুনি আড্ডা ভেঙে কেটে পড়তে চান! এমন সাধের সাজানো বাগান অকালে শুকিয়ে যাবে?

দাদু আরও অধৈর্য হয়ে বললেন ঃ আগে আমার ছড়ির খোঁজ কর সব। শা-জাহানের কোহিনূর দিলেও ও ছড়ি আর মিলবে না কোথাও!

ঠিক সেই মুহূর্তে নেউলে ফাটা কাঁসির মতো খ্যান্‌খেনে গলায় চেঁচিয়ে ওঠে ঃ ইউরেকা!! পেয়িচি!!!

আলমারির মাথা থেকে পেড়ে, যাত্রাদলের রাজার পোজে এগিয়ে এসে, দাদুর হাতে তুলে দেয় ছড়িটা।

দাদুও যেন হৃতরাজ্য ফিরে পেলেন—এরূপ ভাব নিয়ে ছড়িটাকে বগলদাবা করে বসে পড়লেন থপ্ করে।

ছড়ি পাওয়ার আনন্দে দাদু নিশ্চয় নস্যির কৌটোর কথা ভুলে গেছেন। কৌটোর কথাটা আরও ভালো করে ভুলিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে বললুম ঃ ছড়িটি দেখে বেশ মূল্যবান বলে মনে হলেও, ওর জন্যে অমন কেঁদে ফেলার মতো কোন কারণ তো খুঁজে পাই না দাদু!

এ ছড়ির মহিমে তোরা কী বুঝবি ড্যাগ্‌ড়া ছোঁড়া! চোখ নাচিয়ে বললেন দাদু ঃ তোরা তো খালি দলাদলি আর পেছুন থেকে বম্ মারতেই শিখিচিস্। সত্যিকার বীরত্বি থাকা চাই।

এই বলে ছড়ির মাথায় লাগানো রুপোর বলটায় একটু মোচড় দিতেই খুট্ করে বলটার মাথা থেকে একটা ঢাকনা উঠে গেলো। অবাক চোখে দেখলুম, লাঠির মাথায় ফিট করা রুপোর বলটি আসলে একটি নস্যির ডিবে। ভর্তি ডিবে থেকে দু'টিপ নস্যি নিয়ে কামানে বারুদ গাদার মতো দু-নাকে গেদে দিয়ে চোখ লাল করে, আবার বললেন দাদু ঃ সে এক অবিস্মরণীয় ইতিহাস!

চারে মাছ জমার মতো আরও 'ক্লোজ' করে বসলুম দাদুকে আমরা। দশ পয়সা সাইজের ফুলুরির মতো বড় বড় চোখে তাকিয়ে থাকি দাদুর মুখের দিকে।

দাড়ির চুলে পাক লাগাতে লাগাতে শুরু করেন দাদু ঃ দোম্বাগড়ের রাজা জবরজং সিং...

দোম্বাগড়? সে আবার কোথায়? —কথার মধ্যে ফোড়ন কাটে ফট্‌কা।

দাদু বিরক্ত হয়ে বললেন ঃ বোম্বাগড় নাম শুনিচিস?

আমি বললুম ঃ সে তো সুকুমার রায়ের...

হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই বোম্বাগড়ের পাশেই ছিল দোম্বাগড়।

ফট্‌কা বাধা দিয়ে বলে ঃ সেটা কোন্ মুল্লুকে?

রীতিমতো রেগে উঠে দাদু বললেন এবার ঃ শুনতে হয় শোন, নয়তো ঘরে বসে বসে ভূগোল খুলে খুঁজে নিগে যা, বিট্‌লে ছোঁড়া!

আমার মেজাজটাও বেজায় খিচড়ে ওঠে ফট্‌কার ওপর। রাগে লাল হয়ে বললুম ঃ

Table of Contents

দেখ ফট্‌কা, মেলা ফট্‌ফট্‌ করলে ঠাস্‌ করে এমন এক রদ্দা কষাবো—টাঁস্‌পড়ার বাগান দেখবি চোখে!

দাদু দেখলুম বেশ প্রসন্নচিত্তে আমার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছেন। পিঠ চাপড়ে বললেন ঃ তোমার ভবিষ্যৎ ঘোর উজ্জ্বল বৎস!

আমিও বেশ মাতব্বরের ভাব নিয়ে বললুম ঃ স্টার্ট এগেন প্লিজ!

দাড়িতে পাক লাগিয়ে আবার শুরু করেন দাদু ঃ দোম্বাগড়ের রাজা জবরজং সিংহের একমাত্র সন্তান হলো—কন্যা রম্ভাবতী। আদরের এই কন্যাটি যখন যা বায়না ধরতো, মহারাজ তা অপূর্ণ রাখতেন না। দেশ-বিদেশের পণ্ডিত শিক্ষক রেখে পড়িয়ে, মেয়েকে বেশ বিদূষী করে তোলেন মহারাজ।

ওই দোম্বাগড়ে থাকতো আমার এক বন্ধু, নাম—শ্রীভজহরি বিদ্যাবিনোদ, ন্যায়রত্ন, কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতি বিস্মৃতি কিসব নানান্‌তরো তীর্থ মিলিয়ে, নামের শেষে ডিগ্রির লেজটা প্রায় মাইলখানেক লম্বা হবে। রাজকন্যেকে সংস্কৃত পড়াতো।

হঠাৎ এই বন্ধুর চিঠি পেলুম একদিন। চিঠিতে লিখেছে ঃ তাড়াতাড়ি তুমি চলিয়া আইস। এ-রাজ্যে এক মজার ঘটনা ঘটিতে চলিয়াছে। স্বচক্ষে দর্শন করিবেক।

মহারাজ জবরজং সিংহের কন্যা রম্ভাবতীর বিবাহ। কিন্তু এ-বিবাহ সাধারণ নিয়মে সম্পন্ন হইবেক না। মহাকাব্যের যুগে—সীতা, দ্রৌপদী যেমন পণ রাখিয়া স্বয়ংবরা হইতেন, এই বিবাহও তদ্রূপ। তবে এর পণটি অতীব কৌতূহলোদ্দীপক!

যে পুরুষ এমন একটি খাদ্য বস্তু মহারাজকে খাওয়াইতে পারিবেক, যাহা চর্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় অর্থাৎ চিবাইয়া চুষিয়া, চাটিয়া এবং পানীয় করিয়া খাওয়া সম্ভব হইবেক, মহারাজ তাহাকেই রাজকন্যা রম্ভাবতী সহ অর্ধেক রাজত্ব দান করিবেন।

বন্ধুর চিঠি পেয়ে মন চুল্‌বুলিয়ে উঠলো যাবার জন্যে। কিন্তু মুশকিল হলো গিন্নি—অর্থাৎ তোদের ঠান্‌দিকে নিয়ে। ওকে রেখে যাই কার কাছে? বললুম ঃ তুমি দু'চারদিন বাপের বাড়ি গিয়ে থাকোগে। আমি একটু 'ফরিন টুরে' বেরুবো।

শুনে তো একেবারে তেলেবেগুনে নেচে উঠলো তোদের ঠান্‌দি! ঝংকার দিয়ে বললে ঃ বাড়ির গাচটায় একগাচ নিচু হয়েছে। এই সময় বাড়ি ছেড়ে গেলে গেরামের অলপ্পেয়ে ছোঁড়াগুনো একটা নিচু আর রাকবে গাছে! পাতা সুদ্‌দো খেয়ে শেষ করবে! তার চেয়ে নোক পাটিয়ে দিদিমাকে আইনে আমার কাচে রেকে, যে চুলোয় খুশি যাওগে, কোন ক্ষতি নেই! কি বুঝলে?

এমন একটা অ্যাডভেঞ্চারের সুযোগ ছাড়া চলে না। বাধ্য হয়ে নিজে গিয়ে জরুলের দিদিশ্বাশুড়িকে অনেক তাকব্বিতে করে এনে, বাড়িতে রেখে, সেই দিনই বেলা বারোটায় ফ্লাই করলুম দোম্বাগড়ের উদ্দেশ্যে।

বারোঘণ্টা প্লেনে জার্নির পর, ঠিক রাত বারোটা নাগাদ বন্ধুর বাড়িতে হাজির হলুম। ভজার মুখে শুনলুম ঃ আগামীকাল সকালেই রাজকন্যে স্বয়ংবরা হবে। অনেক দেশের রাজ-রাজড়ার ছেলেরা যোগ দিচ্ছে এতে।

আমি বললুম ঃ আমিও একজন প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে যোগ দিতে চাই। তুই যখন রাজকন্যের শিক্ষক, তখন আমার নামটা 'এন্ট্রি' করাতে কোন অসুবিধে হবে না নিশ্চয়ই?

প্রথমটায় ভজা মনে করলো আমি দিল্লাগী করছি। কিন্তু আমার দৃঢ় সংকল্প দেখে,

Table of Contents

আমড়া আঁটির মতো চোখ বের করে বললে ঃ সে কি রে! তুই শেষে বেইজ্জতি হবি সভার মাঝে? আমি শুধুমাত্র রঙ্গ দেখবার জন্যে আসতে লিখেছিলুম তোকে!

আমি সাহস দিয়ে বললুম ঃ বাংলা মুল্লুকের ছেলে হয়ে বেইজ্জতি হবো কিরে ভজা! তুই কেবল দেখবি, বাঙালির ছেলে ব্যাঘ্রে বৃষভে—ঘটাবে সমন্বয়! যাহোক, অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে রাজি হলো ভজা।

পরের দিন ভজার বৌ সকাল সকাল লাউচিংড়ি, আলুপোস্ত, কলায়ের ডাল আর বড়ি দিয়ে মোচাঘণ্ট রেঁধে, বেশ পরিপাটি করে খাইয়ে দিলে আমাদের। খেয়ে দেয়ে পান চিবুতে চিবুতে আমার অতিকায় থার্মোফ্লাস্কটি কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে, রওনা হলুম রাজবাড়ির দিকে।

স্বয়ংবর সভায় ঢোকার মুখে এক সুসজ্জিত হলঘর দেখা গেলো। ঘরের মধ্যে এক সাহেব চেয়ারে বসে আরামে চুরুট টেনে চলেছে। ভজাকে জিজ্ঞাসা করলুম ঃ এখানে আবার সাহেব কেন রে ভজা?

ভজা বললে ঃ ও হচ্ছে টম্‌সন্ সাহেব। রাজকুমারীকে ইংরাজি পড়ায়। সাহবেটা বড়ো নচ্ছার। ছাত্রী বলেও জ্ঞান করে না, প্রতিযোগিতায় যোগ দিচ্ছে। আসলে রাজ্যের লোভ ওটাকে আরও পশু করে তুলেছে। যা হোক, তুই ওই ঘরে বস্ গে যা একদিকে। নাম ধরে ডাক দিলে রাজসভায় যাবি। তবে একটু সাবধানে থাকবি। সাহেবটা বড়ো শয়তান। আমি দর্শকের আসনে চললুম।

সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি, মুখ ভর্তি অজস্র ছোট ছোট কালো তিলের দাগ। ওলভাতেতে সর্ষেবাটা মাখলে যেমন দেখায়—সাহেবের সাদা মুখে কালো তিল থাকার ফলে ঠিক তেমনি দেখাচ্ছে।

আমাকে দেখে বেবুনের মতো চোখ পিট্‌পিট্ করতে করতে বললে ঃ হোয়াট্ ডু ইউ ওয়ান্ট?

আমি শান্তভাবে উত্তর দিলুম ঃ আই ওয়ান্ট টু কংকার রাজকুমারী রম্ভাবতী।

সাহেব খেঁকশিয়ালের মতো খেঁক্ খেঁক্ করে ওঠে ঃ ইউ ব্লাডি—নেটিভ—কালা আদমি, গেট আউট্! গেট আউট!

আমি বললুম ঃ ডোন্ট বি সাচ্ ইম্‌পেসেন্ট স্যার! আই উইল শো ইউ এইট ব্যানানাজ!

ব্যানানা? —সুর যেন একটু নরম হয়ে আসে সাহেবের।

ভেরি ভেরি সাব্‌স্ট্যান্‌সিয়াল ফুট! আই অ্যাম্ ফন্ড অব ব্যানানা!

এইট 'ব্যানানাজ' মানে যে অষ্টরম্ভা'—তাও বোঝবার ক্ষেমতা নেই! হতচ্ছাড়া সাহেব এই ইংরেজিজ্ঞান নিয়ে এয়েচে রাজকুমারিকে ইংরেজি শেখাতে!

খুশি খুশি ভাব নিয়ে বলে সাহেব ঃ হোয়াট্‌স্ ইওর নেম?

ঃ মাই নেম ইজ শ্রীভাঁট্‌কুলিয়া রায় বাহাদুর।

ঃ বাঁট্‌কুলিয়া? ভেরি গুড্! বাট্ হয়ার্স ইওর ব্যানানা?

আমি এবার বুড়ো আঙ্গুল দুটি দেখিয়ে বলি ঃ দিজ আর এইট ব্যানানাজ ঃ ইউ উইল হ্যাভ্ অষ্টরম্ভা—নট রম্ভাবতী!

আর যায় কোথা, গর্জে উঠলো সাহেব ঃ ইউ ব্ল্যাক্ মাংকি, গেট আউট এট্‌ওয়ান্স!

আমিও ততোধিক টেম্পো নিয়ে বললুম ঃ হোয়াই স্যার? আর ইউ ষষ্ঠীচরণ অ্যান্ড অ্যাম্ আই ষষ্টে? ওয়েট স্যার—ওয়েট, ওভার বার্ন্ট ব্রিক উইল বি রাব্‌ড্ অন ইওর নোজ!

Table of Contents

ঃ হোয়াট?

এবার আমি বিশুদ্ধ মাতৃভাষায় বললুম ঃ তোর নাসিকায় ঝামা ঘর্ষিত হইব,—বুঝলি র‍্যা গন্ধগোকুল?

ঠিক সেই সময় রাজার এক কর্মচারি এসে আমাদের ডাক দিলো। নইলে একটা কিছু কেলেংকারী ঘটে যেতো হয়তো।

রাজসভায় গিয়ে দেখি, সব বড়ো বড়ো লোকজনে সভা গম্‌গম্‌ করছে! একজন রাজ কর্মচারি এসে সভার সকলকে দাঁড়াতে ইঙ্গিত করলো। তার পোশাক দেখে মনে হয় হি ইজ ওয়ান অব্‌ দি হোম্‌ড়া-চোম্‌ড়াজ। ঘোষক হিন্দীতে ষা ঘোষণা করলো—তার অর্থ হচ্ছে—মহাপরাক্রমশালী—মহান শক্তিধর—মহাগুণী, মহাজ্ঞানী—মহাবীর্যবান—মহারাজ জবরজং সিংহ বাহা-দু-র!

তারপর মহারাজের দর্শন পাওয়া গেল। প্রচুর তৈলমর্দন ও ঘৃত ভক্ষণের ফলে চেহারাটি একটি মুলতানী গাভীর আকার ধারণ করেছে। নদ্‌বদ্‌ করতে করতে কোন রকমে এসে সিংহাসনে কাতিয়ে পড়লেন মহারাজ। পাশ থেকে তাঁর বিশাল ভুঁড়িটি দেখে মনে হয়, এস্কিমোদের একটি 'ঈগ্‌লু'।

এবার একের পর এক নাম ডাক হতে থাকে। রাজসভায় সব কথাই হিন্দীতে চলছে কিন্তু। কারণ হিন্দী ছাড়া অন্য কোন ভাষা এখানে অচল।

চার পাঁচজনের পর ডাক পড়লো সেই ওলভাতে সাহেব টম্‌সনের।

সাহেব তো উঠেই লম্বা এক স্যালুট ঠুকে, পকেট থেকে এক ডেলা মিছরী বার করে ফেললে। নিজেই সেটা চিবিয়ে—চুষে এবং চেটে খেয়ে দেখিয়ে দিলো। তারপর এক গ্লাস জল চাইলো, গুলবে বলে।

রাজামশাই এবার হেসে বললেন ঃ খুব কেরামতি দেখিয়েছো সায়েব? এবার বসে পড়ো।

এরপর আর একটি লোক উঠে একটা ডাব বার করলো ঝুলি থেকে। বললে ঃ মহারাজ, এই ডাবের নরম শাঁস ইচ্ছে করলে চিবিয়ে, চুষে এবং চেটেও খেতে পারেন। আর এর জলটা সহজেই পান করা চলে। অতএব মহারাজ, রাজ্য ও রাজকন্যার দাবি একমাত্র আমিই করতে পারি!

মহারাজ একটু ভেবে বললেন ঃ শাঁস ও জল দুটি আলাদা বস্তু হয়ে যাচ্ছে যে। যে কোন একটা বস্তু হতে হবে তো। যাই হোক, তুমি বসো; এর থেকে উত্তম কিছু না পেলে—তোমার কথাই ভাবা যাবে।

শেষকালে ডাক পড়লো আমার। আমি এবার ফ্লাস্ক খুলে বের করলুম একটা আইস্‌ক্রীম। কাঠির দিকটা রাজার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললুম ঃ এর খানিকটা চিবিয়ে খান মহারাজ।

বলার সঙ্গে সঙ্গে রাজা একেবারে আধখানা মুখে পুরে মারলেন ঝেড়ে এক কামড়। তারপরেই চি—হিঁ—হিঁ—হিঁ শব্দে ঘোড়ার ডাক ডাকতে শুরু করে দিলেন। আইস্‌ক্রীমও সজোরে কামড় বসিয়েছে রাজার দাঁতে! ঠাণ্ডার চোটে রাজামশাই সিংহাসন ছেড়ে উঠে টুইস্ট নাচ নাচতে লেগে গেলেন। যতো দাঁত কন্‌কনিয়ে ওঠে, রাজামশাইও ততো নাচতে থাকেন। অথচ ফেলতেও পারছেন না এমন সুখাদ্যটিকে। কোন রকমে সেটি উদরস্থ করে সিংহাসনে এলিয়ে পড়েন রাজা। বললেন ঃ বঢ়িয়া চীজ হ্যায়!

Table of Contents

সেই আইস্‌ক্রীম বাকি অর্ধাংশ রাজার হাতেই ছিলো। বললুম ঃ এবার একটু চুষে খেয়ে দেখুন। কৈলে বাছুরে যেমন গোরুর বাঁট চোষে—সেইভাবে রাজা আইস্‌ক্রীম চুষতে থাকেন চুক্‌চুক্‌ করে আর কচি ছেলের মতো খিল্‌খিল্‌ করে হেসে ওঠেন আনন্দে। বললেন ঃ বহুৎ আচ্ছা!

এবার বললুম ঃ একটু চেটে খান মহারাজ। রাজাও জিভ বের করে চাটতে লেগে গেলেন। যেন গাই গোরুতে বাছুরের গা চাটছে।

শেষে যেটুকু বাকি ছিলো—সেটুকু একটা গ্লাসে কিছুক্ষণ রাখার পর গলে গেলে, রাজাকে পান করতে দেওয়া হলো।

রাজামশাই বললেন ঃ আউর নেই হ্যায়? আমি বললুম ঃ জরুর। একটি একটি করে দিই আর রাজা খেয়ে চলেন। গোটাকুড়ি খাওয়ার পর রাজা ক্ষান্ত হলেন। অবশিষ্ট যা ছিলো, সভার সকলকে একটা করে খাইয়ে দিলুম।

সভায় ধন্যি ধন্যি পড়ে গেলো বাংলা মুল্লুকের! সবাই একবাক্যে স্বীকার করলো ঃ সত্যি, বাংলা একটা আস্‌লি গুণীর দেশ!

রাজামশাই সিংহাসন থেকে উঠে এসে আমার হাত ধরে তাঁর পাশের সিংহাসনটিতে বসালেন খাতির করে।

এবার রাজকন্যা রম্ভাবতীর মালা দেবার পালা—এই সময় আমি বাধা দিয়ে বললুম ঃ ঘরে আমার বিবাহিতা পত্নী আছে। সুতরাং রাজকন্যার বরমাল্য তো আমি গ্রহণ করতে পারি না মহারাজ!

মহারাজ বললেন ঃ তাতে কী হয়েছে! সে যুগে রাজাদের একাধিক পত্নী ছিলো, যেমন—দশরথ, পাণ্ডু প্রভৃতি! আমার কন্যাও তোমার প্রথমা পত্নীর সঙ্গে একত্রে বাস করবে। তোমার কোন চিন্তা নেই।

মহামুশকিলে ফেললেন আমায়! শেষে বুদ্ধি খাটিয়ে আসলি বাত ছাড়লুম ঃ মহারাজ, ঘরমে হামারা যো স্ত্রী হ্যায়না,—বেদম হাড়বজ্জাত জেনানা হ্যায়! অ্যায় বদ্‌খ্‌ জেনানা দুনিয়ামে দুস্‌রা নেহি মিলে গা! আপকা লেড়কীকো হাড়-মাস দগ্ধ করকে ছাড়ে গা! হাড় খায়গা, মাস খায়গা আউর চামড়া লেকে ডুগ্‌ডুগি বানায়গা!

রাজামশাই চম্‌কে উঠে বললেন ঃ তাড়কা রাখ্‌ছসি হ্যায় কেয়া? আমি বললুম ঃ জি হ্যাঁ, আপ ঠিক ধরা হ্যায় মহারাজ! রাক্ষুসি হ্যায়!

ঃ তব কেয়া হোগা? রাজা খুব চিন্তিত হলেন।

রাজাকে আশ্বাস দিয়ে বললুম ঃ মহারাজ, রাজকন্যে আমার বহিন। ওঁর উপযুক্ত পাত্রের ব্যবস্থা আমিই করে দিচ্ছি। এই রাজ্যের উত্তরে গুলঝাড়িপুর রাজ্য। সেই রাজ্যের একমাত্র যুবরাজ শ্রী ব্লাফ্‌ফাদিত্য আমার পরম বন্ধু। আমার চিঠি পেলে সে নিশ্চই এসে যাবে এবং এ বিবাহে রাজি হবে। তার মতো গুণী-জ্ঞানী পুরুষের হাতে রাজকন্যা রম্ভাবতীকে প্রদান করুন, সুখী হবে।

রাজামশাই বললেন ঃ তোমার যা মর্জি হয় করো বাবা ভাঁটকুলিয়া! আমি সব ভার তোমার হাতে তুলে দিলুম। চারজন লোক চিঠি নিয়ে গুল্‌ঝাড়িপুরের যুবরাজ শ্রীব্লাফ্‌ফাদিত্যকে আনতে গেলো ঘোড়া ছুটিয়ে।

এবার কিন্তু ওলভাতে সাহেব টম্‌সনকে একটু শিক্ষে দেবার লোভ পেয়ে বসলো

Table of Contents

আমায়। একখণ্ড ঝামা দেখিয়ে বললুম ঃ সায়েব, লুক অ্যাট দিস্ ওভার বার্নট ব্রিক্। আই উইল রাব্ ইট অন ইওর নোজ—অ্যাকর্ডিং টু মাই প্রমিস্!

শুনে তো সাহেব ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেললো। হাঁটুগেড়ে বসে, রীতিমতো ভারতীয় কায়দায় হাতজোড় করে বললে ঃ ফরগিভ মি, মিস্টার বাঁট্কুলিয়া!

হাসি পায় সাহেবের কাণ্ড দেখে। মনে হলো—রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের সম্মুখে নতজানু হয়ে ক্ষমা ভিক্ষে করছে দুর্ধর্ষ পশুরাজ!

সব শুনে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো যে, সাহেবের মাথা কামিয়ে, ঘোল ঢেলে, গাধার পিঠে চাপিয়ে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে।

মাথা আর কামাতে হলো না সাহেবের। মাথায় এক গাছাও চুল ছিল না—সবটাই টাক। সেই টাকে এক হাঁড়ি পচা ঘোল ঢেলে, গাধার পিঠে চাপিয়ে বিদেয় করা হলো ওলভাতে সাহেব টম্সনকে।

রাজা আমাকে প্রচুর অর্থ ও সোনাদানা দিতে চাইলো। আমি কিছুই নিলুম না। সেই সময় এই ছড়িটির মাথায় ফিটকরা ডিবে খুলে রাজাকে নস্যি নিতে দেখে বললুম ঃ মহারাজ, আপনার স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রাখবার জন্যে ওই ছড়িটি আমায় উপহার দিন।

রাজা তো শুনে মহা খুশি! হেসে বললেন ঃ এটা রুপোর তৈরি; এটা দোবো না। সোনার তৈরি যে ছড়িটা আছে, সেটা দিচ্ছি।

না মহারাজ, আমি বললুম ঃ সোনার ছড়ি নিয়ে পথে ঘাটে বিপদে পড়তে পারি। আপনি ওটাই দিন আমায়।

এই ছড়িটাই হলো দোম্বাগড়ের মহারাজ জবরজং সিংহ বাহাদুরের উপহার। বুঝলি র‍্যা বীর নপুংসকের দল?

এই বলে দাদু আর একটিপ নস্যি নিয়ে সজোরে মারলেন সুখটান।

Table of Contents

‘মেটা-মর্-ফোঁস’

সুবোধ দাশগুপ্ত

আর একটা পিরিয়ড। তারপই ছুটি। ছুটি মানে খেলার মাঠ। সেই সঙ্গে চিনাবাদাম ভাজা।

ইংরাজি গ্রামার-ট্রানস্লেশনের টিচার ক্লাসে ঢুকতে না ঢুকতেই কেশব দাঁড়িয়ে বললে,—স্যার, ওরা আমাকে মেটামর্‌ফোঁস বলছে।

স্যার বললেন,—মেটামর্‌ফোজ? সে তো কোন আপত্তিকর ব্যাপার নয়—একটা ইংরাজি কথা। তাতে তুমি আপত্তি করছো কেন?

কেশব মাথা নেড়ে বললে,—না স্যার, ওরা ইংরেজি করে বলছে না, বলছে বেশ কায়দা করে।

—তার মানে?

এবার কেশব একটা ঢোঁক গিলে বললে, স্যার, ওরা প্রথমে বলে মেটা, আমার নাম মেটা কিনা, তাই প্রথমে বলে ‘মেটা’। তারপর দু সেকেন্ড থেকে—

স্যার বাধা দিয়ে বললেন,—তোমার নাম মেটা?

—হ্যাঁ স্যার, আমার নাম কেশবলাল মেটা।

—ওঃ আচ্ছা! তারপর?

আমাকে দেখলেই প্রথমে বলে ‘মেটা’—অকপটে ব্যক্ত করে কেশব। তারপর দু সেকেন্ড থেমে বলে ‘মর্’ তারপর ডান হাতের কনুইটা বাঁ হাতের চেটোর ওপর রেখে হাতটাকে সোজা করে দাঁড় করিয়ে আঙুলগুলো বাঁকিয়ে ‘ফোঁস’ করে ওঠে।

Table of Contents

আমরা অতিকষ্টে হাসি চেপে আছি। স্যারেরও বোধহয় একটু... যাঁই হোক তিনি মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে টেবিলের ওপর সপাং করে বেতের এক ঘা বসিয়ে বললেন, বটে!

বলেই বেঞ্চিগুলোর ওপর সন্ধানী দৃষ্টি ফেললেন তিনি।

গোটা ক্লাস তখন দম বন্ধ করে আছে কি হয় কি হয় আশঙ্কায়।

স্যারের সার্চলাইট একের পর এক মাথা টপকে সহসা থমকে দাঁড়াল এক জায়গায়। বজ্রকণ্ঠে আদেশ হল ঃ এই, বানান করো মেটামর্‌ফোজ।

বলির পাঁঠার মতো কাঁপতে কাঁপতে শম্ভু উঠে দাঁড়িয়ে বললে,—আমি স্যার ওসব কিছু বলিনি। ওকেই জিজ্ঞেস করুন।

স্যার বললেন,—তোমাকে কিছু বলতে বলিনি, শুধু বানান করতে বলেছি!

শম্ভু বললে,—বানান করব স্যার?

—হ্যাঁ।

ও! —শম্ভু কেমন যেন উদাস হয়ে গেল। তার এই উদাস ভাব অবশ্য বেশিক্ষণ রইল না। স্যার বেতহাতে উঠে দাঁড়ানো মাত্র শম্ভু দম দেওয়া পুতুলের মতো গড়গড় করে বলে গেল, এম এ টি এ মেটা, এম ও আর মর্, এফ ও এস ফোস। বলেই শম্ভু বসতে যাচ্ছিল, স্যার বলে উঠলেন, দাঁড়িয়ে থাকো।

শম্ভু পাশেই আমি। সুতরাং সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত অনিবার্য।

—তুমি বল তো?

আমার বুকের ভেতরটা টিপটিপ করতে লাগল। উঠে দাঁড়িয়ে যা পারি বলে ফেললাম। বলেই বুঝতে পারলাম ঠিক হয়নি। কারণ সঙ্গে সঙ্গেই স্যারের বেতটা টেবিলের ওপর সপাং করে পড়ল।

এবার স্যার বলে উঠলেন, যত্তো সব? লেখাপড়ায় মন নেই, ডেঁপোমিতে ওস্তাদ।

এই বলে তিনি ব্ল্যাকবোর্ডের ওপর খড়ি দিয়ে বড় বড় অক্ষরে লিখে দিলেন ঃ Metamorphose—রূপান্তরিত করা বা হওয়া।

শম্ভুকে এবং আমাকে বললেন, ছুটির পর পঞ্চাশবার কথাটা অর্থ সমেত খাতায় লিখবে এবং আমাকে দেখিয়ে বাড়ি যাবে।

ছুটির ঘণ্টা বেজে গেল। স্যার বেরিয়ে যেতে ক্লাসের আর সব ছেলে হৈ হৈ করতে করতে চলে গেল। আমি আর শম্ভু চুপচাপ বসে রইলুম।

শম্ভুকে বললাম,—তোর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে আমার এই উপকার হল।

শম্ভু বললে,—বা রে, সব বুঝি আমারই দোষ হল? তুই ঠিক-ঠিক বলতে পারলি না, তাই তো এই শাস্তি!

বললাম,—তুই যদি আমার বন্ধু না হতিস আর আমি যদি তোর বন্ধু না হতাম, তাহলে আমি তো অনেক দূরের বেঞ্চে বসতাম। তাহলে তো স্যারের নজর আর আমার দিকে পড়তো না।

শম্ভু কথাটা ঘুরিয়ে নেবার জন্য বললে,—আমাদের কেশবলালের পেটে পেটে যে এত, আগে তা কে জানতো।

বললাম,—থাক, আর বকবক করিস না। এখন লিখতে আরম্ভ কর, পঞ্চাশবার লিখতে হবে।

পঞ্চাশবার লিখে খাতাটা দেখাতে স্যারের কাছে গেলাম। তিনি না দেখেই সই করে

Table of Contents

দিলেন। বললেন,—কাল তোমাদের ইংরাজি পরীক্ষা হবে। পঞ্চাশের কম যদি নম্বর পাও তাহলে এই বেত তোমাদের পিঠে...

আমরা তাড়াতাড়ি সেখান থেকে পালিয়ে এলাম।

গ্রামের স্কুল হলে কি হবে, আমাদের স্কুলটা বেশ বড় এবং ভাল স্কুল বলে বেশ নাম-ডাকও আছে। স্কুলবাড়িটার একদিকে আমাদের থাকবার বোর্ডিং, অন্যদিকে খেলার মাঠ।

আমরা বোর্ডিং-এর দিকে না গিয়ে খেলার মাঠের দিকে চললাম। যেতে যেতে শম্ভু বললে,—এর মানেটা কি হল?

বললাম,—কিসের মানে?

—এই যে স্যার বললেন কাল পরীক্ষা!

শম্ভুকে বুঝিয়ে বললাম,—তুমি তো নতুন এ স্কুলে এসেছো, তাই এখানকার সব ব্যাপার ভাল করে বুঝে উঠতে পারো নি। আমাদের স্কুলে প্রত্যেক শনিবার একটা করে পরীক্ষা হয়। একে বলে সাপ্তাহিক পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় ফলে আমাদের সব সাবজেক্টের বেশ ভাল রকম রিভিশন হয়ে যায়। কোথায় আমরা ভুল করি, কেন ভুল করি, এ সব জানা হয়ে যায়। তাই আমাদের স্কুলের এত নাম।

শম্ভু বললে,—সে তো বুঝলাম। কিন্তু হুস করে ঘাড়ের ওপর পঞ্চাশ নম্বর চাপিয়ে দেওয়াটা কি ঠিক হল?

আরে ও কিছু না। —আমি আশ্বাস দিই—আজ একটু রাত জাগতে হবে, এই যা! বইগুলো একটু উল্টেপাল্টে দেখে নিলেই হবে!

শম্ভু মুখ ভার করে বললে,—খুব বলেছিস! আরে এরকম উপদেশ তো সকলেই দিতে পারে। স্যার থেকে আরম্ভ করে আমাদের কেশবলাল পর্যন্ত সকলেই এ রকম উপদেশ দিতে পারে। আমার ছোটবোনও চিঠিতে লেখে ঃ বেশ মনোযোগ দিয়ে লেখা-পড়া করবে। তাহলে তুই বন্ধু হয়ে আমার কি উপকারটা করলি?

মাঠে তখন খেলা চলছে। হঠাৎ দেখি, চার-পাঁচ জন ছেলে একটা স্ট্রেচারে করে আমাদের ক্লাসেরই কানাইকে নিয়ে যাচ্ছে।

জিজ্ঞেস করতে ওরা বললে,—কানাইকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি।

—কেন?

উত্তরে ওরা কি বলল বুঝতে পারলাম না।

আমাদের বোর্ডিং-এর পাশেই ছোটখাট একটা হাসপাতালের মতো আছে। একজন ডাক্তারও আছেন। কারো অসুখ করলে তাকে ওই হাসপাতালে গিয়ে থাকতে হয়।

কানাইয়ের ব্যাপারটা পরে শুনলাম। ফুটবল খেলতে খেলতে ও হয় পা পিছলে পড়ে যায়, নয়ত কেউ ধাক্কা দিয়ে ওকে ফেলে দেয়। যেখানে পড়ে, সেখানটায় ছিল আস্ত একটি থান ইট। তাইতে মাথা লেগে ওর মাথাটা একটু ফেটে যায়, পায়েও বেশ চোট লাগে।

শম্ভু বললে,—হাসপাতালে ওকে কি ফার্স্ট এড দিয়ে ছেড়ে দেবে?

—আরে না, অন্তত তিনদিনের ধাক্কা।

—তাহলে তো কাল ও পরীক্ষা দিতে পারবে না।

—না, তা পারবে না, তবে তার জন্যে ওকে কোন রকম জবাবদিহি করতে হবে না।

Table of Contents

শম্ভু বলে উঠল,—হাউ লাকি!

—কি বকছিস তুই! ছেলেটার মাথা ফেটে গেল, আর তুই বলছিস হাউ লাকি।

শম্ভু বললে,—আরে সে জন্যে বলিনি। পরীক্ষা দিতে হবে না বলেই বলছি।

বললাম,—এখনিতে ওকে কাল পরীক্ষা দিতে হত না।

কেন, কেন—শম্ভু উদ্‌গ্রীব।

—কাল আমাদের ফুটবল টিম যাচ্ছে ময়নাগুড়িতে ম্যাচ খেলতে। ও তো আমাদের টিমের একজন ভাল খেলোয়াড়।

থাক্ আর বলতে হবে না। —বাধা দিয়ে শম্ভু বলে ঃ আচ্ছা, তুই তো আমার বন্ধু?

বললাম,—তোমার সন্দেহ হচ্ছে নাকি?

—একটা উপকার করতে পারবি?

—কেন পারব না?

—তাহলে আমার মাথাটা কোনমতে ফাটিয়ে দে।

শুনে কয়েক মুহূর্ত আমি হাঁ। শেষতক বললাম,—স্যারের হুমকি খেয়ে তোর মাথাটা বেশ গোলমেলে হয়ে গেছে। চল্, আইসক্রীম খেয়ে মাথাটা একটু ঠাণ্ডা করে নি।

শম্ভুকে এক রকম টানতে টানতেই নিয়ে চললাম। মাঠের শেষে অনেক দোকান আছে। সেখানে একটা আইসক্রীমওয়ালাও এসে বসে থাকে এবং সেখানে আমাদের স্কুলের ছেলেদের বেশ একটা আড্ডা জমে। আজও আসর জমেছিল তবে আমাদের তো এমনিতেই একটু দেরি হয়ে গেছে, তাই ওখানে গিয়ে দেখলাম, আড্ডা প্রায় ফাঁকা। উল্লেখ করার মতো এক আছেন মন্টুদা।

মন্টুদা আমাদের দু ক্লাশ উঁচুতে পড়েন এবং আমাদের স্কুলের ফুটবলের ক্যাপ্টেন। ক্যাপ্টেন হবার দরুন তিনি সকলেরই মন্টুদা।

মন্টুদাকে দেখে শম্ভু কেন জানি না বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠল। কোন ভূমিকা না করেই শম্ভু বলে উঠল,—মন্টুদা, তোমাকে কাটলেট খাওয়াবো।

একটা হাতলভাঙা চেয়ারে এতক্ষণ গা এলিয়ে বসে ছিলেন মন্টুদা। কাটলেটের কথায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠে দাঁড়িয়ে সংশয়-বেঁধা হাসি হেসে বললেন,—কি ব্যাপার বল্ তো!

শম্ভু অম্লান বদনে বললে,—না, ব্যাপার বিশেষ কিছুই নয়। কাল তোমরা ম্যাচ খেলতে যাচ্ছ, তাই একটু উৎসাহ দেবার চেষ্টা করছি।

মন্টুদা বললেন,—তা মন্দ বলিস নি। বেশ বেশ। চল্, তাহলে ওই দোকানটায় গিয়ে বসি।

দোকানে গিয়ে আমরা তিনজনেই বসলাম। কাটলেটও এল। অর্ডারটা শম্ভুই দিল, দামটা হয়ত শেষ পর্যন্ত আমাকেই দিতে হবে। বন্ধুর জন্য এসব একটু করতেই হয়।

কাটলেট চিবুতে চিবুতে শম্ভু বললে,—কিন্তু মন্টুদা, একটা যে খিঁচ রয়ে গেল।

—খিঁচ? কি রকম?

কানাই তো ঠ্যাং ভেঙে শুয়ে আছে। একজন ভাল প্লেয়ার যে কমে গেল। —চিন্তাক্লিষ্ট কণ্ঠে বললে শম্ভু। —হুঁ, আমিও সেই কথাই ভাবছিলাম।

এবার শম্ভু বেশ একটু উৎসাহিত হয়ে বললে,—তাহলে আমাকে ওর জায়গায় নাও না।

মন্টুদা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন,—তুই? ফুটবল খেলতে পারিস?

Table of Contents

শম্ভুর হয়ে এবার আমাকে বলতে হল,—হ্যাঁ, মন্টুদা, ও খুব ভাল খেলতে পারে। ও তো আমাদের স্কুলে নতুন এসেছে। আগে যে স্কুলে ছিল সেখানে ওর বেশ নাম-ডাক ছিল।

—ডাক-নাম ছিল? তা তো থাকতেই পারে। তার সঙ্গে ফুটবলের সম্পর্ক কোথায়?

আরে ডাক-নাম নয়,—আমি শুধরে দিলাম—নাম-ডাক, মানে ফুটবলে নাম-ডাক আর কি।

—তাই নাকি! তাহলে আমাদের মাঠে খেলতে নামিস না কেন?

শম্ভু বললে,—কেন খেলি তো। তোমার নজরে হয়ত পড়িনি।

মন্টুদা বললেন,—তা হবে। তবে শোন, তোকে কালকে আমি নিতে পারছি না। কারণ কালকের খেলাটা হল চ্যালেঞ্জ খেলা, মান-ইজ্জতের ব্যাপার। ওরা আমাদের বার বার তিনবার হারিয়েছে। কালকে আমাদের জিততেই হবে। তাই নতুন খেলোয়াড়দের চান্স দেওয়া চলবে না। তবে তোর খেলা এখন থেকে আমি দেখবো এবং কোন ফ্রেন্ডলি ম্যাচে তোকে চান্স দেব, বুঝলি?

শম্ভু বললে,—তা তো বুঝলাম, কিন্তু কালকের জন্যে কি করছো? আমি না হয় না-ই খেললাম, আমাদের টিমটা তো মজবুত হওয়া দরকার। এই খেলার সঙ্গে আমাদের স্কুলের নাম জড়িয়ে আছে, তার মানে আমরাও জড়িয়ে আছি।

মন্টুদা বললেন,—তুই ভাল কথাই বলেছিস। হুঁ, বিজয়কে কালকে মাঠে নামতে হবে। ও খেলে ভাল, তবে ওর জায়গায় আর একজনকে নিতে হবে।

শম্ভু তক্ষুনি জিজ্ঞেস করল,—ওর জায়গায় মানে?

মন্টুদা বললেন,—ওকে লাইন্সম্যান করে নিয়েছিলাম। ওকে যদি মাঠে নামাই, তাহলে একজন লাইন্সম্যানের দরকার হবে।

শম্ভু মন্টুদার দুটি হাত ধরে বললে,—মন্টুদা, তুমি আর একটা কাটলেট খাও। আর আমাকে খেলতে না দাও, লাইন্সম্যান হবার সুযোগটা অন্তত দাও।

—তুই লাইন্সম্যানগিরি করবি?

—কেন করবো না।

মন্টুদা একটু ভেবে বললেন,—বেশ তাহলে তা-ই হবে। কাল সাড়ে আটটায় এখান থেকে বাস যাবে। তার আগেই রেডি হয়ে থাকবি। বেশি ডাকাডাকি করতে যেন না হয়।

পরদিন সকালে বাসে চড়ে ড্যাং ড্যাং করতে করতে শম্ভু চলে গেল ময়নাগুড়ি। আমি একাই গেলাম পরীক্ষা দিতে। ইংরেজির স্যার আমাদের সকলকে দেখলেন, মনোযোগ দিয়ে লিখতে বললেন,—তারপর হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, শম্ভু কোথায়?

বললাম,—স্যার ও তো সকালে ময়নাগুড়ি গেছে ফুটবল খেলতে।

—ও ফুটবল খেলে নাকি?

আমি চুপ করে রইলাম।

স্যার তখন বেশ হাসিমুখেই বললেন,—বেতটা তাহলে আর ভাঙা গেল না। ওই দেখছি মেটারমর্‌ফোজ্‌ড্‌ হয়ে গেল!

Table of Contents

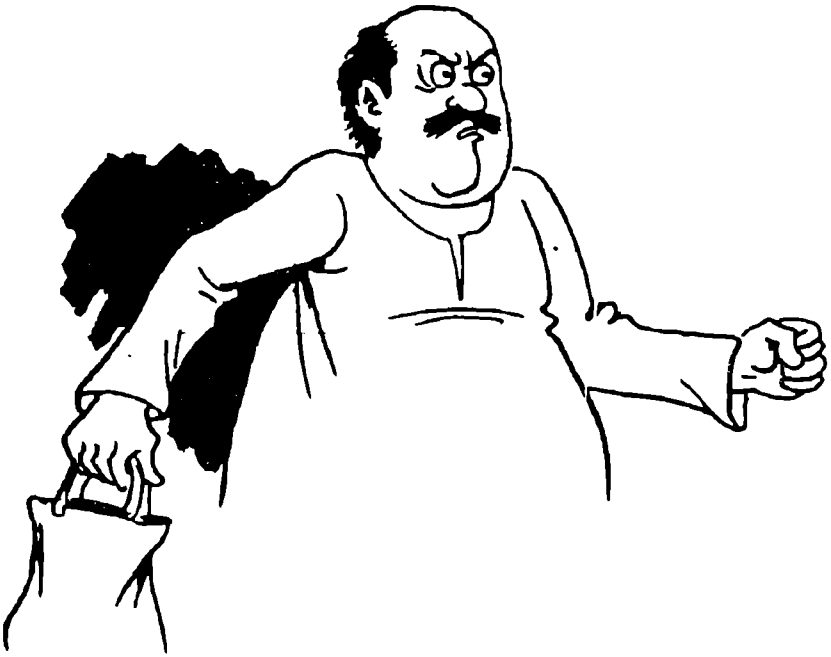

ঘটোৎকচ জেঠুর গল্প

ভগীরথ মিশ্র

ঘটোৎকচ জেঠুকে নিয়ে কিছু লেখার আগে তাঁর সম্পর্কে গুটিকয়েক কথা জানিয়ে রাখা ভালো।

প্রথম কথা, তাঁর আসল নাম ঘটোৎকচ নয়। তিনি যখন চাকরি করতেন, তখন খুব করিতকর্মা ছিলেন। প্রায় দিনই, তাঁর ঘরে মক্কেলরা আসতো। সঙ্গে আনতো ঝুড়ি ভর্তি আলু, পটল, কৌটো ভর্তি খাঁটি ঘি, পাকা রুই, নধর ছাগল। প্রকাশ্য দিবালোকে শতচক্ষুর সুমুখে এ সব বস্তু সগৌরবে ঢুকে যেতো তাঁর অন্দরে। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে, ঘরের মধ্যে বুঝি কোনও শাহানশাহর অধিষ্ঠান। তাই বুঝি নজরানা, উপঢৌকন আসছে অবিরত। এমন ঘটা করে উৎকোচ নিতেন বলে পাড়ার লোকেরা তাঁকে ঘটোৎকচ বলে ডাকতে শুরু করে দিলো।

এই নামে ডাকবার আরও একট ছোট্ট কারণ ছিল। মক্কেলের দেওয়া মাছ-মাংস-ঘি-তরিতরকারি প্রচুর পরিমাণে মুফতে পাওয়া বস্তু উদরস্থ করে করে তিনি একটি মফৎলাল বনে গিয়েছিলেন। তাঁর শরীরের মধ্যভাগ ফুলে-ফেঁপে জয়ঢাকের আকার নিয়েছিল।

দ্বিতীয় কথা, তিনি আইনত কোনদিনই কারুর জেঠু ছিলেন না। কারণ, তাঁর নিজের

Table of Contents

তো নয়ই, কস্মিনকালে কোনো 'তুতো' ভাইয়ের সন্ধানও পাওয়া যায়নি। এ নাম পাড়ার লোকেরা তাঁকে ভালোবেসে দিয়েছিলো, তাঁর ঐ বিশাল বপুর জন্যই। সবাইয়ের গড়পড়তা জেঠু তিনি। খানিকটা সূর্যিমামার মতোই য়্যুনিভার্সাল।

তা এতসব উপঢৌকন কি করে খেতেন ঘটোৎকচ জেঠু? এক দিনেই কি খেতে পারতেন ঐ বিশাল সম্ভার?

এ প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয়, না। রয়ে সয়ে অনেক দিন ধরেই খেতেন। তাঁর অনেকগুলো ব্যাঙ্ক ছিল। হ্যাঁ, ব্যাঙ্কই বলা চলে। বাজারের এক নিরীহ মতো সবজিওয়ালা ছিল তাঁর সবজির ব্যাঙ্ক। মাছের দোকানে মাছ-ব্যাঙ্ক, মাংসের দোকানে মাংস-ব্যাঙ্ক। উপঢৌকন পাওয়া মাত্রই ব্যাঙ্কে জমা করে দিতেন সে সব জিনিস। আসল ওজনের ওপর একটা 'বাট্টা' ছেড়ে দিতেন দোকানদারকে। তারপর খেপে খেপে, প্রয়োজনমতো, যে জিনিস যেটুকু দরকার তুলতেন ব্যাঙ্ক থেকে।

...রিটায়ার করার পর, বড় কষ্টে পড়লেন ঘটোৎকচ জেঠু। উপঢৌকন তো আর আসে না। খানাপিনা তাই বন্ধ। ঘটোৎকচ জেঠু ক্রমশ রোগা হতে লাগলেন। চোখের কোণ বসে গেলো। বিরাট জয়ঢাক চুপসে যেতে লাগলো ক্রমশ। আবার থলি হাতে বাজারে বেরুতে লাগলেন ঘটোৎকচ জেঠু।

সেদিনও যথারীতি বাজারে ঢুকে সবজির দোকানে বেগুনের দরদস্তুর করছিলেন তিনি। দোকানদার দাম হেঁকেছে, এক টাকা কেজি। অক্ষিকোটরের মধ্যেই ঘটোৎকচ জেঠুর বর্তুলাকার চোখদুটো ঘুরতে লাগলো বন্‌বন্‌ করে। বলে কি! এ-ক টা-কা!

—কম করো বাপু, একেবারে হাতে মাথা কেটো না।

কমই বলেছি স্যার। সব জিনিসের দামই তো বাড়ছে। আমরা কি করে বাঁচি বলুন।—দোকানদারের সাফ জবাব।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন ঘটোৎকচ জেঠু। বলে কি? ক্ষেতের ফসল বইতো নয়। তারই অত দাম! আসলে ঘটোৎকচ জেঠুর তো চিরদিনই ধারণা ছিল ক্ষেতের তরিতরকারি এমনি এমনি ঝাঁকাবন্দী হয়ে চলে আসে গেরস্থের দোরে। এতদিন তো তাই এসেছে তাঁর ঘরে। সে সব জিনিস যে এত দামে কিনতে হয়, তাই কি তিনি স্বপ্নেও ভেবেছেন কোনদিন?

...প্রায় আধ ঘণ্টা ধস্তাধস্তির পর, ছিয়ানব্বুই পয়সায় রফা হলো। আড়াই শো গ্রাম বেগুন কিনে, একটা সিকি বাড়িয়ে দিলেন ঘটোৎকচ জেঠু।

এক পয়সা তো নেই, স্যার! —দোকানদার বিব্রত হাসি হাসলো। সেটা তো ঘটোৎকচ জেঠু জানেনই। এক পয়সা তো প্রায় মেলেই না আজকাল। তাঁর পকেটেও থাকে না কখনও। না থাক্‌। এগিয়ে চললেন তিনি। এক টাকার বদলে ছিয়ানব্বুই পয়সায় জিনিসটা পাওয়া গেছে, এই ঢের। কম দামে কেনাটাই আসল কথা।

বাজারের মধ্যে হাঁটাহাটি করতে করতে একসময় মাংসের দোকানের সামনে এসে থমকে দাঁড়ালেন ঘটোৎকচ জেঠু। দোকানের সামনে বেজায় ভিড়। একটা নধর ভেড়া কেটে ঝুলিয়েছে নগেন কসাই। লাল টকটকে মাংসের কিছু তাল সাজানো রয়েছে সামনে। দেখতে দেখতে... জিভে জল এসে গেল ঘটোৎকচ জেঠুর। পুরোনো দিনগুলোর কথা মনে পড়ে গেল। কত্তো মাংস খেয়েছেন তিনি এককালে। ভেড়ার মাংসের কাবাব কিংবা রোস্ট যা খাসা লাগে খেতে! আজও সে স্বাদ যেন লেগে রয়েছে জিভে!

Table of Contents

ভিড়টা খানিক কমতেই, পায়ে পায়ে দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। বললেন,—পাঁচ কেজি মাংস ওজন করো তো হে, জলদি।

নগেন কসাই ঘটোৎকচ জেঠুর মেজাজটা চেনে। সে তড়িঘড়ি মাংস কেটে দাঁড়িপাল্লায় চাপাতে লাগলো।

হাড়-মাংস মেশামেশি দেবে। —হুকুম করলেন ঘটোৎকচ জেঠু।

নগেন কসাই মাথা নেড়ে সায় দিল।

রাং থেকে দাও। গর্দান শিরদাঁড়া থেকেও খানিকটা। ঘাড়ের পাশটাও দিও। তারপর গিয়ে পাঁজরা, সিনা—সব থেকে একটু একটু দিও, বুঝলে। —ঘটোৎকচ জেঠু একের পর এক ফরমায়েস করতে লাগলেন।

নগেন যন্ত্রের মতো মাংস কেটে চলেছে। ঘটোৎকচ জেঠু তার কতোদিনের খদ্দের।

পরিপাটি করে মাংস কেটে কুটে ওজন করে পদ্ম পাতায় ঢাললো নগেন। বললো, —থলিটা দিন, স্যার। মাংসটা ভরে দি।

মাংসের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন ঘটোৎকচ জেঠু। চোখে পলক পড়ছিল না।

গম্ভীর গলায় বললেন,—ওজনটা ঠিক করলে তো হে?

ভীষণ লজ্জায় পড়ে গেল নগেন। জিভ কেটে বললো,—বলেন কি স্যার! আপনাকে ওজনে কম দোব? ঘাড়ে কটা মাথা আমার? —বলতে বলতে মাংসগুলো ফের চাপিয়ে দিল দাঁড়িপাল্লায়।

ঘটোৎকচ জেঠু একবার তাকাচ্ছিলেন বাটখারার দিকে, একবার মাংসগুলোর দিকে।

দাঁড়িপাল্লা সোজা করে তুলে ধরে হাসলো নগেন। বললো,—দেখুন স্যার। একটু বেশিই আছে বরং।

নগেনের কথায় মুহূর্তে খেপে গেলেন ঘটোৎকচ জেঠু,—কে বলেছে হে তোমায় বেশি দিতে? আমি চেয়েছি?

মুহূর্তে সাদা হয়ে এলো নগেনের চোখ মুখ—আজ্ঞে তা নয়, স্যার। তবে আপনারা হলেন গে—

তোল মাংস, তোল—। —মাঝপথে ধমকে উঠলেন ঘটোৎকচ জেঠু।

ঠিক যা ওজন, তাই দাও। ইস্! দাতাকর্ণ আমার! —দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বললেন তিনি।

নগেন এখন ঘটোৎকচ জেঠুর হাত থেকে ছাড়া পেলেই বাঁচে। ঠিক ঠিক ওজন করে, সে বললো,—নিন এবার, থলিটা পাতুন।

ব্যাগ দেবেন কি, ঘটোৎকচ জেঠুর চোখ তখন ছানাবড়া! ভুরু দুটো কপালে তুলে বললেন,—আরে ব্যস! পাঁচ কেজি মাংস অ্যাত্তোগুলো? সর্বনাশ!

নগেন লাজুক হাসিটি হেসে বললো,—আপনাকে তো ওজনে কম দিতে পারিনে স্যার। নইলে—

তা বলে পাঁচ কেজি মাংস অ্যাত্তো! —ঘটোৎকচ জেঠুর বিস্ময় আর বাগ মানে না যেন।

পেট ভরে খাবেন, স্যার। ভেড়ার মাংস রোজ রোজ পাবেন না। —নগেন আশ্বাস দিল।

Table of Contents

ঘটোৎকচ জেঠু সে কথার উত্তর দিলেন না। পলকহীন চোখে তিনি তাকিয়ে রইলেন মাংসগুলোর দিকে।

খানিকক্ষণ পাল্লাটা ধরে রেখে বিরক্ত হয়ে উঠলো নগেন।

—দিন, স্যার থলিটা। মাংসটা ভরে দি।

ঘটোৎকচ জেঠু ততক্ষণে হাঁটা শুরু করেছেন।

অবাক হয়ে নগেন শুধোলো,—মাংস নেবেন না, স্যার?

—না হে! —

যেতে যেতেই ঘটোৎকচ জেঠু বললেন,—ডাক্তার বলেছে, আমার নাকি পাঁচ কেজি ওজন কমে গিয়েছে। তাই পরীক্ষা করে দেখলাম, পাঁচ কেজি মাংস কতোটা হয়। ইস্, এত মাংস কমে গেছে আমার! অ্যাত্তো মাংস! ইস্!—বলতে বলতে ক্রমশ ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেলেন ঘটোৎকচ জেঠু।

নগেন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো, বোকার মতো।

Table of Contents

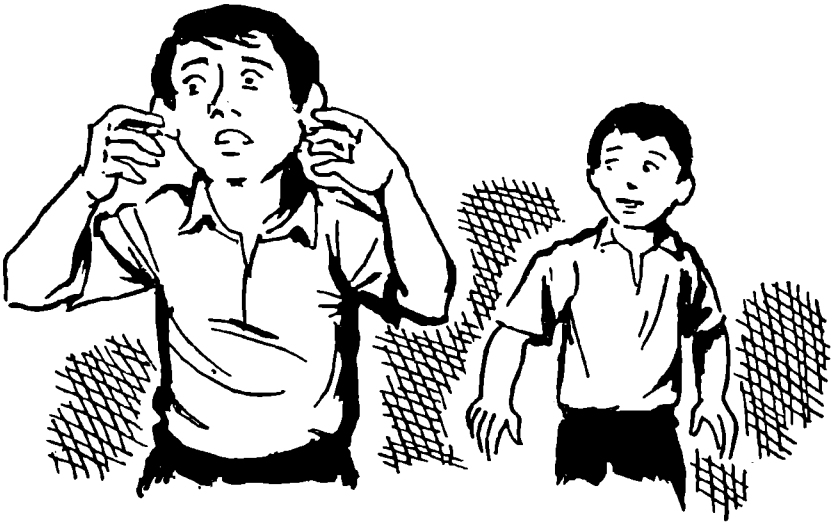

গোকুলের শিক্ষাদান

অশোককুমার সেনগুপ্ত

গোকুলের মাথায় বুঝি ভূতই ধরেছে। নইলে তাকে নিয়ে এত কাণ্ড! পড়াশুনাতে মন নেই, সংসারেও ঝামেলা বাড়াচ্ছে। বাবা পরিষ্কার বলে দিয়েছেন—'এবার ফেল করলে আর ক্লাস সেভেনে পড়তে হবে না, সোজা তোকে নিয়ে কেষ্টবাবুকে বলে পাড়ার মানদা ফ্রি প্রাইমারি স্কুলে শিশুশ্রেণীতে ভর্তি করে দেব। উঁহু পড়া ছাড়া চলবে না, শিশুশ্রেণী থেকেই ভাল করে আবার শুরু করবি'—সে-ই কিনা দিদি আসতে না আসতে আবার ভাগ্নেকে নিয়ে পড়ে, বইয়ের টেবিলের কাছেই ঘেঁষে না!

হাজারিবাগে বড় জামাইবাবু চাকরি করেন। দিদিও সেখানে থাকে। দিদির এক ছেলে, এক মেয়ে। ছেলেই বড়। নাম কানু, ভাল নাম প্রাণেশ। সাত বছর বয়স। চমৎকার গোলগাল চেহারা, ফরসা মোটাসোটা শরীর। ভারি দুরন্ত কিন্তু। এসে পর্যন্ত সারা বাড়িকে যেন মাতিয়ে রেখেছে।

তা পানুকে মামা হিসেবে গোকুল আদর করুক শুধু, তা নয়, শিক্ষাদানেরও ভার নিল।

গোকুলের উর্বর মস্তিষ্কে কোথা থেকে এল কে জানে, হাজারিবাগ মানেই জঙ্গল, বাঘ ভালুক শিয়াল আর সাপ তো আছেই। ভাগনেকে সেখানে নামাতে হবে। তাই এখন থেকেই শিকারে হাত মক্স করা দরকার। তবে শিকারের আগে তো হাতের টিপ ঠিক করতে হবে। আর এ ব্যাপারে তীরধনুক কি গুলতি এ দুটোর বিশেষ দরকার। সহজলভ্য তো বটেই। কে আর বন্দুক দেবে! বড় হলে ভাগনে না হয় বন্দুক ধরবে। এদিকে হাতের লক্ষ্য স্থির

Table of Contents

করার অভ্যাস না করলে গুলি অব্যর্থভাবে শত্রু নিপাত করতে পারবে না। আর এও ভেবে দেখল গোকুল, শিকার না করলেও বিপদ আসতে কতক্ষণ? বন্দুক চালাতে শিখলে অনায়াসে এফোঁড় ওফোঁড় করে দেওয়া যাবে শত্রুকে। হ্যাঁ, এখন এমনি বাঁশের কাঠিতে অভ্যাস করবে। তারপর তীর ব্যবহার করবে, ডগায় ঝকঝকে ধারাল ফলা।

দিদিকে ব্যাপারটা সে বোঝানর চেষ্টা করল। কিন্তু দিদির উৎসাহ দেখা গেল না। পাশের বাড়ির সুলতাদি এসেছেন, তার সঙ্গে তালের খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুতের পদ্ধতি নিয়ে দিদি বড়ই ব্যস্ত। শুনলেন কি শুনলেন না, বললেন,—তা যা না ভাগনেকে নিয়ে খেলা কর্‌গে। আমাকে আবার কী জিজ্ঞাসা করছিস্।

গোকুল বললো,—বলছো কি দিদি, এ কী খেলা নাকি? এ তো শিক্ষাদান।

ওই হল। —দিদি ব্যস্ত হয়ে বললেন ঃ তা যাই বল্ তালের রুটির চেয়ে কিন্তু তালের ফুলুরি অনেক মুখরোচক। ওটা আমাকে শিখিয়েছিলেন আমার শাশুড়ি।

গোকুল আহত হল। তালের ফুলুরি তৈরিটা শিক্ষা হয়, আর ধনুর্বিদ্যা কি গুলতি বিদ্যাটা শিক্ষা নয়। আহা, বিদ্যা যখন, তখন শিক্ষা না হয়ে যায় কোথায়! বললো,—তুমি দিদি খেলা বলো না। ভাগনেকে আমি শিক্ষা দেব। খেলাচ্ছলে শিক্ষা অবশ্য বলতে পার।

বড় চালাক তো তুই গোকুল। এই জন্যেই বছর বছর ফেল করিস। তা ও ছোট ছেলে, ওকে শিক্ষা না দিয়ে নিজে শেখ। —দিদি মুখ ঘুরিয়ে নিলেন,—ফুলুরির চেয়ে আবার তালের লুচি আরও সুন্দর। তাই সুলতা, ফেলে ছাড়তে পারবি না। তাহলে শোন্ তালের লুচি তৈরি করতে না...

গোকুল গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তালের লুচিই বড় হল ছেলের শিক্ষার চেয়ে? এই না হলে মা! ভারি অভিমান হল গোকুলের। তবে কিনা সে মামা। পাশাপাশি দুটো মা, তবে না মামা। তাছাড়া শিক্ষা দিলে গুরু হিসেবে ভাগনে চিরকাল সম্ভ্রম করবে। শুধু তাই নয়। পানু তো গুলতি আর তীর-ধনুক তৈরি হবে শোনার পর তার পিছনে আঠার মত লেগে আছে। শিক্ষা গ্রহণে যার এত উৎসাহ তাকে তো গোকুল নিরাশ করতে পারে না। অন্যায় হবে না?

উৎসাহ বলে উৎসাহ, পানু তো গোকুলের পিছনেই পড়ে আছে। দিনরাত ছোট মামা ছোট মামা, আর নানান প্রশ্ন। বিরক্ত নয় গোকুল, বরং খুশি। স্যারেরা বলতেন জানবার কৌতূহলই মানুষকে বড় করে।

যাই হোক বাখারিতে দড়ি বেঁধে ছিলা করা হল ধনুকের। তীরও হল সরু সরু বাঁশের কাঠি। গুলতি কিনে আনল দোকান থেকে। মাটির ছোট ছোট গুলি বানিয়ে রোদে শুকিয়ে শক্ত করে নেওয়া হল। পানুর হাতে দিয়ে শিখিয়েও দিল গোকুল ছোঁড়ার কায়দা কানুন। বুদ্ধিমান ছেলে, শিখতে দেরি হল না।

ছোট মামা, কাক মারব আমি একটা। —পানু ছোড়ার কায়দা শিখেই কাক শিকারে ব্যস্ত হতে চাইল।

—ছিঃ পানু, অত ছোট মন করতে নেই। কাক কেন মারবে তুমি। এখন তোমাকে প্র্যাকটিস করতে হবে। দেওয়ালে গোল একটা ঘর এঁকেচি। মাঝখানে টিপ। ওখানেই হাত মক্‌স করবে। আর মারবে তুমি বাঘ, তবে না শিকারী! লোকে বলবে, হ্যাঁ, পানু শিকারী বটে।

Table of Contents

বটে।

চিড়িয়াখানার বাঘ কেন, হাজারিবাগের জঙ্গলের বাঘ। তবে না শিকার! —গোকুল বুক ফোলায়।

—ওরে বাবা, ও আমি পারব না, হালুম করে গিলে ফেলুক আর কি! জঙ্গলে কে ঢুকবে!

এমন ভীতু ভাগনে! গোকুল মনে মনে অসন্তুষ্ট হল। তবে মুখে কিছু বলল না। বরং বোঝাতে সচেষ্ট হল, শিকার কি, খাঁচার ভিতর জন্তু রেখে শিকার হয় না ইত্যাদি।

কিন্তু ভাগনের সাহস সঞ্চার হল না কিছুতেই। বললো,—কাক মারা কি শিকার নয়?

তাই মারিস বাবা। —গোকুলকে বিরক্ত হয়ে বলতে হল। হুঁ, কাক মারা যে শিকার নয় এ প্রমাণ করা তো সহজ নয়। কাক তো পাখি। লোকে পাখি শিকার করে না?

কদিনেই কিন্তু পানু তুলকালাম কাণ্ড করে ছেড়ে দিল। শিক্ষক মামা গোকুলের নির্দেশ শুনতে তার বয়ে গিয়েছে। হাতে তীর-ধনুক, কখনও গুলতি। সুটসাট মেরে যাচ্ছে। টেবিলের উপর রাখা একটা কাঁচের গ্লাস এক তীরেই অক্কা পেল। দাদুর পিঠে ঝাঁ করে ছুটে গেল গুলতি ক্ষুদে গুলি। রান্নাঘরে ভাতের হাঁড়িতে ঢুকে একটা লম্বা তীর চমৎকার ফুটতে থাকল ঘাড় দুলিয়ে। গোকুলের কালির দোয়াত বাংলা বইয়ের উপর উল্টে কালো স্রোতে ভাসিয়ে দিল সামান্য একটা গুলি। তার ওপর তো আছেই যখন তখন এ ঘরের দেওয়ালে ওঘরের দেওয়ালে বারান্দায় মেঝেয় টুপটাপ তীর পড়া কি গুলি পড়া। সারা বাড়ি জুড়ে পানুর তীর একটা সন্ত্রস্তভাব এনে দিল।

ঘরের লোক দুদিনেই ব্যতিব্যস্ত। পানুর হাত থেকে ছিনিয়ে নেবারও উপায় নেই। চিলের মত চেঁচাচ্ছে ছেলেটা হাত বাড়াতে গেলে। গোকুলের ভাবনাই বেশি। সেই না ধরিয়ে দিয়েছে ধনুক, গুলতি।

মামার বাড়ি এসেছে, এইটুকু আবদার তো করবেই। —দিদি বলছে।

মা বললেন,—ওর দোষ কি? ছোটছেলে, যে ওর হাতে দিয়েছে তারই দোষ।

বাবারও ওই মত,—ওকে তীর গুলতি দিল কেন গোকুল! মাথা বাঁচাতেই দিন যাচ্ছে।

ব্যস্, তাহলে গোকুলই অপরাধী। কপাল মন্দ হলে এমনই হয়।

তবু কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু গোকুলের ব্যায়ামবীর ছোড়দার নাকের ডগায় তীর লাগতেই ঝাঁ করে গোকুলের চুলের মুঠিতে তার হাত চলে গেল। গোকুল আঁতকে বললো,—আমি... আমি তো কিছু।

ঢোক গিলল দুবার। কিন্তু কথাটা বেরুল না।

—হ্যাঁ, তুই—তুইই তীরটা ছুঁড়েছিস্। ভাগনের হাত দিয়ে আসা এই তীর তোমার।

আ-আমি। —গোকুল ককিয়ে উঠল শুধু? তীর কার প্রমাণের চেয়ে মাথা বাঁচানই শ্রেয় বলে মনে হল ওর।

শোন্, আমি চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশ দিচ্ছি। হুঁ, তারপর যেন ভাগনের হাতে ধনুক আর গুলতি না দেখি। জোর করে ছিনিয়ে নেওয়া চলবে না। ভুলিয়ে আদায় করে নিতে হবে। না পারলে একশ ডন দুশো বৈঠক দিতে হবে। তারপর আবার চব্বিশ ঘণ্টা টাইম

Table of Contents

দেব। না পারলে আবার... হুঁ। —চুলের মুঠি ছেড়ে ছোড়দা বলল, যাও চেষ্টা চালাও গে। কিন্তু মনে রেখো, পানুকে মোটেই কাঁদান চলবে না।

পানুকে বলতে তো এক কথাতে রাজি। বললো,—তুমি এদুটো নেবে ছোটমামা? নাও না।

খুব ভাল ছেলে ভাগনে আমার! —গোকুল গলে পাঁক। কে জানত এত সহজে কাজ হাসিল হবে। চাপা গলায় পাছে ভাগনে হাতছাড়া হয় তাই বলল,—তুই তো আলুকাবলি ভালবাসিস! পেট ভরে খাওয়াব! কাউকে বলিস্ না কেমন? এবার দাও—আমার হাতে দিয়ে দাও। লক্ষ্মী ছেলে, সোনা ছেলে!

গোলগাল ফরসা মুখে বড় চোখ দুটোয় এবার কাতর অনুনয় দেখা গেল পানুর—জান ছোটমামা, এ দুটো না আমার ঠিক পছন্দ নয়। তোমাকে বলব বলব করি আমি।

এই তো বললে।—গোকুল একগাল হাসল,—এবার দাও। হাত বাড়িয়েই থাকল গোকুল।

—আমাকে তুমি একটা ভাল ধনুক করে দেবে আর ভাল তীর।

আর দিয়েছি! গোকুল মনে মনে বলল, মুখে বললো,—নিশ্চয়ই। এর চেয়েও ভাল ধনুক করে দেব।

—তাহলে দাও।

—আহা, এ দুটো ফেরত দে। তারপর না দেব।

বারে, ফেরত দিলে আমি খেলব কিসে? আগে দাও। দিলেই দিয়ে দেব। —পানু বললো,—কখন দেবে ছোটমামা? আর আলুকাবলি? আলুকাবলি কখন্ খাওয়াবে?

ঝাঁ করে একটা চড় কষিয়ে দিতে ইচ্ছা করল গোকুলের। এই না হলে ভাগনে! আবদার দেখ! আলুকাবলি! তোকে নিমপাতা বেঁটে মুখ চেপে খাওয়ান উচিত। কিন্তু তা তো আর করা যাবে না। কি যে করে গোকুল! চব্বিশ ঘণ্টা পর তাকে ডন-বৈঠক শুরু করতে হবে। উহুঁ ছোড়দার হাত থেকে ছাড়ান পাবার কোন উপায় নেই। বুদ্ধি! একটা বুদ্ধি যদি আসে মাথাতে! দেওয়ালে ঠোক্কর মেরে দেখবে নাকি?

ছাতের উপর উঠে এল গোকুল। হাওয়াতে পায়চারি করে বেড়ালে যদি বুদ্ধি খোলে!

কিন্তু দুপাক খেয়েছে কি না খেয়েছে, ভাগনে এসে হাজির—ও ছোটমামা।

গোকুল উত্তর দিল না।

ভাল ধনুক না হয় পরে দিও। আলুকাবলি, তুমিই তো বললে—পানু কথা কটা বলে জিভ টানল।

—বিরক্ত করিস না পানু। নিচে নেমে যা। নইলে ছাতেই খেল্।

মামা আলুকাবলি খাওয়াবে এই আশাতে মামার কথা অমান্য করল না পানু। ছাতের উপরই তীর ছোঁড়ার খেলা শুরু করে দিল। সুটসাট মারে আর কুড়িয়ে আনে। লালচে রঙের রোদ পড়েছে ছাতময়। মাথার উপর পাখি উড়ে যাচ্ছে। বাতাসও রয়েছে। কিন্তু গোকুলের ঘুরপাক খাওয়া শরীর কেবল উষ্ণতাই পাচ্ছে। হাত চাপড়াচ্ছে সে মাথায়। কিন্তু বুদ্ধির কলকব্জাগুলো যেন জং ধরে একেবারে জমে গিয়েছে। না, জং ধরেনি। আসলে ঝাড়পোঁছ করার সামান্য প্রয়োজন ছিল। নইলে এত অল্প ভাবনাতে পথ আসে। সে লাফিয়ে ওঠে। খুশিতে মুখ উজ্জ্বল হয়! শুধু তাই নয়, ছোড়দার কৃতজ্ঞতাভরা চাউনিও সে দেখতে

Table of Contents

গোকুল চিৎকার করে ওঠে,—ভাগনে!

—মামা।

—জানিস তো ছোড়দা বলেছে তোর হাত থেকে ধনুক আর গুলতি ছিনিয়ে নিতে।

হুঁ। তবে আমি যেন না কাঁদি। —ভাগনে মামার চেয়ে কথাতে আরও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়? আমাকে ভুলিয়ে নিতে হবে।

গোকুল যথার্থই থ। অ্যাঁ ভাগনে যে তাকে এক হাটে বেচে আর এক হাটে কিনবে? কিন্তু তা কিনুক, এখন ছোড়দার ডন-বৈঠক থেকে প্রাণ বাঁচান তো দরকার। দেরি করে লাভ কি! তাই বললো,—চল, চল।

কোথায়? আলুকাবলি খেতে? —পানু আবার জিভের জল টানল।

এখন মোটেই রাগ করল না গোকুল। বললো,—দাঁড়া আগে প্ল্যানটা আমার সাকসেসফুল হোক, তবে না।

মামার প্ল্যানমত ভাগনে ঢুকল ছোড়দার ঘরে।

গোকুল বললে,—তোকে একটা কাজ করতে হবে।

কি করব মামা বল। কাজ করতে আমার খুব ভাল লাগে। কিন্তু কেউ কাজ দেয় না। —ভাগনে বিমর্ষ গলায় বললো।

আমি দেব। —গোকুল দেখাল—এই যে দেখছিস আয়না, এটা ছোড়দার।

—আমি জানি।

—আঃ কথা শেষ করতে দাও। মন দিয়ে এখন শোন। হুঁ, এটা ছোড়দার আয়না। আয়নাটা কেন তাও তোর জানা দরকার। যাতে মুখের শেপ খারাপ না হয়ে যায় এক্সারসাইজ করতে করতে, তার জন্যে। তারপর নিজের চেহারা দেখতে কার না ভাল লাগে? আয়নাটা কিন্তু ছোড়দার মোটেই পছন্দ নয়। প্রায়ই বলে, এটাতে আমাকে বিশ্রী দেখায়। নেহাত মায়া পড়ে গিয়েছে, তাই ভাঙতে পারিনি। আর ভেঙেও তো পড়ে না।

—আমি ভেঙে দেব?

দেবে বৈকি! দিলে ছোড়দার উপকার করা হবে। বুঝবে তোমাকে শিক্ষাদান সার্থক হয়েছে। ছোড়দা তো এটা ভাঙাই দেখতে চায়। —গোকুল যেন ছোড়দার খুশি ভরা মুখটা প্রত্যক্ষ করছে এমন ভঙ্গি করে।

তাহলে চালাই। —ধনুক বাগিয়ে ধরে পানু।

উহুঁ তীরে হবে না। গুলতি চাই। টপাটপ গুলি ছোঁড়্। —আঙুল লম্বা করে দক্ষ শিক্ষকের মত নির্দেশ দেয় গোকুল।

না, ভাগনের মোক্ষম মারে ছোড়দার উপকার হতে বেশি সময় লাগে না। ঝনঝন শব্দে ভেঙে পড়ে আয়না।

পাশের ঘর থেকে ছুটে আসে দিদি। চোখ কপালে তুলে বলে,—সর্বনাশ! পানু করলি কি!

মিটিমিটি হাসে গোকুল—সর্বনাশ নয় দিদি, উপকার।

ছোড়দা গাঁক গাঁক করে ঘরে ঢোকে—উপকার! উপকারটা কি হল? তারপর তার ভাঙা আয়নার দুর্দশা দেখে ককিয়ে ওঠে,—ভাঙল কে? অ্যাঁ আয়না ভাঙল কে?

গোকুল বুক চওড়া করে বলল,—পানু ভেঙেছে। তবে আমার নির্দেশে।

Table of Contents

ঝাঁ করে চুলের মুঠি সমেত গোকুল চলে এল ছোড়দার আওতায়। দুকান ধরে গোটা কয়েক ঝাঁকুনি, তারপরই বেজে উঠল ছোড়দার গলা—গোকুল নীল ডাউন হয়ে থাকবে। আর পানু তুই দেখবি। কান থেকে হাত ছাড়লেই আমাকে ডাকবি। কি, পারবি না?

—খুব পারব।

—ব্যস্, তাহলে ধনুক গুলতি দাও। এখন ছোঁড়ার অবসর পাবে না। সব সময়ই তো তোমাকে দেখতে হবে।

হাসিমুখে ভাগনে এনে দিল ধনুক, তীর, গুলতি, গুলি। ওগুলো ছোড়দার নিপাত করতে দেরি হল না। তার সঙ্গে আবার কথা—দেখ্, দেখে শেখ্, পানু কাঁদল? কেমন দিয়ে দিল। এই কাজটাও করতে পারলি না।

নীল ডাউন হয়ে গোকুল ভাবল, একেই বলে মন্দ কপাল। নইলে উপকারের এই প্রতিদান! তুমিই তো ভেঙে ফেলতে চেয়েছিলে আয়না। কাজটুকু করে দিতে উল্টে শাস্তি। মা যে বলেন, দুনিয়াটা বদলে গিয়েছে, ঠিক কথা। বদলে গিয়েছে বৈকি। নইলে শিক্ষাদান করতে গিয়ে শিক্ষালাভ হয়? গুরু নীল ডাউন আর শিষ্য প্রহরা দেয়। কিন্তু কে বুঝবে গোকুলের দুঃখ?

Table of Contents

বোতল বাবার বেতাল রহস্য

হীরেন চট্টোপাধ্যায়

দেখবার মতোই চেহারা একখানা!

অধিষ্ঠান হয়েছে দোতলায় বড় মামার সবচেয়ে বড়ো ঘরটায়। ধরতে গেলে বসে আছেন একেবারে আধখানা খাট জুড়ে, মাঝে মাঝেই মাথা ঝাঁকিয়ে বাজখাঁই গলায় চিৎকার করে উঠছেন—মা! মা! মা! পিলে একেবারে চমকে যায় শুনলে!

ঘরে ঢুকেই বড়মামা চার হাতপা ছড়িয়ে মেঝের ওপর উপুড় হয়ে পড়েছেন, অবশেষে তার আগেই তাঁর পরম আদরের বোন নান্টি, অর্থাৎ কিনা আমার মাকে চোখের ইশারায় প্রণাম করার নির্দেশ জানিয়েছেন। মাকে যেন বড় মামা চেনেন না—মাকে কি আর ইশারা করবার দরকার আছে! ঠাকুর দেবতায় মার দারুণ ভক্তি, সুতরাং বড়মামা ধরাশায়ী হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একগলা ঘোমটা টেনে মা গলায় আঁচল দিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। মুশকিলে পড়ে গিয়েছি আমি, ছোটকাকার মতো একেবারেই যদি ঘরে না ঢুকতাম তো কোন কথাই ছিল না। কিন্তু ভেতরে ঢুকে তো আর সঙের মতো দাঁড়িয়ে থাকা যায় না।

কি করবো ভাবছিলাম, বাঁচিয়ে দিল গুড্ডু। যেই না ওর মুখখানা দরজার ফাঁক দিয়ে চোখে পড়েছে, হাত দুটো কোনরকমে একবার কপালে ছুঁইয়েই, গুড্ডুকে নিয়ে দৌড়তে দৌড়তে দোতলা থেকে একেবারে মামাদের বিশাল বাগানের মাঝখানে। হঠাৎ ছোট কাকার দিকে চোখ পড়ে গেল। মরা ইঁদারার পাশে চুপটি করে বসে আছে।

ছোট কাকার ব্যাপারটা সত্যি অদ্ভুত। বলতে গেলে ছোট কাকা একরকম জোর করেই এসেছে মার সঙ্গে। মামা যখন এই জন্মসিদ্ধ বোতলবাবার সন্ধান পেয়ে মাকে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য চিঠি দিয়েছিলেন বাবা বলেছিলেন,—সঙ্গে যেতে-টেতে আমি পারবো না।

Table of Contents

বিল্টুকে নিয়ে যাও—আর আমি না হয় আর-জি-করের মোড় থেকে তোমাদের রাজারহাট বিষ্টুপুরের বাসে তুলে দিচ্ছি।

অবাক করে দিয়ে ছোট কাকাই বলেছিল,—না না বড়দা, সে কি হয়! এতোখানি রাস্তা—আমি নিজেই সঙ্গে যাচ্ছি।

বাবা সিগারেটে টান দিয়ে যেন মজা দেখবার জন্যেই মুচকি হেসে বলেছিলেন,—কেন যাচ্ছে জানিস তো? বোতল বাবাকে দেখতে।

বলো কি! —ছোট কাকার চোখ এবার বুজে এসেছিল ভক্তিতে ঃ না না, এত মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে যখন যাচ্ছে বৌদি তখন তো সঙ্গে গেলেও অর্ধেক পুণ্য। কিচ্ছু চিন্তা নেই বৌদি, বাক্স গুছিয়ে নাও।

বাবা তো বাবা, এ কথা আমিও বিশ্বাস করিনি। ছোট কাকা এইসব বাবা-টাবা শুনলে একেবারে ক্ষেপে যায়। বলে,—আমরা নেহাৎ বুদ্ধু, তাই এই সব বাবারা ভেলকি দেখিয়ে টাকা আদায় করে খায়।

ছোট কাকা আমাদের সঙ্গে বোতলবাবাকে দেখতে যায় নি। আমার সঙ্গে গুড্ডুকে আসতে দেখে বললো,—আরে গুড্ডুবাবু যে! তোমার বক্সিং কেমন চলছে?

গুড্ডু সব সময় ফিটফাট, প্যান্টের পকেটে হাত পুরে বুক টান টান করে বললে,—খুব ভালো বক্সিং শিখেছি আংক্‌ল্—তোমাকেও হারিয়ে দিতে পারি এখন।

বটে! —ছোট কাকা ওকে কাছে টেনে নিয়ে বললে ঃ কিন্তু বোতলবাবা? ওর সঙ্গে পারবে?

উরে ব্বাপস! গুড্ডু হেসে ফেললো ঃ ওতো একটা জায়েন্ট। ওকে হারাতে পারবে ওর বেতাল।

—বলো কি, বোতলের মধ্যে বেতাল! তাই আবার হয় নাকি?

হয় মানে? —গুড্ডুর চোখ বড় বড় হয়ে উঠলো ঃ আমরা সবাই তো দেখেছি সেদিন।

—তুমিও দেখেছো?

—আমাকে অবশ্য ঢুকতে দেয় না ঘরে। একদিন খুব বায়না ধরেছিলাম, তাই দেখিয়েছিল।

—কী রকম দেখলে? ফ্যানটমের মতোই?

—উঃ দারুণ! কী লম্বা!

—খুব লম্বা?

—মাটিতে দাঁড়ালে দোতলার জানলা দিয়ে মুখ দেখা যায়।

—বলো কি! তা এতো বিরাট বেতাল ঐ বোতল থেকে বেরুলো কী করে?

মুখে চোখে অদ্ভুত একটা ভঙ্গি ফুটিয়ে গুড্ডু কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই বড় মামাকে দেখতে পেয়েছি আমি। আমাদের সামনে এসে বললেন,—আরে এই গুড্ডু, ওদের ছাড়, একটু জলটল খাবে না।

ছোট কাকা হাত নেড়ে বললেন,—না না, এখন আবার খাবো কি! আপনি বরং বিল্টুকে নিয়ে যান—বাসেই খিদে খিদে করছিল—

আমি প্রতিবাদ করার আগেই বড় মামা গাঁক গাঁক করে বলে উঠলেন,—আরে ও তো খাবেই—কথায় বলে, মামার বাড়ি ভারি মজা কিল চড় নাই! তাই না বিল্টু বাবু?

Table of Contents

আমিও ছোটকাকাকে জব্দ করতে বললাম,—ছোটকাকাও বলছিল রাজারহাটের মিষ্টি খুব ভালো করে খেয়েছি, মুখে লেগে আছে।

আপনি ছাড়ুন তো দাদা, বিল্টুর কথা। —ছোট কাকা বললে ঃ এখনও কি বাচ্চা আছি নাকি ওদের মতো? মিষ্টি টিষ্টি খাওয়ার পাট কবে উঠে গেছে।

পাট যে মোটেই ওঠেনি, সে আমি বিলক্ষণ জানি। খেতে বসে ছোটকাকাও তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। এই পেল্লায় সাইজের ক্ষীরমোহন—তিনটে খেতেই আমার প্রাণ আইঢাই। গুনে গুনে এক ডজন পেটের মধ্যে চালান করে দিয়ে ছোট কাকা জলের গ্লাসের দিকে হাত বাড়ালো। ঢক ঢক করে গ্লাসটা শেষ করে বললে,—ওঃ ফাইন খেলাম দাদা, এ সব কি ওই বোতলসিদ্ধ বাবার অনারে?

বড় মামার হাত দুটো স্প্রিং-দেওয়া পুতুলের মতো উঠে গেলো কপালে, বললেন, —এই সামান্য ব্যাপারে আর ওঁকে জড়িয়ো না ভায়া। আমাদের জন্মমৃত্যু জীবনযাত্রা—সবই তো চলছে ঠাকুরের কৃপায়। উনি তো কতো বড়ো শক্তিধর সে তুমি চোখে না দেখলে বুঝবে না। শ্মশানে একশো এক বছর তন্ত্র সাধনা করে পেয়েছেন ওই বোতলসিদ্ধ মন্ত্র।

একশো এক বছর!—ছোটকাকা ঢ্যাব করে একটা ঢেকুর তুললো ঃ আপনাদের ঐ বোতলবাবার বয়স কতো হলো?

ত্রিকালজ্ঞ ঋষি—বয়সের কি আর গাছপাথর আছে! —বড় মামা আবার দুহাত ওপরে তুললেন ঃ নেহাত আমায় বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন বলেই দর্শন দিয়েছেন।

—বিপদ! আপনি তো দিব্যি আছেন—বিপদ আবার কোথায়!

সেই তো হচ্ছে কথা ভায়া, একেবারে আমার ঘনিষ্ঠজন ছাড়া তো কেউ জানে না এ বিপদের কথা—উনি কী করে জানলেন?

ছোট কাকা খানিকক্ষণ ভুরু কুঁচকে বললে,—আপনি কি রত্নার কথা বলছেন?

—ঠিক তাই।

রত্নাদি আমার মামাতো বোন। আজ থেকে প্রায় তেরো-চৌদ্দ বছর আগে সে হারিয়ে গিয়েছে। তখন ওর বয়স নাকি মাত্র চার বছর। আমি অবশ্য তখনো জন্মাই নি, মায়ের মুখে পরে শুনেছি। বাইরের লোক না জানলেও, কথাটা এ বাড়ি ও বাড়ির সকলেই জানে।

কী বললেন উনি রত্নার কথা? —ছোট কাকা জিজ্ঞেস করলো।

—ওর জন্যই একদিন বেতাল জাগিয়েছিলেন। আজ আবার জাগাবেন। বেতাল যদি আমার রত্না মায়ের কোন খবর নিয়ে আসতে পারে তবে যজ্ঞ করে তাকে উদ্ধার করতে হবে।

—বেতাল জাগানোটা কী ব্যাপার?

—নিজের চোখেই দেখে যাও না ভায়া। বাবার মাহাত্ম্য যতোই দেখবে ততোই পুলকিত হবে। সন্ধ্যেবেলা ঘরে সামান্য যজ্ঞ-আরতি করে বোতল থেকে মুক্তি দেবেন বেতালকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই খবর নিয়ে ঝিলের পেছন থেকে বাতাসে ভর করে ছুটে আসবে বেতাল। একেবারে বাবার ঘরের দক্ষিণের জানালায়। কি বিকট তার চেহারা। কিন্তু বাবার কাছে সে শিশু। দরকারি কথাটুকু জেনেই বাবা তাকে বোতলবন্দী করে ফেলবেন।

দারুণ ব্যাপার তো। —ছোটকাকা প্রবল উৎসাহে বললে ঃ এমন জিনিস না দেখে তো ফেরা চলে না।

Table of Contents

বড় মামা আমাকে নিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। ছোটকাকার ডাক শুনে দাঁড়ালেন। ছোটকাকা বললে,—এই বাবার সঙ্গে চ্যালাচামুণ্ডা কেউ আসে নি?

শিষ্য? এসেছে বৈকি! —বড় মামা বললো ঃ প্রধান শিষ্য চণ্ড বিচণ্ড। বেশির ভাগ সময় বাবার কাছেই থাকে। বাকিরা থাকে নিচের ঘরে। মানে, যে ঘরে শিবু ছিল।

শিবু মানে আপনার সেই কাজের লোক? বছর খানেক আগে এসে যাকে দেখেছিলাম?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, বেশ মনে থাকে তো ভায়া তোমার!

—চেহারাটাও অল্প অল্প মনে আছে। সে কি নেই এখানে?

—আরে বলো না, যতো তোয়াজ করবে ততো ওরা পেয়ে বসবে। তিন-চার মাস কাজ করেই পালিয়েছে ঃ ঠিক আছে, তুমি একটু গড়িয়ে নাও ভায়া, আমি চলি।

।। দুই ।।

এখন সবে সন্ধ্যে। বেতালসিদ্ধ বাবা আসর জাঁকিয়ে বসেছেন।

ঘরের মেঝে একেবারে ভর্তি। দুই মামা, তিন মাসিমা, আমার মা, আশপাশের বাড়ি থেকেও দু-চারজন লোক এসেছে, যাদের আমি চিনি না। বাচ্চাকাচ্চাদের ও ঘরে ঢোকা বারণ। গুড্ডু আজ নেই। কেবল আমিই কান্নাকাটি করে এই ঘরে থাকবার অনুমতি পেয়ে গিয়েছি। আর একজনও অবশ্য নেই এ ঘরে, ছোটকাকা, এতো উৎসাহ দেখিয়েও বিকেলে কী একটা জরুরি কাজের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় ছোটকাকা বাধ্য হয়ে চলে গিয়েছে।

সাত পাঁচ ভাবার মধ্যেই একখানা হুঙ্কার ছেড়েছেন বোতলবাবা। তারপর নড়ে চড়ে পুরনো কথার জের টেনে বলতে শুরু করেছেন,—আরে প্রথম কবে দেখলুম, সেই কথাই তো বলছি। গোরারা তখনো যায় নি দেশ ছেড়ে। সেই সময় হঠাৎ একদিন দেখা পেলুম তার।

কী করে চিনলেন বাবা। —সামনে থেকে জোড়হাতে একজন বলে উঠলো।

আরে দূর পাগলা। চিনতে কি আর ভুল হয় নাকি রে! মোষে চড়ে মোষের শিঙের টোপর পরে হাসছে। দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেলুম যে। বিরাট কাঁটাওয়ালা গদা হাতে। ইয়া ভাঁটার মতো চোখ। পাকানো গোঁফ—একি ধর্মরাজ না হয়ে যায়!

তারপর বাবা, তারপর?

শরীরটাই না হয় একটু খারাপ হয়েছিল। বুদ্ধিশুদ্ধি তো আর চলে যায় নি। দেখেই বুঝলুম কী ব্যাপার। ফট্ মার উচাটন মন্ত্রে মুক্তি দিলাম বেতালকে। বললাম—এবার দেখা দেখি বেটা কেমন তোর মুরোদ। তা বলবো কি তোমাদের কাণ্ডকারখানা। শ্মশান জাগানো বেতাল তো—দাঁতমুখ খিঁচিয়ে এমন তাড়া করলো ধর্মরাজকে যে লেজ উঠিয়ে শেষে একবারে চোঁ চাঁ দৌড়। সেই যে পালালো, মোষকে আর কখনো এমুখো হতে দেখিনি।

হঠাৎ সোজা হয়ে বসলেন বোতলবাবা। বললেন,—লগ্ন প্রস্তুত। বেতাল জাগলো এবার। সবাই ইষ্টনাম জপ করো।

বোতলবাবা একেবারে সোজা হয়ে বসেছেন পদ্মাসনে। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে আগুনের ভাঁটার মতো। বোতলটা দুহাতে ধরে ঝাঁকাচ্ছেন—মাথাও নড়ছে সেই সঙ্গে, আর তার তালে তালে ঝাঁকড়া চুলগুলো ছড়িয়ে পড়ছে মুখের ওপর। এই অবস্থাতেই কী একটা ইশারা করলেন ঢ্যাঙা লোকটাকে। আর এক প্রস্থ তরল ঘি যজ্ঞের আগুনে পড়বার পরই তিনি উঠে পড়েছেন আসন ছেড়ে। এগিয়ে এসেছেন জানালার ধারে।

Table of Contents

ইশারা করলেন ঢ্যাঙা লোকটাকে। আর এক প্রস্থ তরল ঘি যজ্ঞের আগুনে পড়বার পরই তিনি উঠে পড়েছেন আসন ছেড়ে। এগিয়ে এসেছেন জানালার ধারে।

মা! মা! মা!

তীব্র গগনভেদী চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে খুলে দিয়েছেন বোতলের মুখ। মনে হলো যেন এক ঝলক আগুন বেরিয়ে গেলো সেই বোতলের ভেতর থেকে। ঘরের মধ্যে যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলে একসঙ্গে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন।

ওঠ্! ওঠ্! —বাবার গলা শুনে মুখ তুললাম। বসেছেন নিজের জায়গায়। সেই বীভৎস চেহারা আর নেই।

মুক্তি দিয়েছি বেতালকে—বড় মামার দিকে ফিরে উনি বললেন ঃ কিন্তু পালাবার সাধ্য তার নেই। এখুনি ফিরে আসবে তোমার মেয়ের খবর নিয়ে। জানলার দিকে তাকিয়ে থাকো। তাহলেই তাকে দেখতে পাবে।

যা দেখলাম, যেন নিজের চোখকেও বিশ্বাস হলো না আমার। দু-একদিন পরেই পূর্ণিমা। বেশ বড়সড় চাঁদ উঠে গিয়েছে। সাদা কাপড়ে মোড়া যে মূর্তিটি এগিয়ে আসছে তেমন মূর্তি জীবনে কখনো দেখিনি আমি। মুখ চোখ এতো দূর থেকে কিছুই বোঝা যায় না, কিন্তু সাধারণ মানুষের চেয়ে সে অন্তত দ্বিগুণ উঁচু। লম্বা-লম্বা পা ফেলে এমন তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসছে যে আমি দৌড়েও তার নাগাল পাবো না।

ভূত বা বেতাল যাই হোক, দেখতে দেখতে সেই বিকট মূর্তি এসে পড়লো জানলার কাছাকাছি। আর যে মুহূর্তে বোতলবাবা তার মুখোমুখি হবার জন্যে উঠে গিয়েছেন জানলার কাছে; সেই মুহূর্তেই ঘটে গেল এক অঘটন। ঠিক কী যে হলো প্রথমটা কিছুই বুঝতে পারলাম না। নিচে একটা ধুপধাপ শব্দ। লাঠি চালাবার মতো আওয়াজ। তারপরই বেতালের মাথাটা কেমন যেন একবার দুলে উঠলো, টলতে টলতে সরে গেল জানলা থেকে। ভারী একটা কিছু পড়ার শব্দ, আর সেই সঙ্গে তীক্ষ্ণ কর্কশ এক চিৎকার—মেরে ফেললো রে—

বেঁটে এগিয়ে গিয়ে বোতল বাবার কানে কানে কী যেন একটা বলেছে। শুনতে শুনতে বাবার ভুরু কুঁচকে গিয়েছে। বোতল তখনও হাতে ধরাই ছিল, সেই বোতল নিয়েই কোনরকমে বিশাল বপু তুলতে যাচ্ছেন, ঘরে ঢুকলো ছোটকাকা।

দেখতে পাচ্ছিলাম, ছোটকাকা প্রণামের ভঙ্গিতে হাত দুটো কপালে ছুঁইয়ে বোতল বাবাকে বলছে,—না না বাবা, অতো কষ্ট করে আপনাকে উঠতে হবে না। লোকজনকে আগেই খবর দেওয়া আছে, তারাই এসে আপনাকে তুলে নিয়ে যাবে। বসুন বসুন—।

ধপ করে বসে পড়ে চোখে আগুন ঝরিয়ে বোতলবাবা বললেন,—কে তুই? আমার সঙ্গে চালাকি! অনেক কষ্টে আমি ক্রোধ সংবরণ করে আছি। একবার ক্রুদ্ধ হলে তুই তো তুই, বাড়ি পর্যন্ত ভস্ম হয়ে যাবে জানিস?

বড়মামা তাড়াতাড়ি ছোটকাকার দিকে এগিয়ে এসে বললেন,—আমি জানতে চাই এসব হচ্ছে কী! কী শুরু করেছো তুমি ভায়া! সাক্ষাৎ বেতালসিদ্ধ মহাপুরুষের সঙ্গে তুমি—

কথাটা শেষ করতে না দিয়েই ছোটকাকা বললে,—ভয় নে দাদা, বোতলবাবার সিদ্ধ বেতাল এখন হাত-পা ভেঙে নিচে শুয়ে কাতরাচ্ছে। মুখখানা আগাগোড়া চুনকাম করা তো। নইলে চিনতে পারতাম এ তোমার সেই শিবু কিনা। গলার আওয়াজটা অবিশ্যি

Table of Contents

অনেকটা সেই রকমই লাগলো।

তার মানে? —বড়মামা হতবাক ঃ এখানে শিবু আবার আসবে কোথা থেকে?

শিবুই তো আসবে! নইলে কবে তেরো-চোদ্দ বছর আগে রত্না হারিয়ে গেছে সে খবর তোমার ওই বোতলেশ্বর জানবে কি করে?

—জানবেন না? কী বলছো তুমি?

ঠিকই বলছি! গুড্ডুর কাছে বেতালের বর্ণনা শুনেই আমি খানিকটা আন্দাজ করে ফেলেছিলাম। মানুষ তো আর অতো লম্বা হতে পারে না। তাছাড়া কেবল লম্বা সাজা নয় ওই অবস্থাতেই যখন তাকে এগিয়ে আসতে হবে তখন রণ-পা ব্যবহার করা ছাড়া সেটা সম্ভব হতেই পারে না।

—রণ-পা—মানে—!

—সেইটেই তো দেখতে হলো ভালো করে। আপনি বললেন চেলারা থাকে নিচে শিবুর ঘরে। তাহলে রণ-পা এবং বেতালের মেকাপের জিনিসপত্র যদি কিছু থাকে তবে তা থাকবে সেই ঘরেই। অন্য কিছু যদি লুকিয়ে রাখাও যায়, কাঠের পা তো আর লুকিয়ে রাখার জিনিস নয়। কিন্তু ঘরে ঢুকি কি করে। শরণাপন্ন হতে হলো ওই ঢ্যাঙার। তিনখানা দশটাকার নোট প্রণামী দিয়ে হাত করে ফেললাম।

অস্বস্তিতে ঘাড় নাড়তে নাড়তে বড়মামা বললেন,—না না, ব্যাপারটা এখনও আমার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না।

অবিশ্বাসের তো কিছু নেই দাদা। অবস্থাপন্ন বাড়ি দেখে শিবু চাকরি করতে গেল। খবরাখবর জোগাড় হলো। এ রকম ব্যাপার সব বাড়িতেই কিছু না কিছু থাকেই। তারপর বিনা কারণে কেটে পড়া। এবং পাঁচ-ছমাস পরে বোতলবাবার আবির্ভাব। এতো অত্যন্ত সহজ ফর্মুলা

তার মানে? আপনারা প্রকৃত সাধক নন?—বড়মামার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর।

স্তব্ধ হও! —বোতলবাবা উঠে দাঁড়ালেন আবার ঃ চণ্ড বিচণ্ড, চলে এসো। যেখানে ভক্ত সেখানেই ভগবান, ভক্ত অবিশ্বাসী হলে ভগবানও সেখানে স্থির থাকতে পারেন না। চলো, আর এক মুহূর্ত এখানে নয়।

—কিন্তু আরো কয়েক মুহূর্ত যে থাকতে হবে প্রভু! ছোটকাকা সামনে এগিয়ে এলো ঃ সমস্ত দুপুরটা তো আর বাজে নষ্ট করিনি। লোকাল থানায় গিয়ে অন্তত আধ ঘণ্টা কাটিয়ে এসেছি। থানার ও. সি. আটজন জবরদস্ত সেপাই পাঠিয়ে দিয়েছেন সন্ধ্যের মুখেই নইলে আপনার ওই রণ-পা বেতালকে ঘায়েল করা কি আর আমার কাজ! আপনাকে অভ্যর্থনা করার জন্য ওরা নিচে অপেক্ষা করেই আছে। কিন্তু ও. সি. ভদ্রলোক স্বয়ং এসে পড়বেন বলেছিলেন। কাজেই আর কয়েক সেকেন্ড যদি অপেক্ষা করতেন।

ছোটকাকার কথা শেষ হলো না তার আগেই সিঁড়িতে ভারী বুটের শব্দ পাওয়া গেলো।

Table of Contents

Table of Contents

Table of Contents

প্রথম খণ্ডরূপে এসে গেল ফুরফুরে হাসির এই অনবদ্য গল্পসম্ভার। ২৫টি দারুণ গল্প নিয়ে ' সেরা পঁচিশ'-এর এই লেখকসূচিতে রয়েছেন—

আশাপূর্ণা দেবী শিবরাম চক্রবর্তী
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আশুতোষ
মুখোপাধ্যায় মহাশ্বেতা দেবী
প্রফুল্ল রায় শক্তিপদ রাজগুরু
হিমানীশ গোস্বামী স্বপনবুড়ো
বরেন গঙ্গোপাধ্যায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়
আশা দেবী রাম চট্টখুণ্ডী সুশীল জানা
নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ধীরেন বল
ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় সুবোধ দাশগুপ্ত
ভগীরথ মিশ্র নির্মলেন্দু গৌতম
রবিদাস সাহারায় প্রবুদ্ধ
অশোককুমার সেনগুপ্ত
হীরেন চট্টোপাধ্যায় এবং
দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

নির্বাচিত গল্পসম্ভারের প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন কিশোর ভারতীর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক
দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

Table of Contents

অনবদ্য পঁচিশটি হাসির গল্পের সেরা সংকলন

9 788183 742115
www.bookspatrabharati.com

Table of Contents